সন্ধ্যা-সকাল

সন্তোষকুমার ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজকে

সস্নেহে

কিছু গল্প সেকালের,
কিছু একালের,
এই সংকলনে তাদের
মেলালাম—নাম
দিলাম "সন্ধ্যা-সকাল"।
কোনও কালই কারও
নয়, তবু।
সকাল ক-বে গেছে,
সন্ধ্যাও সেই
রাস্তা নিল বলে।
নির্ঘাত জানি,
লেখক আর লেখা
দুজনের জন্যেই
রাত্রি অচিরাৎ।

হোটেলের খাতায় যখন ঠিক-ঠিক পরিচয় লিখিয়েছিলুম, তখন পরিণাম ভাবিনি। ঘর দেখে মন খুশী, কর্মচারীটি যেই জিজ্ঞাসা করলে পেশা কী, বলে দিলুম ডাক্তারি। প্রায় হাতে হাতে ফল পেতে হল।

ভারতবর্ষের তীর্থ; অর্থাৎ পাণ্ডা, বেশ্যা, ষাঁড়, কুকুর আর ভিখারীর ছড়াছড়ি। এদের হাত এড়িয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সারলুম, এবং অস্বীকার করব না, স্নানার্থিনীও দেখলুম। দুপুরে হৃষীকেশ, লছমনঝোলা দেখে চিত্ত হৃষ্ট হল, কিন্তু মুষড়ে পড়ল শরীর। পেশী আর গাঁটে গাঁটে ব্যথা। স্থির করলুম বিকেলে আর নড়ব না, শুয়ে-শুয়েই তীর্থ-মাহাত্ম্য ধ্যান করব, ঘুমিয়ে পড়ব। দ্বিতীয় ইচ্ছাটা অবশ্য পূর্ণ হয়নি, কেননা হোটেলের খাট ছারপোকা-ছাওয়া, ক্ষণে-ক্ষণে শরশয্যার স্বাদ পেয়ে চমকে উঠলুম।

একটু পরেই দরজায় টোকা পড়ল। ভাবলুম হোটেলের চাকর, চায়ের বাসন সরাতে এসেছে। বললুম, আ যাও।

কবাট ঠেলে যে এল তাকে দেখেই নিজের ভুল টের পেলুম। পায়ে নাগরা, নাসিকার সানুদেশে চুমড়ানো শৌখিন গোঁফ। যেমন শিকারী বেরালের, তেমনি রইস লোক,—ওই এক নির্ভুল চিহ্ন। উঠে পড়ে নকল সৌজন্য দেখিয়ে বললুম বসুন।

লোকটি ব্যস্ত, কিছু-বা বিব্রত, বসল না; বিশুদ্ধ হিন্দিতে বললে, আপনি ডাক্তার? আমি পাশের ঘরে উঠেছি। আমার স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, একবার আসবেন?

জানা ছিল ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। ডাক্তারকে যে তীর্থস্থানে এসেও নাড়ি টিপে খেতে হয়, সেটা এবার টের পেলুম। লোকটি বোধহয় বুঝে-ছিল, আমি ইতস্তত করছি। ইয়া দশাসই চেহারা, কিন্তু বিনয়ে একেবারে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। বললে, ডকটরসাব, আমরাও এখানে বিদেশী, বনারস থেকে এসেছি, যাব কেদার-বদরি। এখানকার কাউকেও চিনি না। স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, হোটেলওলাকে বললুম একজন ডাক্তারকে খবর দিতে। সে আপনার খোঁজ দিলে। আপনি চলুন ডকটরসাব, আপনার ফীজ আমি দেব।

অগত্যা উঠতেই হল। গলায় জামা এবং জুতোয় পা গলাতে গলাতে বললুম, ফী নেব না, তীর্থে এসে না-হয় কিছু পুণ্যই করা গেল। আসুন, আগে আপনার স্ত্রীকে দেখে তো আসি।

ভদ্রলোক প্রায় প্রৌঢ়, তাকে দেখেই আন্দাজে রোগিণীর একটা চেহারা ধরে

নিয়েছিলুম। উল্কি আর নয়, বিপুল বক্রনেত্র মধ্যবয়সী একটা চর্বি আর মাংসের স্তূপ; বিবৃতোদরা, স্তম্ভোরু। কিন্তু যা দেখলাম তাতে চৌকাঠে এক পলক দাঁড়িয়ে থাকতে হল। দেখলুম যৌবনশেষ ক্ষীণ একটি রমণী বিছানার চাদরের সঙ্গে মিশে ক্রমাগত এ-পাশ ও-পাশ ফিরে ছটফট করছে। ওজনে একটি রাজহংসীর চেয়ে বিশেষ বেশি হবে না, মেদ-মাংসের প্রাচুর্য দূরে থাক, যে-উরজস্ফীতি স্ত্রীলোকের দেহলক্ষণের অন্তর্গত, সে দুটিও এখন ফলহীন বৃন্তবৎ, লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু রোগিণীর রূপধ্যানে ডাক্তারি এথিকস্ অশুদ্ধ হয়, সুতরাং চিন্তাটাকে বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দিলুম না। কাছে গিয়ে বললুম, কী কষ্ট আপনার?

বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, বড়ো জ্বালা।

মুখের একাংশ ঢাকা, বুলিও হিন্দি, তবু চমকে উঠলুম। মনে হল, এ-গলা ইতিপূর্বে কোথায় যেন শুনেছি। শ্রুতি স্মৃতিকে উত্তেজিত করে তুলল। কিন্তু তখনকার মতো কৌতূহল দমন করতে হল।

পরীক্ষা এবং প্রশ্নাদির পর বুঝলুম, পুরোনো অম্বলের ব্যথা, অনিয়মে, পথকষ্টে, অনিদ্রায় বেড়েছে। যতবার ভদ্রমহিলা আমার কথার জবাব দিলেন, ততবার চমকে উঠলুম। মনে হল, পরিচিত কারও কথা শুনছি, নতুবা এই ভদ্র-মহিলাই আর কারও বাচনভঙ্গি নকল করেছেন।

তাড়াতাড়ি একটা প্রেসক্রিপশন লিখে ওর স্বামীর হাতে দিলুম। বললুম, ওষুধটা এখুনি আনিয়ে নেবেন। পথ্য-সম্পর্কিত একটা নির্দেশ দিয়েছিলুম মনে আছে।

লোকটিকে কিছু বিব্রত হতে দেখলুম। ওষুধের দোকান হয়তো অনেক দূর, সে-সময়টা রোগিণী একলা থাকবে। আশ্বাস দিলুম, ভয় নেই। হোটেলের কোনও চাকর পাঠাতে পারেন কিনা দেখুন। তা-ছাড়া আমি তো পাশেই আছি, নজর রাখব।

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে লোকটি বেরিয়ে গেল, আমিও সঙ্গে বেরিয়ে বারান্দায় এলুম। পিছনের দরজা খোলাই রইল।

নদীর পার-বরাবর বারান্দা অস্থির পায়ে চষতে শুরু করলুম। নিস্তেজ, আলোমলিন ঘর থেকে থেমে থেমে ক্ষীণ একটা গোঙানি; যদিও আমি ডাক্তার, মেয়েদের কাছে শুকদেবের মতো, তবু অস্বস্তি একেবারে ছিল না বলতে পারিনে। হরকিপৈড়িতে গঙ্গাপুজোর অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি, ক্লকটাওয়ারে উদ্ভাসিত ঘড়িটার পিছনে কোনও একটা শুক্লা-তিথির ভাঙা-ভীরু চাঁদ একেবারে নিষ্প্রভ। দূরের পাহাড়টা থেকে থেকে বুকে মুখে হালকা মেঘের ওড়না টানে, কখনও সরায়। পাতার নৌকোয় স্রোতের দীপের সারি। নিচের রাস্তায় সস্তার রিকশাওয়ালা মাঝে মাঝে হেঁকে যাচ্ছে—কনখল, কনখল। আর আমি দীর্ঘ আধো-অন্ধকার বারান্দায় স্তম্ভিত, কখনও-শোনা কণ্ঠস্বরকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করছি।

সেই গোঙানির শব্দটুকু নিশ্চয়ই বিচিত্র এই পরিবেশের সঙ্গে বনে গিয়ে-

ছিল, নইলে থেমে যেতেই টের পেলুম কী করে। উঁকি দিয়ে দেখি, মেয়েটি পাশ ফিরে জলের গ্লাসটা ধরতে চাইছে, পারল না, ফস্‌কে-যাওয়া কাঁসার পাত্রটা ঝনঝন করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল, জলে বালিশের একধার ভিজে উঠল।

তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে বললুম, থাক আপনি উঠবেন না, আমি জল এনে দিচ্ছি। কল থেকে জল ভরে গ্লাসটা ওর হাতে দিলুম। ঠিক তখনই চন্ডী-পাহাড় থেকে দমকা একটা হাওয়ায় ওর মুখের কাপড় না সরলে আমার স্মৃতির শবচ্ছদের মতো পুরু আবরণটুকুও সরতো কিনা সন্দেহ।

চমকে উঠলুম। চিনলুম। বুলন্দশহরের দময়ন্তী গুপ্তকে চিনতে এত দেরি হল, এইটেই আশ্চর্য!

চিনলুম বটে, কিন্তু দ্বন্দ্ব গেল না। প্রেসক্রিপশনে লিখেছিলুম ওমপ্রকাশ ভার্গব। টিকটিকির লেজের মতো দময়ন্তী পুরোনো পদবীটা না হয় খসিয়েছেন বুঝলাম, কিন্তু নতুনটা জুড়লেন কী করে?

বিচক্ষণ পাঠক অবশ্য টের পেয়েছেন, ঠিক জায়গায় কথারম্ভ করতে পারিনি। আগের কথা আগে না সারার এই বিপদ। প্রণয়ের যা রীতি, গল্পেরও তাই, অর্থাৎ প্রথমে পায়ে ধরে সাধতে হয়। আমরা এ নিয়ম মানিনে, হঠাৎ কোমর জড়িয়ে ধরি। তাতে ঈপ্সিতা ধরা তো দেয়ই না, ছটফট করে, ছাড়া পেলেই ছিটকে পালায়। রস থাক, একটা যন্ত্রযুগীয় উপমা দিই—ভারী গাড়িকে খানিকটা পিছু হটে তবে সামনে চলতে হয়। আমাকেও অগত্যা তাই করতে হবে, দু'চার কথায় আদি পর্ব সেরে ফিরতে হবে উত্তর খণ্ডে।

ডাক্তারি পাশ করে প্রথম দোকান খুলেছিলুম বুলন্দশহরে। মাঝারি শহর, প্র্যাকটিস্ জমল না। সকালে-বিকেলে তালা খুলে ঘরে ধুনো দেওয়াই সার। আমার আগে যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই রোগী ক'টিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বখ্‌রা করে নিয়েছেন, দেবতারা যেমন সব অমৃত লুঠে করেছিলেন। পরবর্তী-দের জন্যে বিশেষ বাকি রাখেননি। আর একথা তো সবাই জানে, সাধারণ লোকে ভরসা করে প্রাণ সঁপতে পারে মোটে দু'জনকে। অচেনা যমকে আর চেনা ডাক্তারকে।

তাছাড়া পয়সা-দেনেওয়ালা রোগীর সংখ্যাও কম ছিল না। তবে শহরের বারো আনা লোকই ছিল খয়রাতী আম-দবাখানার পেট্রন, বোতলে-পোরা, লাল-নীল জলের খদ্দের।

একটা লোককে, তার নাম যতদূর মনে পড়ছে বিষণলাল, কমপাউনডার রেখেছিলুম। লোকটা কাজ জানত না, সে প্রয়োজনও ছিল না, আমি যতক্ষণ বসে ওষুধের ক্যাটালগ নাড়াচাড়া করতুম, সে বকবক করত। এক মিক্‌শচার তৈরির কৌশল ছাড়া আর সব বিদ্যা ও জ্ঞান তার নখাগ্রে। শহরের পনেরো আনা এগারো পাই লোকের সে নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এই জীবন্ত হুজ্-হু-বিশেষ লোকটির বকবক শুনে আমিও বহু লোকের পরিচয় জেনেছিলুম।

আমার দবাখানা ছিল সদর কাছারির কাছে, দময়ন্তীদের কোয়ারটার

রাস্তার ঠিক ওপারেই। ও'র স্বামী লালচাঁদ গুপ্ত শুনেছিলুম সবচেয়ে শাঁসালো ক্রিমিনল উকিল। ক্রিমিনল কেসের উকিল, নিজে ক্রিমিনল নন, এ-টীকাটুকুর আশা করি প্রয়োজন নেই।

ডাক্তারকুলে যেমন সহস্রমারী, উকিলকুলে ইনি ছিলেন মক্কেলমারী, অর্থাৎ মোটা হাতে মক্কেলদের পকেট মারতেন।

দময়ন্তী শুনেছিলুম ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছিলেন। কলেজের বুড়ি ছুঁয়েছিলেন কি না জানিনে, তবে ও'কে বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে ইংরিজি খবরের কাগজ পড়তে দেখেছি। ছোট মফস্বল শহরে সেকালে সেটাও তাকিয়ে দেখার বস্তু। দময়ন্তী সর্বদা পায়ে চটি পরতেন, পুরো নথ এবং ঘোমটার সাড়ে তিন পোয়া বর্জন করেছিলেন। স্বামীর বন্ধুদের সুমুখে বেরুতেন, তাদের সঙ্গে হেসে কথা কইতেন। তখনকার দিনে এমন সপ্রতিভ ভাব একমাত্র বাঙালী মেয়েদের মধ্যে দেখা যেত।

বয়সে, বলনে, দেহের গড়নে, চলবার ধরনে দময়ন্তীর মধ্যে একটা সৌষ্ঠব ছিল। দর্জির মত ইঞ্চি-গিরের মাপ নিয়ে তিনি রূপবতী ছিলেন কি না কখনও হিসেব করিনি।

একদিন দময়ন্তী আমার ডিসপেনসারিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নতুন কেস পেলুম ভেবে খুশি হব-হব করছি, হঠাৎ দময়ন্তী একটা চাঁদার খাতা খুলে ধরলেন। মেয়েদের একটা সূচীশিল্প প্রদর্শনী করছেন, কিছু দিতে হবে।

লিখলুম পাঁচ টাকা। ধন্যবাদ জানিয়ে দময়ন্তী উঠে গেলেন, দেখি টুলে বসে বিষণলাল মুখ টিপে হাসছে।

ধমক দিলুম, হাসছ যে।

বললে, পাঁচ টাকা দিলেন, তাই।

বেশি প্রশ্ন করে কেঁচো খুঁড়তে ভবসা পেলুম না। বিষণের হাসির মানেটা বুঝেছিলুম। সুন্দর মুখ দেখে পাঁচ টাকা দিয়েছি, অন্য কেউ এলে পাঁচ আনাও পেত না।

বিষণলাল আপন মনেই খানিক পরে বললে, এতেই পার পেলেন ভাববেন না। ও আরও অনেকবার আসবে।

অনেকবার আসবে, কেন?

বিড়বিড় করে বিষণলাল যা বললে তার মর্মার্থ এই, বাঁজা মেয়েমানুষ, দময়ন্তীর কি শখের শেষ আছে। নানান হুজুগ নিয়ে বার মাস মেতে আছে। কুকুর পোষে, পাড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পোশাক বিলোয়।

হুঁশিয়ারিটা ফলেছিল। দময়ন্তী এর পরে মাঝে-মাঝেই এলেন। মফস্বল শহর, আর্ট একজিবিশন নেই, নাচ গানের জলসারও এখন পর্যন্ত চলন হয়নি, তবু হৈ-চৈ-এর এক-একটা ছুতো তিনি ভেবে বার করতেন ঠিক। প্রতিবারই দু'পাঁচ টাকা দিয়ে তবে রেহাই পেতুম।

বাপ-মা-মরা ছেলেমেয়েদের জন্যে দময়ন্তী একটা অনাথাশ্রম খোলার

উদ্যোগ করেছিলেন, আমরাও উৎসাহ দিয়েছিলুম। সরকারী গ্রান্ট এবং মিউনিসিপ্যাল আনুকূল্যের জন্যে চিঠি লেখালেখি চলছিল।

শুধু চাঁদায় চলে না। স্বয়ং লালচাঁদবাবু নাকি হাজার দশেক টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন।

হঠাৎ একদিন শুনলুম অনাথাশ্রম খোলা হবে না। খরচের ভয়ে লালচাঁদ-বাবু পিছিয়ে গেলেন নাকি?

বিষণলালের মুখে শুনলুম তা নয়। লালচাঁদবাবুর প্রচুর আয়, এ-সব ছোটখাটো খরচকে তিনি পরোয়া করেন না। সন্তানাদি নেই তো, সম্পত্তি ভোগ করবে কে। তিনি নিজে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তিতে মজে আছেন, স্ত্রীকেও লম্বা সুতোয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। যা-খুশী করুক। লালচাঁদবাবুকে যেন চেক সইয়ের বেশি হাঙ্গামা পোহাতে না হয়।

শুনলুম, বাগড়া দিয়েছে রতনলাল। লালচাঁদবাবুকে দূর সম্পর্কের ভাগনে, সন্তানাদি না হলে সে-ই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাকেও আমি দেখেছি, উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের ঝাঁকড়া চুল-ওয়ালা ছোকরা, ঘুড়ি আর পায়রা ওড়ানো ছাড়া কোনও বিদ্যা রপ্ত করেনি। অনাথাশ্রম হলে তার ভাগের টাকায় কম পড়ে। সে-ই বলেছে, "মামী, এসব হাল ছাড়ো। বাজে কাজে এ-ভাবে হাজার হাজার টাকা তুমি ওড়াতে পারবে না।"

কিন্তু শুধু তার কথাতে নয়। আরও একটা কারণ ছিল। সেটা আর ক'দিন পরে টের পেলুম। লালচাঁদবাবু কোর্ট থেকে ফিরে ক্লাবে গেছেন। ও-বাড়ির বুড়ি ঝি আমাকে ডাকতে এল।

ডাক্তার হিসাবে লালচাঁদবাবুর বাড়িতে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। বুক পরীক্ষার নল, জ্বরকাঠি ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গেই নিয়েছিলুম, চামড়ার ঝাঁপিটাও ভুলিনি। অনেক অভিজ্ঞতার ফলে দেখেছি ওটা হাতে শক্ত করে ধরা থাকলে মনে কেমন জোর পাই, বুক ধুকধুকটাও অনেক কমে যায়।

জিজ্ঞাসা করলুম, কার অসুখ। শুনলুম স্বয়ং বিবিজীর।

বিশেষ পরীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। চোখের পাতা টেনে এবং দু'চারটে প্রশ্ন করেই যা টের পাবার, পেলুম, তবু নিঃসন্দেহ হতে বললুম, আপনি ঠিক জানেন, এর আগে আপনার কখনও এমন অনিয়ম হয়নি?

সলজ্জ ঘাড় কাত করে দময়ন্তী জানালেন, না।

বললুম, তবে তো আমি যা ভেবেছি, তাই। আমি একটা দুটো ওষুধ লিখে দিচ্ছি। মনে ফুর্তি আর সাহস রাখুন। দু'এক মাস পরে বরং দিল্লি বা লখনৌ গিয়ে একজন লেডী ডাক্তার দেখিয়ে আসবেন।

বুড়ি-ঝি ফের আমাকে সদর অবধি পেঁছে দিল। বাইরের ঘরে রতনলাল বসেছিল, কেমন একটা অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টি, মনে হল আমাকে কিছু বলবে। কিন্তু সুযোগ পায়নি, আমি তার আগেই রাস্তায় নেমে পড়েছিলুম। ডিস-পেনসারিতে পেঁছে চেয়ারে আসীন হবার আগে স্বস্তি পাইনি, মনে হয়েছিল পিঠে তীর বিঁধে আছে। রতনলাল ওর জ্বলন্ত চোখ দুটো দিয়ে আমাকে

অনুসরণ করছিল, তাতে ভুল নেই।

বিষণলালকে সব কথা বলতে সে শুধু হাসলে। ডকটরসাব, এতো হবেই। ওর হাত থেকে এত বড় সম্পত্তিটা ফসকে যাবে, ও চটবে না?

বললুম, সবটা ফসকাবে না। লালচাঁদবাবু ওকে কিছু দেবেন নিশ্চয়ই। বিষণলাল গম্ভীর গলায় বললে, কিছুতে পুরোটার আশা মেটে না, ডকটরসাব।

রতনলাল সেদিনই এসেছিল। তখন অনেক রাত। বিষণলালকে বিদায় দিয়ে দরজায় কুলুপ দেবার উদ্যোগ করছি।

রতনলাল এল। চেয়ারে ধপ করে বসে বলল, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল ডক্টর।

ওর প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। গলা ধাক্কা দিতে হলে ওকে ছুঁতে হয়। সে-প্রবৃত্তি হল না। বললুম, আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন। এ-সব নোংরা কাজ আমি করি না।

এতক্ষণ ওর চোখ জ্বলছিল; এবার লোকটা নির্লজ্জের মত হাসতে শুরু করল। বলল, কত টাকা চান আপনি। হাজার, দু হাজার?

বললুম, লাখেও নয়।

হাসতে হাসতেই রতনলাল বললে, লাখ টাকা কখনও আপনি একসঙ্গে দেখেননি। সে আন্দাজই আপনার নেই। বেকুব না হলে দু হাজারেই রাজি হতেন। কড়া গোছের দু'ডোজ ওষুধ মিশিয়ে দিতেন, কেউ জানতেও পেত না। জানেন, দেহাতি একটা দাই মাত্র শও রুপেয়া পেলেই এ-কাজে রাজি হবে?

দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, রতনলাল তোমাকে আমি পুলিশে দেব।

রতনলালের ব্যবহারে চটেছিলুম, বিস্মিত হইনি। বিস্মিত করলেন লালচাঁদবাবু স্বয়ং। সেটা পরদিনের ঘটনা।

সেদিনও বিষণলাল চলে গেছে। লালচাঁদবাবু এসেই দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন, আমার অনুমতিও নিলেন না। রুপোবাঁধানো ছড়িটা রাখলেন চেয়ারের এক পাশে। ওঁর নিশ্বাসে অল্প অল্প সুরার গন্ধ ছিল, সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলুম।

লালচাঁদবাবু একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, কাল আপনি আমার বাসায় গিয়েছিলেন?

অস্বীকার করা মূর্খতা, বললুম, গিয়েছিলুম।

আমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করেছেন?

সেটাও স্বীকার করলুম।

লালচাঁদবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে ছড়িটা ঠুকঠুক নাড়লেন। হঠাৎ জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঠিক জানেন ডক্টর, আপনার কোন ভুল হয়নি, যা ভেবেছেন তাই ঠিক!

সবিনয়ে বললুম, সামান্য কেস, এ-সব ব্যাপারে ভুল হবার তো কথা নয়। তাছাড়া আপনার স্ত্রীর স্টেটমেন্টের সঙ্গেও আমার সিদ্ধান্ত মিলে যাচ্ছে।

লালচাঁদবাবু বললেন, হুঁ। চেনঘড়িতে সময় দেখে আপন মনেই বললেন, আশ্চর্য।

বললুম, উকিলসাব, বিচলিত হচ্ছেন কেন। বরং খুশি হবার কথা। বংশ-লোপ থেকে বেঁচে গেলেন।

লালচাঁদবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল না, যা আশা করেছিলুম। গুম হয়ে বসে রইলেন, ছড়িটা প্ল্যানচেটের পায়ার মত নিজে থেকে যেন নড়তে থাকল।

তারপরেই লালচাঁদবাবু একটা নাটকীয় কাণ্ড করলেন। খুলে ফেললেন গায়ের আলপাকার কোট, হেঁট হয়ে পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললেন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে ডক্টর। আমার স্ত্রীকে পরীক্ষা করেছেন, আমাকেও পরীক্ষা করতে হবে।

হতভম্ব হয়ে বললুম, কেন।

ততক্ষণ লালচাঁদ পায়ের মোজাও টানতে শুরু করেছেন, ছড়িটা ঠক করে পড়ে গেল মাটিতে। তাড়াতাড়ি ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। বললুম, ব্যস্ত হবেন না, কী ব্যাপার, আমাকে সব বলুন তো।

উত্তেজনায় লালচাঁদের সর্বদেহ কাঁপছে, সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও, বললেন, আমার স্ত্রীর সন্তানধারণের ক্ষমতা আছে জেনেছেন, কিন্তু সন্তান-দানের শক্তি আমার আছে কিনা সেটাও জেনে নিন!

বেশি ঔৎসুক্য প্রকাশ না পায় এমন গলায় বললুম, সে-শক্তি আপনার নেই ভাবছেন কেন?

ততক্ষণে শ্রান্তিতে লালচাঁদবাবুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে, ছড়িটা ফের কুড়িয়ে নিয়েছেন, অবসন্ন গলায় তাঁকে বলতে শুনলুম, জানি বলেই ভেবেছি। মনের অগোচরে যেমন পাপ নেই ডাক্তারবাবু, তেমনি রোগও নেই। আপনাকে লুকোব না, কম বয়সে শরীরের ওপর অত্যাচার করেছিলুম। আপনাদের কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে নাকি আঠারো ঘা, কিন্তু এক ঘায়েই আমাকে নিষ্ফলা করে গেছে।

রোমাঞ্চিত বোধ করলুম। চিকিৎসা ব্যবসায়ে এর পরে বহু লোকের বহু স্বীকারোক্তি শুনতে হয়েছে, কিন্তু প্র্যাকটিসের প্রথম-পর্বে অর্ধ-পরিচিত শাঁসালো একটি উকিলের ভাঙা-ভঙা জবানবন্দী শুনে গায়ে যে কাঁটা দিয়েছিল, সে-অনুভূতিটুকু এখনও ভুলিনি।

লালচাঁদবাবুকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কী করে জানলেন।

সুরাপানে ঈষৎ-লালচে চোখ দুটি কিছুক্ষণ আমার মুখে ন্যস্ত করে লালচাঁদ চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে বললেন, আমি আগেও একবার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলুম। তিনজন স্পেশালিসট, তারা কিছু লুকোয়নি। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল, ভোগের ক্ষমতা আমার অটুট থাকবে, কিন্তু সন্তানের পিতৃত্ব কখনও পাব না।

হাত বাড়িয়ে লালচাঁদ এক গ্লাস জল চাইলেন, এনে দিলুম। গলা ভিজিয়ে

লালচাঁদ ফের শুরু করলেন, কিন্তু দময়ন্তী এ-কাজ কেন করল ডাক্তারবাবু, আমি তো ওকে ঠকাতে চাইনি। বিয়ের পরই ভয়ঙ্কর কথাটা যেই জেনেছি, অমনি নিজেকে দূরে দূরে রেখেছি। দময়ন্তীর শরীরটা নষ্ট করতে চাইনি।

মনে মনে হাসলুম। একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেহটা বাঁচানোর যুক্তির মধ্যে যে-ফাঁকি আছে, সেটা এই অনুতপ্ত প্রায়-প্রৌঢ় লোকটিকে ধরিয়ে দিলুম না।

লালচাঁদ বলে গেলেন, দময়ন্তী কিছু জানত না। নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে মেতে থাকতে ওকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি। সারাদিন মামলা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ভান করেছি। সন্ধ্যাটা কাটিয়েছি ধরুন ক্লাবে। মদ ফের ধরেছি, রাতে ও ঘুমিয়ে পড়লে পা টিপে টিপে চোরের মতো বিছানায় উঠেছি।

জেরা করলুম, প্রতিজ্ঞা কোনোদিন ভাঙেননি?

স্পষ্ট নগ্ন প্রশ্নে লালচাঁদবাবু শিউরে উঠলেন, আপনা থেকেই ওঁর মাথা নুয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে বললেন, ভেঙেছি। আমি পশু হতে পারি ডাক্তার, কিন্তু মানুষও তো? এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে পাঁচবার কি ছয়বার। কিন্তু তাতেও তো এই ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়।

নীরস গলায় বললুম, কেন।

নোয়ানো মাথা নেড়ে নেড়ে লালচাঁদ বললেন, আমার রক্ষিতাও ছিল। লখনৌতে একজন, বনারসে একজন, একজন দেহ্‌লিতে। কিন্তু তারাও কোনোদিন সন্তান-সম্ভবা হয়নি ডাক্তার।

আমি কোনও মন্তব্য করলুম না, লালচাঁদবাবু নিজেই দম নিয়ে বললেন, অথচ দময়ন্তী হল, সামান্য একবার কি দুবারের সঙ্কল্পচ্যুতি, তাতেই। তাই তো আমি আবার নিজেকে পরীক্ষা করাতে এসেছি ডাক্তার, ভাল করে জেনে নিতে চাই, সেই স্পেশ্যালিস্‌টরা কি সেদিন তবে ভুল করেছিল।

লালচাঁদ গুপ্তকে সেদিন পরীক্ষা করেছিলুম। ছোট ডিসপেনসারি, সাজ-সরঞ্জাম অল্প। যথাসাধ্য করলুম। বললুম, রিপোরট্‌ কাল দেব।

রিপোরটে অপ্রত্যাশিত কিছু ছিল না। নিঃসংশয়ে জেনেছিলুম, স্পেশ্যা-লিস্‌টদের ভুল হয়নি।

সে-রিপোরট্‌ অবশ্য লালচাঁদবাবু পাননি। কেননা কয়েকটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা অতঃপর ঘটে গেল। পরদিন সকালেই শুনলুম, দময়ন্তী নিরুদ্দেশ। বিষণলাল আমাকে ফিসফিস করে জানালে, রতনলালেরও খোঁজ নেই। গুজব দুয়ে দুয়ে চার করলে।

পুলিশ-কোরটের বড় উকিল নিজে, কিন্তু পুলিশের শরণ নিলেন না, গা-ঢাকা দিলেন। সপ্তাহখানেক পরে খবর পেলুম তিনিও শহর ছেড়েছেন।

আমি জানি, এ কাণ্ড না ঘটলেও লালচাঁদ আমার কাছে রিপোরট্‌ নিতে আসতেন না। সুরার প্রভাবে দ্রবীভূত চিত্ত নিয়ে গভীর রাত্রে অপরিচিত এক ডাক্তারের কাছে জীবনের গোপন-রহস্য উন্মোচন করেছিলেন—সেটা নেহাত সাময়িক বৈকল্য; দিনের আলোয় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পারতেন না।

এর বছরখানেক পরে আমিও বুলন্দশহরের পাট তুলে আগ্রা চলে আসি।

এই আগ্রাতে আমি যদি ওদের দেখা না পেতুম তবে দময়ন্তী চরিত্রের অনেকটাই আমার কাছে অনাবৃত থেকে যেত।

চিপিটোলার ডিসপেনসারিতে বসে আছি, বিকেল থেকে টিপটিপ বৃষ্টি, ডিসেমবরের শেষ, কনকনে হাওয়া, হাড়ে ছুঁচ-বেঁধা শীত। রাস্তায় পুরু কাদা, লোকজনের যাতায়াত বিরলতর হয়ে এসেছে, সেদিনকার মতো ঝাঁপ বন্ধ করব কিনা ভাবছি, হঠাৎ ফোরটের আড্ডার দিক থেকে একটা হল্লা শুনতে পেলুম। সংগে সংগে দোকানপাট বন্ধ হতে থাকল. শুনলুম দু'দল মাতালে দাংগা বেধেছে। সোরগোলটা এদিকেও আসছিল, বাইরে তো যাওয়া যাবে না, আমিও ভিতর থেকে দরজা এঁটে দিলুম। ফটফট সোডার বোতল তো ভাঙছেই, ছোরাছুরিও চলছে শুনলুম, পটকাও ফাটছে।

দুরদুর বুকে বসে আছি, মনে হল হল্লাটা যেন আমার দরজার সামনে পেঁাছেই স্তব্ধ হয়ে আছে। একটু পরেই দরজায় টোকা পড়ল, একটি দুটি নয়। অস্থির হাতের। সেই সংগে আর্ত চিৎকার, ডকটরসাব!

দরজা খুলতেই হল। দেখি দাংগাকারীর দল মোড় অবধি এগিয়ে গেছে, রাস্তা-ভরতি এখন কাচের টুকরো। অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল সিঁড়ির উপরে একটা লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তার কানের পাশ দিয়ে একটি শীর্ণ রক্তের ধারা গড়িয়ে যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরলুম। মোড়ের দিকটা লালে লাল, পুলিশ এসেছে। লোকটাকে ভিতরে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা করলুম। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই লোকটা চোখ মেললে। আঘাত গুরুতর নয়, লোকটা মূর্ছা গিয়েছিল প্রধানত ভয়ে। চোখ মেলেই ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বললে পুলিশ—

বললুম, পুলিশ আসবে না। তুমি এখানে আছ, না দাংগার দলে ছিলে, কেউ টের পাবে না। ঠিকানা বলো, আমি তোমাকে বাসায় পেঁাছে দেবার ব্যবস্থা করছি।

লোকটা আবার চোখ বুজলে। জড়িতস্বরে বললে, টের পাবে। মুন্নাজানই ওদের বলে দেবে। বলতে বলতে ওর মুদিত চোখের পাতা দুটিই ঘৃণায় কুঞ্চিত হল। দাঁতে দাঁত ঘষে লোকটা উচ্চারণ করলে—থাক, কুৎসিত শব্দটা লিখে কাজ নেই।

পণ্য-রমণীর ঘরে এরকম হাঙ্গামা মাঝে মাঝে হয়, জানি। তারই কয়েকটা টুকরো আজ সদর রাস্তায় ছিটকে এসেছে। আঁতুড়ে বাচ্চার মুখে যেমন মধু দেয়, লোকটার জিভে তেমনি কয়েক ফোঁটা ব্র্যানডি ঢাললুম। কিছুক্ষণ পরে চাংগা হয়ে ও বললে, বাড়ি যাব।

বললুম, একা তোমাকে এ-অবস্থায় ছাড়তে পারিনে। ঠিকানা আমাকে দাও। তোমার বাড়িতে খবর দিচ্ছি।

লোকটা আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল, তখনও স্নায়ুভীতি বশে থেকে-থেকে কাঁপছে, উঠতে চেষ্টা করল, ব্যর্থ হয়ে বলল, আচ্ছা।

লোক-মারফত খবর পাঠালুম। লোকটার বাসার ঠিকানা রাজা-কি মণ্ডির কাছাকাছি। ওকে নিতে প্রায় এক ঘণ্টা বাদে একটা স্ত্রীলোক নামল। মাথায় ঘোমটা, বেশভূষা সাধারণ। তবু দেখামাত্র চমকে উঠলুম, চিনলুম।

দময়ন্তীও আমাকে চিনেছিল নিশ্চয়। সেই গভীর রাতে ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ওকে বলতে হয়েছিল, কিন্তু মাথার ঘোমটা খসতে দেয়নি, মুখের একাংশ আড়াল করে রেখেছিল।

এসেই দময়ন্তী ধপ করে মাটিতে বসে পড়েছিল। রতনলালের ব্যানডেজ-বাঁধা মাথাটা কোলে টেনে নিয়েছিল। ক্ষতটাও একটু টেনেটুনে হয়তো দেখত, যদি না আমি ধমক দিতুম।

বুলন্দশহরের মহিলাটির আভিজাত্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। বারবার আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় চোট লেগেছে ডকটরসাব, ভয়ের কিছু নেই তো?

বললুম, ভয়ের কিছু নেই। সামান্য ক্ষত। হঠাৎ রাস্তায় পা পিছলে পড়ে গিয়ে—

ঘোমটায় মুখ ঢাকা, তবু দময়ন্তীর মুখের বাঁকা হাসিটুকু অনুভব করলুম।—মিছিমিছি আমাকে ভোলাচ্ছেন বাবুসাব—আমি সব জানি। ও মন্নুজানের ওখানে গিয়েছিল। আজ তলব পেয়েছে যে! ওই খারাপ মেয়েটাই ওকে খাবে।

দময়ন্তীর মুখে কয়েকটা ঘৃণার রেখা ফুটে উঠবে ভেবেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আশ্চর্য মমতায় ও রতনলালকে জড়িয়ে ধরেছে। ওর উপর ভর রেখে আহত লোকটি কোনও মতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দময়ন্তী পিছন ফিরে একবার বললে, বাবুজী, এবার নিয়ে যাই?

ওর হাতে একটা ওষুধ দিলুম। বললুম জ্বর হতে পারে। পরিচর্যা সম্পর্কে ভারিক্কি ডাক্তারি চালে পরামর্শও দিলুম কয়েকটা।

ভাবলুম এখানেই ব্যাপারটা চুকে গেল। কিন্তু যায়নি। পরদিন সকালে দোকানের ঝাঁপ খুলতে না খুলতেই দময়ন্তীর চিরকুট এসে হাজির, এখুনি একবার যেতে হবে।

পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়ব ভয় ছিল, তবু গেলুম। অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে তবে ওদের বস্তি। বস্তিই বলব, দুর্গন্ধ, খোলা নর্দমা ঘিরে সারি সারি খাপরার ঘরকে আর কী বলা চলে।

বাইরে বারান্দায় একটি শিশু মাটি ঘাঁটছে, তার গায়ে একগাছি সুতোও নেই। আমার জুতোর শব্দে চমকে সে কেঁদে উঠল। ছায়াচ্ছন্ন ঘরখানির মধ্যে ব্যানডেজ-বাঁধা মাথা নিয়ে রতনলাল শুয়ে, তার শিয়রে দময়ন্তীকে বসে

থাকতে দেখলুম। কাল রাতে মুখ লুকিয়েছিল, আজ ঘোমটার চিহ্নটুকু নেই। আমাকে চিনেছে সেটা স্বীকার করতে সংকোচ নেই, আমি পাছে চিনে ফেলি সে ভয়টুকুও নেই।

বললুম, কেমন আছে, এখন।

ম্লান হেসে দময়ন্তী বললে, ভাল। কাল সারারাত কিন্তু ছটফট করেছে। ভুলও বকছিল।

বললুম, ও কিছু না। রতনলালের নাড়ি ধরলুম। বাইরের বাচ্চাটা তখন থেকে ট্যাঁ-ট্যাঁ করছে, থামেনি। ইশারায় রতনলাল দময়ন্তীকে বলল, বাচ্চাটাকে ধরতে। ওকে কিছু খেতে দিয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন তো ডকটরসাব।

জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন ছিল না। উপবাসী শিশুর মুখ দেখলেই চেনা যায়।

রতনলাল বললে, মা তো নয়, শয়তানী। কাল সারারাত বাচ্চাটা কেঁদেছে, তবু আমার শিয়র থেকে ওঠেনি। এত বেলা পর্যন্ত ওকে একটা রুটিও দেওয়া হয়নি। মেয়েলোকটার দয়ামায়ার নামমাত্র নেই ডকটরসাব।

নতুন ওষুধ ব্যবস্থাপত্রে লিখে দিয়ে চলে আসছি,—দময়ন্তী আমার পিছন-পিছন এল। সারা মুখে আতঙ্ক আর উদ্বেগ লেখা। জিজ্ঞাসা করলে, ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে তো ডকটরসাব, ফের কারখানায় যোগ দিতে পারবে?

ভেবেছিলুম একান্তে ডেকে ওকে কয়েকটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব। করিনি, রুচিতে ঠেকল। একদা সেরা উকিলের ঘরণী হয়ে যদি কারখানার মজুরের রমণী হয়ে সুখী হয়ে থাকে, হোক। জেরায় জেরায় ওকে বে-আব্রু করে কাজ নেই।

আমার হাতে দুটি টাকা দিয়ে দময়ন্তী বললে, আপনাকেই খবর দিলুম বাবুজি, অন্য কাউকে ডাকতে ভরসা পাইনি। আপনি কালকের ব্যাপারটা জানেন, অন্য কেউ হয়তো পুলিশকে জানিয়ে দিত।

পুলিশকে মন্নুজানই জানিয়েছিল। তিন দিনের দিন দময়ন্তী শুকনো মুখে এসে জানালে, রতনকে ধরে নিয়ে গেছে, সে এখন জেল-হাসপাতালে।

উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, মামলায় কী হবে ডকটরসাব?

—কী আর, বড়ো জোর জেল।

মাথা নিচু করে দময়ন্তী কী যেন ভাবলে। আঁচল থেকে একজোড়া দুল টেবিলে রেখে বললে, এই আমার শেষ সম্বল বাবুজি, আর কিছু নেই।

বুঝলুম, দময়ন্তী মুখোশ এবার খসাবে। তারই সুযোগ খুঁজছে। হাতের আন্দাজে দুল দুটোর ওজন নিয়ে বললুম, উকিলের খরচ এতেই কুলিয়ে যাবে।

হঠাৎ ভেঙে পড়ল দময়ন্তী, দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। আপনি তো সব জানেন ডকটরসাব, আপনাকে কিছু লুকোব না। দু'হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলুম, এ দু' বছরে সব গেছে। অনেক বলেও ওকে মানুষ করতে পারলুম না। সেই নেশা, সেই বাইরের মেয়েমানুষের ওপর টান—

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, তুমিও তো ঘরের আউরত নও দময়ন্তী!

দেখলুম দময়ন্তীর মুখ সাদা হয়ে গেছে, থর থর কাঁপছে। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে দময়ন্তী বললে, কিন্তু আমি ওকে ভালোবাসি।

এবারে না হেসে পারলুম না। ভালোবাসাই যদি সব রোগ আর পাপের দবাই হত দময়ন্তী, তবে পৃথিবীতে এত ডাক্তার আর পুলিশের দরকার হত না।

রতনের মাসখানেকের মতো জেল হয়েছিল জানতুম, কিন্তু ওর খালাসের দিনটি মনে রাখিনি। একদিন সকালে ডিসপেনসারি খুলতে গিয়ে সিঁড়িতে ওকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। মাথার ঘা শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু শরীরটা আরও শুকনো, গর্তে লুকোনো চোখ দুটির দৃষ্টি তীব্রতর।

বললুম, কী ব্যাপার, কবে ছাড়া পেলে? আবার দাংগা করবার মতলব নাকি?

ঠাট্টাটা গায়ে মাখলে না, উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললে, ডকটরসাব, একবার আমাদের বাসায় যেতে হবে। বাচ্চাটার খুব অসুখ।

রোগী ফিরিয়ে দিতে পারি, তখনও এমন পসার হয়নি। বললুম, চলো।

আবার সেই দুর্গন্ধ, খোলা নর্দমা, নিচু-নিচু অন্ধকার খাপরার চালা। দময়ন্তীকে দেখতে পেলুম না। দাঁতে দাঁত ঘষে রতনলাল বললে, বেড়াতে বেরিয়েছে। ছেলেটা জ্বরে ধুঁকছে, কোন হুঁশ যদি থাকে। জানেন ডকটরসাব, মেয়েমানুষটার মতো বদমাস দুনিয়ায় দুটি নেই। বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে পণ করেছে।

বললুম, সে-কী!

—নয়তো কী? অসুখটা আর কিছু তো নয়, আমি যে ক-দিন জেলে ছিলুম, ওকে ভালো করে খেতে পর্যন্ত দেয়নি। বাইরে বাইরে ফেলে রেখেছে, বুকে বাচ্চাটার সর্দি বসে গেছে। এই যে এখন এত জ্বর, একবার দেখে? বাচ্চাটাকে আমি বুকে আগলে আগলে রাখি। জেনানার কল্‌জে এত শক্ত হয়, কোথাও শুনেছেন?

মাসখানেক আগে এই বাসাতেই রতনলালের শিয়রে সেবারত দময়ন্তীকে দেখেছিলুম। সে-কথা আর তুললুম না।

নিউমোনিয়া হয়েছিল, পরদিনই বাচ্চাটা মারা গেল। মৃতদেহটা বুকে জড়িয়ে রতনলালকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখেছি। দময়ন্তী একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ঠান্ডা, নিশ্চল, ভাবলেশহীন। ওর চোখে বিন্দুমাত্র জল দেখিনি।

সেদিন দময়ন্তীকে ঘৃণা করেছিলুম। সব খুইয়েছে, কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় মমতাটুকুও কেন দময়ন্তী হাতে রাখেনি!

আজ পাঁচ বছর পরে খরস্রোত ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, এ-প্রশ্নটার উত্তর সেদিনই দময়ন্তীর কাছে জেনে নিলে হত। আজ সময় নেই। সেদিন এক মজুরের ঘরণীকে অসংকোচে যে-কথা জিজ্ঞাসা করা চলত, আজ

বিশিষ্ট জমিদারের অঙ্ক-শায়িনীর কাছে তার ইঙ্গিতমাত্র দেওয়া বেয়াদপি। সমাজের অলিখিত আইন এমনি।

হোটেলের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে আসি। কুয়াশা কেটে যায়। আবার জমে। মেঘের ভাঁজে ভাঁজে কাঁপা-কাঁপা আলোর তরঙ্গ। সূর্যোদয়ের প্রাক্-মুহূর্ত।

দরজায় টোকা পড়ল, পিছনে চেয়ে দেখি ওমপ্রকাশ গুপ্ত। বলিষ্ঠ দেহ, পায়ে নাগরা, চুমড়ানো গোঁফ।

নমস্কার করে বললেন, আমি একবার লছমনঝোলায় যাচ্ছি, ডকটরসাব। দুপুরেই ফিরব।

বললুম, আপনার স্ত্রী এখন কেমন?

—একটু ভালো। ওষুধ সব ডোজই দিয়েছি, ঘুমোচ্ছে। একটু নজর রাখবেন। তীর্থ দর্শন করতে এসেছিল, পারল না, অসুখে পড়ল। বেচারা! একটু নজরে রাখবেন।

প্রতিশ্রুতি দিলুম, রাখব।

—মেহেরবানি, বলে ওমপ্রকাশ বিদায় নিলে।

সিঁড়িতে ওর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই এদিকে বারান্দায় কার ছায়া পড়ল। চেয়ে দেখলুম, দময়ন্তী।

আসবে, জানতুম। কিন্তু এত শীঘ্র, ভাবিনি। এতক্ষণ তবে ঘুমোয়নি, ঘুমের ভান করে পড়েছিল।

বললুম, আসুন মিসেস ভার্গব।

আগ্রার বস্তিতে অনায়াসে তুমি বলেছি, কিন্তু হরিদ্বারের হোটেলে যথা-বিহিত সম্মান না দেখিয়ে পারলুম না।

—কেন, ভয় হল মিঃ ভার্গবকে সব বলে দেব?

দময়ন্তী মাথা তুললে। মুখখানির ঢলঢলে দৃষ্টিটুকুই অবশিষ্ট আছে। বললে, ও সব কথা জানে না ডকটরসাব, ওকে কিছু বলবেন না।

নীরস হেসে বললুম, সব কথা তো আমিও জানিনে দময়ন্তী। শুনতে চাই। রতনলালের কী হল, তাকে ছাড়লে কেন?

আবার দময়ন্তীর মুখ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। অস্ফুট গলায় বললে, আমি তো ছাড়িনি, সে-ই আমাকে ছেড়ে গেছে।

ইঙ্গিতে দময়ন্তী ওপর দিকে দেখিয়ে দিলে, বুঝলুম, কোথায়।

জিজ্ঞাসা করলুম রতনের কী হয়েছিল?

—শরাব খেয়ে খেয়ে ওর শরীরে কিছু ছিল না ডকটরসাব। শেষতক, তাতেই গেল।

রূঢ় গলায় বললুম, সে মরে যেতে না যেতে অন্য পুরুষের আশ্রয় নিলে? তুমি না তাকে ভালোবাসতে দময়ন্তী?

দময়ন্তী জল টলমল আয়ত দুটি চোখ তুলে তাকাল।

—বাসতুম বাবুজি। এখনও বাসি। কিন্তু আপনি যা ভেবেছেন সে-ভাবে

নয়।

যেন বিদ্যুতের চমক খেলুম। সেভাবে নয়, তবে কীভাবে রতনলালকে ভালোবেসেছিলে দময়ন্তী?

মাথা নিচু করে দময়ন্তী বললে, ছেলের মতো।

নিজের সমস্ত সত্তাকে প্রবল কণ্ঠে হেসে উঠতে শুনলুম।—রতনলালকে তুমি ছেলের মতো ভালোবাসতে দময়ন্তী? অথচ তারই সঙ্গে পালিয়েছ, বছরের পর বছর ঘর করেছ, সবই কি—

বাধা দিয়ে দময়ন্তী বললে, সত্যি। আপনারা যা দেখেছেন তা সত্যি ডকটর-সাব, শুধু যা ভেবেছেন সেটুকু ঝুটা। ততক্ষণে দময়ন্তী নিজেকে শক্ত করেছে, চোখে কান্নার বাষ্পমাত্র নেই। নম্র অথচ স্পষ্ট গলায় বলল, আমাকে কেউ বোঝেনি ডাক্তারজি, আমার স্বামী না, রতন না, আপনি না। একটু দরদ থাকলে বুঝতেন, বিয়ে করেও যে-মেয়ে কোলে ছেলে পায় না তার দুঃখ। একটু ভেবে বলুন তো বাবুজি, আমি কী পেয়েছি। স্বামী? সে আমাকে কোনোদিন ছেলে দিতে পারত না।

বললুম, তাই বলে—

বাধা দিয়ে দময়ন্তী বললে, আমাকে বলতে দিন। সে-দুঃখও আমি ভুলতে রাজি ছিলুম। আপনি তো জানেন বাবুজি, পরের ছেলেমেয়ে আমি আপন করতে কী না করেছি। রতন যখন এল, ওর বয়েস তখন সতেরো, আমার বাইশ। সুন্দর কচি মুখ, ওকে আমি মায়ের মতো ভালোবাসলুম। মনে হল টাকা আর সামাজিক মান আমাকে যে-শান্তি দেয়নি এতদিনে তা পাব। স্বামীসুখ পাইনি, পুত্রসুখ পাব।

অবিশ্বাস উবে গিয়েছিল, রুদ্ধশ্বাসে বললুম, তারপর?

দময়ন্তী ম্লান হাসলে।—আমার নসিবে কোনোটাই ছিল না বাবুজি। রতন আমাকে সে-চোখে দেখলে না। ওর ওপর আমার টানের অন্য রকম অর্থ করলে। প্রথম প্রথম বুঝিনি। সুযোগ পেলেই ও যখন তখন আমায় জড়িয়ে ধরত। অস্বস্তি হত, তবু চটিনি, ভাবতুম ছেলেমানুষ। পরে বুঝেছিলুম ও অল্প বয়সেই বিগড়েছে। কিন্তু বুঝলেই স্নেহ সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় না বাবুজি। ওকে বাধা দিতুম, বোঝাতে চেষ্টা করতুম, ও বুঝতে চাইত না। মাথা নেড়ে বলত, আমি জানি তুমি ভয় পাচ্ছ, তোমার মনের কথা অন্য। নইলে কেন তুমি আমাকে এত টাকা দাও, রোজ খাবার নিয়ে আমার জন্যে বসে থাক। আমাদের গাঁয়ের অনেক মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছি, এসব টানের মানে জানি। মেয়েদের সব রীতি আমার জানা আছে, পেটে খিদে মুখে লাজ।

শুনে শরীর কাঠ হয়ে যেত। ভাবতুম ঠাস করে একটা চড় মারি। কিন্তু কচি মুখখানির দিকে চেয়ে সব ভুলে যেতুম। সেই মায়াই আমার কাল হল। একদিন অন্ধকারে আমার বিছানায় এসেছিল, স্বামী তখন মফস্বলে। চেঁচিয়ে উঠতে যাব, ও আমার মুখে হাত চাপা দিলে। বললে, বাধা দিলে পালিয়ে যাবে, বিষ খাবে। ওকে বরাবরের মতো আমি হারাব। সে কথা বিশ্বাস করলুম।

আমার নীতির শিকড়সুদ্ধ নড়ে গেল। একটিমাত্র সুখ আমার, একটিমাত্র শান্তি, তাও যাবে!

হঠাৎ দময়ন্তী থামল। ঠোঁটের কোণ শুকনো. চোখের মণি বালি-ধুধু প্রান্তরের মতো জ্বলছে। ঠোঁট দুটি আলাদা হতেই তিতো একটু হাসি ঝরে পড়ল—বাকিটা আর নিজ মুখে বলব না ডকটরসাব। যাকে ছেলের মতো ভালো-বাসি, তাকে কাছে রাখতে তার সন্তানের মা পর্যন্ত হতে হল। সেই গ্লানিটুকু কল্পনা করে নিন।

অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলুম না। নিচের রাস্তাটা জেগে উঠেছে, মিনিটে মিনিটে হর্ন বাজিয়ে ছুটছে হৃষীকেশের বাস। হরকিপৌড়িতে স্নানার্থীদের কলরব বাড়ছে। লাঠি-লোটা-সম্বল কাতারে কাতারে পথচারীর স্রোতও দেখছি। দূরের পাহাড়ের ঢেউ লক্ষ্য করে হাঁটি-হাঁটি এগোচ্ছে। শ্রীনগর, কীর্তিনগর. রুদ্র প্রয়াগের পথে কবে কেদার-বদ্রি পেঁছোবে. এরাই জানে।

এতক্ষণে সেই প্রশ্নটা করবার সুযোগ পেলাম।

গ্লানি ছিল বলেই বুঝি বাচ্চাটাকে ভালোবাসতে পারলে না, দময়ন্তী? অনায়াসে মরে যেতে দিলে?

দময়ন্তী চমকে উঠল। ফ্যাকাসে মুখে চেয়ে বললে, কে বললে?

—কে আবার বলবে। আমার চোখ দুটো তো বন্ধ ছিল না।

দময়ন্তী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না, শাড়ির পাড় আঙুলে জড়াতে লাগল। খানিক পরে আস্তে বলল, ভালোবাসব না কেন. বাসতুম। কিন্তু কী জানেন, ওকে দেখলেই কেমন নিজের ওপর ঘেন্না হত. মরে যেতুম। আর...বোধ হয় হিংসেও করতুম। রতনকে ও আমার কাছ থেকে আরও দূরে নিয়ে গিয়ে-ছিল। হঠাৎ অস্বাভাবিক দ্রুত গলায় দময়ন্তী বলে উঠল. আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন. ও যখন পেটে এল. রতনলাল তখন ভয় পেয়েছিল।...ওকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। অথচ কোলে যখন এল, রতনলাল সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেল। নিজের ছেলে তো. পাগলের মতো ভালোবাসত বাচ্চাটাকে।

ধীরে ধীরে, কিন্তু নির্মম গলায় বললুম. সে তো তোমারও নিজের ছেলে ছিল দময়ন্তী।"

মাথা তেমনই নিচু, শাড়ির পাড়ে আঙুল জড়াতে জড়াতে দময়ন্তী বললে, ছিল। কিন্তু প্রথম সন্তান তো নয়!

ভালোবাসার কালো টাকা

রাস্তা তো জানাই ছিল। বাড়িটাকেও সে চিনতে পারল। স্যাঁতলা ছপছপে উঠোন, তবে ব্রতবান জানত, তার ভেতরের কেউ তাকে বলে দিয়ে থাকবে, তার পা পিছলোবে না। পা টিপে টিপে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল। সেই সিঁড়ি, সেই কত অজস্রবার সটান ওঠা, এ কি ব্রতবান নিজেই উঠে এসেছে, নাকি অন্য কেউ? চারধারে আয়না-টায়না কিছু নেই, ভাগ্যিস! যদি গাড়িটা থাকত তবে অন্তত, পিছন-দেখা আয়নাটায় তার মুখটাকে দেখতে পেত। তাহলে সনাক্ত করা সম্ভব হত যে, কে এসেছে। ব্রতবান অথবা তার মুখোশপরা অন্য কোনও মানুষ।

যেহেতু গাড়িটা এখন এই সুতোর মত সরু গলিটারও বাইরে তাই রিয়ার-ভিউ মিরারের চালিয়াতির কথাই ওঠে না। এখন সেই পুরনো কাঠের সিঁড়ি, সেটারও বয়স হয়েছে, তাই আগে খটখট করত, এখন মচমচ করছে। আচ্ছা আমারও কি বয়স হয়েছে? চুলে পাক ধরেছে, কাছে পিঠে আয়না নেই, তাই ব্রতবান তার মুখ চোখ চুল কিম্বা গালের দাগ আর ভাঁজটাজ কিছু দেখতে পেল না—ভাগ্যিস!

কতদিন পরে? রোজ সকালে যখন সে টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজে, বিজলী শেভারে ক্ষৌরি হয়, তারপর বাথসল্ট আর অশেষ সুগন্ধি লোশনে ভরপুর টবটাতে নিজেকে সঁপে দেয়, ডুবিয়ে দেয়, তখন তার শরীরের মুখের রোজ রোজ রোজগার করা দাগটাগগুলো সে একদম বুঝতে পারে না। ওসব খানিকটা গন্ধে অনেকটাই জলে ধুয়ে মুছে যায়।

আজ তো সে রকম না! সেই বাড়িটা আর সেই সিঁড়িটা যে সেই রকমই আছে! এখানে ব্রতবান মাঝে মাঝে আসে। কেন, সে জানে না। হয়তো কোন না-জানা টানে। জগতে মাধ্যাকর্ষণ অনেক রকমের আছে, থাকতে পারে। হয়তো তেমনিই একটা অদৃশ্য অবোধ্য আকর্ষণ তাকে এই বাড়িটায় টেনে আনে।

ব্রতবান কি শুধু একটা কাঠের সিঁড়ির আওয়াজ শুনবে বলেই আসে? জানে না, সে একদম বোঝে না। তবু আসে। মাঝে মাঝে, এই মুহূর্তে আমি, এই লেখক এবং আপনারা যাঁরা পাঠক, তাঁরা দেখতে পাচ্ছি বা পাচ্ছেন, ব্রত-বানের হাতে কয়েকটা ওষুধের শিশি। আরেকটা হাতে কয়েকটা আপেল-টাপেলের মতো সুস্বাদু স্বাস্থ্যপ্রদ ফল।

সীমিতা বলল, আবার এসেছো? আবার ফলটল এনেছো কতদিন পরে বলতো?

যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, এমন গলায় ব্রতবান বলল, এনেছি। এসেছি। কতদিন পরে, হিসেব নেই।

সীমিতা বলল, আগে আমি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখতাম। তখন তুমি দুচার মাস অন্তর অন্তরই আসতে।

ব্রতবান বলল না, বলতে পারল না, তখন আমার রোজগার যে ছিল বড় জোর দুচার হাজার! মাস দিয়ে হাজার-টাজার মাপতাম।

যেহেতু এ সব সে বলেনি, বলতে পারেনি, তাই সীমিতাকেই কথার খেই-টাকে টেনে নিয়ে যেতে হল। ব্রতবান শুনতে পেল, সীমিতা বলছে, আগে ক্যালেণ্ডারে দাগ দিতাম। যখন তুমি যখন তখন আসতে। অনেক দিন অনেক বানের জলের মতো এইভাবে চলে যেতো না।

বলতে বলতে একটু হাঁপাচ্ছিলো সীমিতা। ফের যেখানে কথাটাকে ছেড়ে দিল সেইখানেই ধরে বলল, এখন তো আর দিন নয়, বছরের পর বছর পার হয়ে যায়। একটা ক্যালেণ্ডার ফেলে দিয়ে আরেকটাকে টাঙ্গাই। পাতার পর পাতা মাসের পর মাস ছিঁড়ি। তার তবু দেখা নেই। সে আসে না।

ব্রতবান জিগ্যেস করল না, কে?

সীমিতার বিছানার পাশে হাঁটু নুইয়ে বসল। এই নোয়ানো যেন তার মাথা নোয়ানো। বলল, ক্ষমা করো, সীমিতা, ক্ষমা করো। তার দুই চার হাজার ইতিমধ্যে যে আট দশ হাজার ছাপিয়ে গেছে, মুখ ফুটে সে কথা সে বলতে পারলো না।

বিছানায় আধ-শোয়া সীমিতা তখনো বলে চলেছিলো, তবু তো তুমি আসো। এই জানালার বাইরে তাকিয়ে দ্যাখো। একটা কদম গাছ ছিল না? সেটা নেই। আমিও এতদিনে 'নেই' হয়ে যেতে পারতাম কিন্তু!

বলতে বলতে প্রতিপদের চাঁদের মতো একটুখানি হাসি সীমিতার শীর্ণ ঠোঁটের কোণে খেলে গেল। সেই হাসিটা ফুটে উঠল ব্রতবানের মুখে। সীমিত লক্ষ্য করল। বলল, আগে ভাবতাম, আমার অসুখটাই ছোঁয়াচে, এখন দেখছি আমার হাসিও তাই। তুমি একটু সরে বসো ব্রত!

ব্রতবান সরে বসলো না, বরং আর একটু এগিয়ে তার ডান হাতটা রাখল সীমিতার কপালে। বলল, কোন ছোঁয়াচেই আমার ভয় নেই। এক সময় তোমাকে যে কোন ছুতোয় কীভাবে ছুঁতে চাইতাম, তোমার মনে নেই সীমিতা?

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সীমিতা দেখছিলো, দেওয়ালে স্যাঁতসেতে ছোপ, ছাদের একটা হা-করা ফাটল, বলল, কারা যেন নিচের তলায় উনুন ধরিয়েছে, ওই শোন, চার-পাঁচটা বেরাল একসঙ্গে ডাকছে, একটা হুলো বেরাল বোধহয় গোটা দুই বাচ্চা সাবাড় করলো, সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে, ব্রত তোমার দম বন্ধ হচ্ছে না, তোমার ভয় করছে না?

ব্রতবান বললো না যে, ভয়ই যদি পাবো তবে আসবো কেন? বললো না যে, ওই ধোঁয়ায় তার দম বন্ধ হওয়া? দূর দূর। এই বাতাসেও সে বরং কলজে ভরে শ্বাস নিতে পারছে। বললো না যে, এই দেওয়ালের দাগ তার দারুণ লাগছে। সেইসব সময়কে এইসব আনছে ফিরিয়ে, যখন ব্রতবানের একটা বই দুটো শার্ট ছিলো না। পাড়ার লণ্ড্রিতে ফি শনিবার যেটাকে আর্জেন্ট কাচতে দিয়ে সোমবার সকালে খালাস করে নিয়ে দুপুরে ফিটফাট কলেজে যেতো।

তখন জানলার শিকে গাঁথা থাকতো দুটো চোখ, খুব কালো আর খুব ঘন, সেই চাওনি সুন্দর কি অসুন্দর, সেদিন যাচাই করার কথাই ওঠে না, চাওয়াটাই তখন অনেক দূর অবধি হাওয়া হয়ে পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছে। আর আজ? আজ তো যাচাই করার কথা একেবারেই ওঠে না।

এর মধ্যে, তুমি ক্যালেন্ডারের কথা বলছিলে না সীমিতা? কত পাতা বাতাসে বছর বছর জুড়ে উড়ে ছিঁড়ে গেছে। ব্রতবান এসব কিছুই বললো না। খালি ওর হাতটা সীমিতার কপালে রেখে অনেকটা সময়ের চলে যাওয়াকে অনুভব করতে চাইলো।

সেই সময়টা যদি থেমে থাকতো? সময় থাকে না, যায়। ব্রতবান হঠাৎ সময়হীনতার নিঃসীমতায় উত্তীর্ণ হয়ে শুধু ওর হাতের নাড়ির স্পন্দনটাকে বোধ করতে চাইছিলো।

আবেশে একটু বুঝি চোখ বুজে এসেছিলো সীমিতার। একটু পরেই একটা টিকটিকির ডাকে সে চোখ মেলল। অথবা টিকটিকিটা না ডাকলেও চোখ হয়তো সে মেলতই।

ক্লান্ত চোখে চেয়ে বলল, আমি আমার নামটার মতোই সত্যি, তাই না? আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি সীমার মধ্যে।

ব্রতবান চিৎকার করে বলতে চাইল, আমিও যাইনি সীমিতা, কিন্তু সেটা বিচ্ছিরি মিছে কথা হবে বলে সে ওর নিজের চুলে প্রথম, পরে মেয়েটির চুলে আঙুলগুলো ডুবিয়ে মরে যাওয়া কদম গাছটার পাতা যেভাবে কাঁপতো, সেই কাঁপন স্মরণে এনে অল্প অল্প কাঁপতে থাকল। তখন বৃষ্টি নেমেছিল।

সীমিতা বলল, তুমি চট করে আর যেতে পারছো না। বলা নেই, কওয়া নেই, বৃষ্টির এ কী ধারা বলতো? যেন কেমন-কেমন আসে! •

ব্রতবান মনে মনে বলল, ভাগ্যিস আসে। এখনও যখন-তখন বৃষ্টি আসে। ভেবে দ্যাখো, যদি বৃষ্টি-টিষ্টি না থাকতো তাহলে এই আস্তর-খসা দেওয়াল, এই ফাটল ধরা ছাদ আমাদের সত্যিই টুঁটি টিপে মারতো। ভাবতে ভাবতে এতক্ষণ যা করেনি, ব্রতবান তখন তাই করলো। পকেটে ছিল একছড়া বেল-ফুলের মালা, সেইটে বের করে, সীমিতার গলায় পরাতে সাহস হল না, ওর বালিশের পাশে রাখল। ভিজে গন্ধে তখন চারদিক মো মো।

সীমিতা বলল, গলায় না দিয়ে আমার পাশে রাখলে যে?

ব্রত উত্তর দিল না। অথবা দিল নিজেকে। স্বগত বলল, তোমার গলায় পরিয়ে দিলে সেটা যে বেজায় মিথ্যে হতো। আমার বউ আছে, বাচ্চা-কাচ্চা

আছে। ইতিমধ্যে আরো যে প্রেমিকা-টেমিকা জোটে নি, সেটা হলফ করে বলতে পারব না। তবু তোমার গলায় পরাতে না পারি বালিশের পাশে রাখলাম কেন বলতো ?

যেন ওর মনের কথাটা আন্দাজ করে সীমিতা আস্তে আস্তে বলল, আমি তোমার প্রথম বলে। না না, কোনও দাবিদাওয়া নেই আমার। আমি তো পড়ে আছি, ফুরিয়ে যাচ্ছি। তুমি কত দূরে আর উঁচুতে গেছ।

ব্রতবান আবার নিঃশব্দে বলল, আমি দূরে গিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু উঁচুতে যাই নি সীমিতা!

তার কথা কানে গেল না বলেই সীমিতা আচ্ছন্ন ঘোরের ভিতরের স্বরে বলে গেল, অনেক দূরে, অনেক উঁচুতে। যেমন এক একটা তারা। কিন্তু কোনও তারা কখনও কাছে আসে না।

এইখানেই সীমিতার একটা বুক চেরা নিঃশ্বাস পড়ে থাকতে পারে, আর তার বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব্রতবান বলতে যাচ্ছিল, আমি তারা নই তবু তো আমি আসি, এসেছি।

টিকটিকিটা ঠিক তখনই কথাটা ঠিক নয়, ঠিক নয়, বলে তাকে তার হুঁশে ফিরিয়ে দিল।

একবার বেলফুলের মালাটা নাকের কাছে নিয়ে বুক ভরে নিল সীমিতা। তারপর ঘাড় কাত করে জানলার বাইরের অনর্গল বৃষ্টিরও যেন সুবাস শুষে নিতে চাইল।

একটু হালকা হতে চেয়ে সে আবার বলল, বৃষ্টি যে থামছে না মোটেই। তুমি যাবে কী করে ? তোমার গাড়ি আছে জানি। কিন্তু সেটাকে এই গলিতে তো নিশ্চয়ই আনা যায় নি। যেতে যেতে তুমি ভিজবে।

এখানে তো এই ঘরে ভিজছি, বলতে চাইল ব্রতবান। বলল না। কারণ ওভাবে বললে ভারি কাব্যিক শোনাতো। যখন সে পকেটে কিছু নেই অথচ যেতে হবে বলে ট্রামের পর ট্রামের ফুট বোর্ডে দাঁড়িয়ে থাকতো, আর কনডাকটর কাছাকাছি এলে আজকের এই বৃষ্টির মধ্যেই ঝপঝপ করে নেমে নেমে ধরতো অরেকটা ট্রাম, এইভাবে পৌঁছে যেতো কোথাও, সেই সব স্মৃতি জানালার বাইরে ঝাপসা আকাশের মতো তার মনে টুপ টুপ পড়তে থাকল, আর ওই জানালার শিকের মতোই বিঁধে যেতে থাকল তার মর্মের শিকড়ে।

আমার এত অসুখ, আমি কোথাও যেতে পারি না—সীমিতা খুব স্তিমিত গলায় বলল।

তৎক্ষণাৎ উদ্গত হতে চাইছিল ব্রতবান। তার বুক ঠেলে গলায় এই কথাটাই উঠে আসছিল, আমারও অসুখ না থাক সুখও নেই সীমিতা। আমিও যেতে পারি নি।

সেটা মিথ্যে হত বলেই সে চুপ করে রইল। টিকটিকি আর তার ঘড়ির টিকটিক মিলে যাচ্ছিল।

একেবারে সোজা হয়ে বসল সীমিতা। বলল, আমি আর সারবো না।

সারবে না, তবু তুমি আমাকে সারাবে, ব্রতবান বলল, সেই মনে মনেই।

ততক্ষণে সীমিতা ওর মাথাটা কাছে টেনে বালিশের ওপর নুইয়ে দিয়েছে। যে-বালিশে এতক্ষণ তার নিজের মাথা ছিল, এখন সেইখানে ব্রতবানের ব্যাক·ব্রাশ করা ডাই করা চুলওয়ালা মাথা।

সীমিতা বলল, আমি তো মরছি. মরব। তুমি কিন্তু এখান থেকে এই চাপা ছোট মাপের ছোট গলি থেকে (ব্রত, তুমি এখনও কি কবিতা লেখ?) ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বেঁচেছ। তবু ব্রত, আমার ব্রত, তুমি কত মহৎ! এখনও ভোলনি, এখনও থেকে থেকে ফিরে আসো। যখনই আসো তখুনিই ওষুধ আনো, ফলটল দিয়ে যাও. তোমার মতো মানুষ হয় না। যে মরছে তাকে আর কে মনে রাখে?

পারলে ব্রতবান তার বুকের পাঁজরার ভেতরের কয়েদী সব হাওয়া বের করে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠত। বলত, ভুল করছো সীমিতা। ভুলেছি বলেই তো আমি স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিতে আসি। এই ফলটল আর ওষুধ-টষুধ? সব ঘুষ। আমার যে বড় ভয়. যেখান থেকে সরে পড়তে পেরেছি সেই গলিটায় ফের বরাবরের মতো পা পিছলে পাছে পড়তে হয়, সেই ভয়। তাই তো মস্ত গাড়িটাকে গলির বাইরে সদরে রেখে পা টিপে টিপে কখনও কখনও পুরনো গন্ধে আর রঙে ফিরতে চাই। সব সাজানো. সব বানানো। পাছে যেখান থেকে একদিন ছিটকে পড়তে পেরেছি সেখানে পা পিছলে আবার চলে আসি! আমি মহৎ নই. সীমিতা. আমি মহৎ নই। পুরনো হারানো ডালা আমি খুলতে চাই না. আমি শুধু খুলে খুলে উঁকি দিই। আসলে চাপা দিতে চাই।

ব্রতবান বলতে চাইল বলতে পারল না। তবু আকাশের অবুঝ বৃষ্টির মতো সে বলেই গেল. সীমিতার বালিশে মাথা রেখে. একেবারেই একান্ত হয়ে নিভৃতে নিঃশব্দে বলেই গেল. সীমিতা. বললাম তো. সবটাই ঘুষ--ব্লাক মানি। মানে. সময়কে ব্লাকমেল করা যাকে বলে। ফের এই গর্তে ঢুকতে না হয়. তাই একটু একটু. ফোঁটা ফোঁটা ফেরা।

সীমিতা শুনতে পেল না। তবু যেন শুনল। ওর চুলে হাত বুলিয়ে বলতে থাকল, ব্রত. আমার ব্রত! আগে ব্রতবান হাত রেখেছিল তার কপালে। এবার সে তার ব্রতর কপালে হাত রাখল। বাইরে তখন বৃষ্টি ধরে এসেছে। ওর ধ্বসা-বসা গলা বেয়ে কয়েকটি মায়াবী ধারা নামছিল, নেমেই চলেছিল সেও ফোঁটা ফোঁটা।

শোক সুখ মৃত্যু

আয়নায় ছায়া পড়তেই শর্বরী ফিরে তাকিয়েছিল। কিন্তু চমকায়নি। আঁচল যদিও একটু আলগা, তবু তখনই সেটাকে যথাস্থানে বহাল করতে তার আঙুলগুলো বিশেষ ত্বরা বা তৎপরতা দেখায়নি। আসলে দরকারই ছিল না ও-সবের, কারণ আয়নার ভিতর দিয়েই শর্বরী একঝলক দেখে নিয়েছে, ছায়াটা তার খুব চেনা। মানে ছায়াটা যার সেই মুখটা, মুখটা যার, সেই মানুষটা। কোনও মানুষকে কখনও চেনা যায় কি-না সেই মুহূর্তে শর্বরী অবশ্য এসব বিচার করে দেখেনি, বস্তুত বিচারের কোনও সক্রিয় পদ্ধতি অধিকাংশ সময়েই লোকের থাকে না, প্রসাধনরত মেয়েদের তো আরও না, আমরা সচরাচর এক-প্রকারের স্বয়ংক্রিয়তায় চালিত হয়ে থাকি। শর্বরীও সেই ক্ষণে সেইমতো চালিত হচ্ছিল বলেই, তার মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখা গেল না, শুধু হালকা একটা ভাবনার হাওয়া ওর ভিতরে ভিতরে বয়ে গেল, কবিতায় বলেছে না, ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ?—কতকটা সেইমতো।

না ব্যস্ত, না চকিত শর্বরী ধীরে সুস্থে লুটোনো আঁচলটা তুলে কপালটা একবার মুছে নিল। বেশ চকচকে লাগছে। কোন্‌টা বেশি চকচকে ড্রেসিং আয়নার কাচ অথবা তার মিহি মসৃণ চামড়ায় ছাওয়া কপাল? ধুৎ, ওসব ভেবে-টেবে লাভ নেই, বরং যে-লোকটা এতদিন পরে বোধ হয় খানিকটা পুরোনো অভ্যাসের জোরে বিনে এত্তেলায় ঢুকে পড়েছে তার দিকে একবার ফিরে তাকাই। দুটো ছায়া এখন আয়নায় স্থির, যেন ফ্রেমে বাঁধানো দুটি ফোটোগ্রাফ, চারটি চোখ অপলক।

ইশারায় একটা টুল দেখিয়ে দিয়ে শর্বরী নিজে বসল বিছানায়, পা ঝুলিয়ে, পায়ের আঙুলগুলো ও যেন খেলার ছলে নাড়ছিল, পায়ের পাতার কাছে শাড়ির পাড়টা থিরিথিরি কাঁপছিল, কেননা উপরে একটা সিলিং ফ্যান অবিরাম ঘুরছে, পাখার হাওয়া এত নিচু হয়ে কে জানে মেয়েদের পায়ের পাতার ঠিকানা পায় কোত্থেকে, তবে পাচ্ছে যখন পাক, একটু সুখ একটু আরাম আবেশ এসব দিতে থাক, ততক্ষণ শর্বরী আগন্তুকের সঙ্গে তার প্রাথমিক আপ্যায়নী আলাপটা সেরে নিতে পারবে।

—বোসো। কবে এলে?

—এই তো ঠিক ঠিক আট ঘণ্টা আগে। বিজন ওর কবজিতে বাঁধা সময়টা দেখে নিয়ে উত্তর দিল। যেন শর্বরীর প্রশ্নটা ছিল পরীক্ষাপত্র, দু-এক মিনিট এদিক-ওদিক হলেও নম্বর কাটা যাবে।

—ওই আফটার কেয়ার কলোনি তোমাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে?

এতক্ষণে শর্বরী বিজনের সমস্ত শরীরটায় চোখ বুলিয়ে নিতে সময় পেয়েছে। খানিকক্ষণ পরখ করে ডাক্তারেরা যেভাবে ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয় কতকটা সেই ঢঙে, কিংবা কোনও হাকিমের ভঙ্গি নকল করে বলল, তুমি দিব্যি সেরে গেছো কিন্তু। মনে হয় এখানে-ওখানে বেশ খানিকটা মাংস লেগেছে। কী দিত ওখানে? মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, ফলটল সব অঢেল?

সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বিজন একটু হাসল।—মাছ-মাংস? তা ছিল বইকি। তবে শর্বরী, শুধু একটি বিষয়েই ছিলাম নিরামিষাশী।

শুনে শর্বরী মানানসই একটুখানি রাগের লক্ষণ ফুটিয়ে তুলল।—অসভ্য! মুখটা তোমার তেমনি আলগাই আছে। বরাবর একরকম। অল্প ঝুঁকে পড়ে শর্বরী, তখনও ওর পা দুটি দুলছে, একটি তর্জনী রাখল বিজনের চোখের কোলটিতে।—ইশ, এখনও এখানে কিন্তু কালির ছিটে লেগেই আছে। এটাকে সারাতে পারোনি? দাড়িটাড়িও তো কামাওনি দেখছি। কেন—গুরুদশা?

—আমরা যদি আর বিশ-ত্রিশ বছর আগে জন্মাতাম শর্বরী, তবে এই রকম সিচুয়েশনে আমার মতো কোনও যুবা বলত যে হ্যাঁ, বিরহের গুরুদশা। সেকালে এসব সংলাপ জুৎসই শোনাত।

—একালে বুঝি সেকেলে নাটকের অভিনয় হয় না?

শুনে বিজন মঞ্চস্থ কোনও হতাশ প্রেমিকের ন্যায় বাতাসে হাত দুটি আন্দোলিত করতে করতে আহত ব্যাকুল স্বরে বলল—শুধু নাটক শর্বরী, শুধু অভিনয়?

—হ্যাঁ তাই। রিয়েলিটি হলে বিজন, এ ঘরে ঢোকার আগে তোমাকে দরজায় বার দুয়েক ট্যাপ করতেই হত। সেইটেই ভদ্রতা, সেইটেই দস্তুর। মেয়েদের কামরায় প্রবেশের ব্যাপারে একটা সামাজিক পেনাল কোড্ আছে জানো না? নইলে—

—নইলে কী?

—নইলে শাস্তি, এই শাস্তি। বলে শর্বরী ওর সাদা একটা হাত তুলে, শিলভলেস জামা তাই হাত তোলাতে কোনও অসুবিধেই নেই, বিজনের গালে একটা চাপড় মারল।

বিজন বলল—আদর?

—উঁহুঁ! তোমার মতো সংলাপে ওস্তাদ হলে বলতাম, 'বাজিয়ে দেখলাম, দর কত'।

এবার ওরা যৌথ হাসল।

উঠে গিয়ে শর্বরী স্পিড্ বাড়িয়ে দিয়েছে পাখাটার। বলল—খবর-টবর দাওনি, একেবারে আচমকা চলে এলে। আমি ভাবতেই পারিনি।

—মনটা এমনিতেই একটু ছুটি-ছুটি করছিল কিছুদিন, তাই শর্বরী, আচমকাই চলে এলাম। বিশেষ করে সন্দীপ একেবারে ছুটি নিয়ে পাড়ি দিয়েছে খবরের কাগজে যে-ই পড়লাম, আর কি ওখানে টিকতে পারি? তল্পিতল্পা গুটিয়ে একেবারে সটান। আজকে তো শুনছি সন্দীপের জন্যে একটা স্মরণ-

সভা। শর্বরী, যাবে?

—কটায়? শর্বরী জিজ্ঞাসা করল একটু নিরুৎসুক ভঙ্গিতে।

—কথা তো আছে সাড়ে ছ'টায়, তার মানে এখনও পাক্কা তিন ঘণ্টা। মিটিঙ তো গোলদিঘির কাছে, একটা ছোট্ট হল ঘরে—সেই সেনট্রাল ক্যালকাটা। যাবে?

যেতে পারি, শর্বরী বলল, ওর ফাঁপানো চুলগুলোকে একেবারে মুক্ত করে দিয়ে, একটু রুক্ষ, একটু উদাস, বাইরে শেষ বৈশাখের ঝাপটায় ধুলো উড়ছে, তাই রোদ নিস্তেজ, নিস্তেজ গলাতেই শর্বরী বলল—যেতে পারি। যাওয়াটা তো হবে।

দোতলা বাসের একেবারে সামনের দুটো পাশাপাশি সিট পাওয়া গেল ভাগ্যিস। ইতিপূর্বে শর্বরী শাড়িটা বদলে একটা সাদা খোলের তাঁত পরে এসেছে। তাঁতের শাড়ি কী জানি কেন একটা গাম্ভীর্য দেয়, যদিও থেকে থেকে খসখস করতে ছাড়ে না, বিশেষ করে শেষবেলায় যখন খুব সভ্য ধরনের একটা ঝড় পোষ-মানা অথচ হঠাৎ ছাড়া-পাওয়া পাখির মতো খাঁচার বাইরে বেরিয়ে উড়তে শুরু করেছে। বাতাসের স্পর্শে সদাই একটা শিহরন, জগতের যাবতীয় বস্তুর বয়স বাড়ে, অন্তত মানুষের তো একটা বয়সে আর পুলক-টুলক কিছু থাকে না, বয়স বাড়ে না খালি বাতাসের আর একান্তই তার শাসনাধীন পাতাদের। পাতারা ঠিক সাড়া দিয়ে যায়, যেমনটি ঠিক দিয়ে যেত কালিদাসের কাল থেকে রবি ঠাকুরের আমলে।

শর্বরীও সাড়া দিচ্ছিল কি? ওর মাড় দেওয়া খড়খড়ে শাড়িটা নড়াচড়ায় মাত্রা রেখে খসখস করছিল? বিজনেব অতটা খেয়াল ছিল না। মাঝে মাঝে শীর্ণ আঙুল তুলে সে তার নিজের এলোমেলো তামাটে চুল পিছন দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে একটু উদ্যোগী পুরুষ হয়ে শর্বরীর গালে এসে পড়া কয়েকটি উড়ো চুল ওর কানের উপরে গুছিয়ে রাখছিল, লোকে যেভাবে মূল্যবান জিনিসপত্র সযত্নে তাকে তুলে রাখে।

বিজন কিছুটা স্বগত কিছুটা বা শর্বরীকে বলে চলেছিল, যদিও এই অবুঝ বাতাসে অনেক শব্দই উতলা ভেসে যায়, হারায়, তবু বিজন তদ্গত বলছিল—তুমি একটু আগে খবর না দিয়ে আসার কথা বলছিলে। সবাই কি খবর দেয়? যেমন সন্দীপের এই হঠাৎ মৃত্যুটা? একেবারে বিনা নোটিশে ওর জীবনটাকে নিলাম ডেকে নিল। অথচ সন্দীপ তো আমার চেয়েও অন্তত মাস ছয়েকের ছোট ছিল! কলেজে আমরা হিসেব করতাম, মনে আছে? সেই শিরীষ গাছটার নিচে? যেখানে বসে কত ফুচকা খেয়েছি এমন কি মেয়েদের—শর্বরী তোমাকেও—লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেটে এক-আধটা টান দিতে শিখিয়েছি। মনে আছে?

আছে, আছে, শর্বরী তার শরীরটাকে ওই চলতি বাসটায় ঝাঁকুনি খাবার জন্যে ফেলে রেখে শুধু তার নির্যাস অর্থাৎ শুধুই তার মনটাকে নিয়ে ততক্ষণ কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। লুকিয়ে-চুরিয়ে সিগারেট? না মৌতাতটা যখন জমল তখন আর ব্যাপারটাকে সে বিশেষ লুকোয়নি, টান টান অসংকোচে ধোঁয়া

ছড়িয়েছে পুরুষ বন্ধুদের মুখের উপরে, পরে কবে যেন বিশ্রী একটা কাশি হল, কবে যেন স্যাঁকা তামাক পোড়া স্বাদটা জিভে তেতো ঠেকল, তারপর বিজনের গলা দিয়ে একদিন যেই এক ঝলক রক্ত উঠতে দেখে, সেইদিনই শর্বরী স্বেচ্ছায় সিগারেট খাওয়া ছাড়ে। ভয়ে? অথবা এও কি কোনও ধরনের একটা বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য, যার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে কিসের যেন কিসের যেন—আমাদের সেকালের বৈধব্যের?

বাস যত সামনে ছুটছে শর্বরী ততই যাচ্ছে পিছিয়ে, অনেক দূরে, সেই সব টো-টো-টো-টো, সারাদিন হয়রান দিনের পর দিন। কোথায় কাকদ্বীপ, কল্যাণীই বা কোথায়, কোথায় বজবজ আর কোথায় বারাসত, চষে ফিরতে কোনও এলাকা বাদ থাকেনি। ভিকটোরিয়া, জু, লেক, স্ট্র্যানড ইডেন বা হরটিকালচারাল গারডেন ইত্যাদি ক্ল্যাসিকাল পীঠস্থানগুলি তো ছিলই। কী রোদে কী বর্ষায় এর চোখ ওর আশ্রয়, সান্নিধ্য আর অঙ্গসঙ্গে বিপুল মমতা। এই পর্যন্ত ভেবেই হঠাৎ বুঝি চমকে গিয়েছিল শর্বরী, কিংবা ঠিক তখনই বাসটা আকস্মিক একটা ব্রেক কষে থাকবে, তাই তার স্মৃতিচারণার মাটির খেলনাগুলো গড়িয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অতীত? কে বলেছে অতীত? অতীত তো বর্তমান হয়ে ফিরে এসেছে, রোগমুক্ত বিজনের মধ্যে, যার উদাস সংস্পর্শে উত্তাপ, এমন কি ট্যাকসির নিরালাও কি এর চেয়ে স্বর্ণময় কোনও বিকেল তৈরি করতে পারত?

সেনট্রাল ক্যালকাটার সেই হলঘরটা আর কত দূর আর কত দেরি, আকুল শর্বরী প্রার্থনা করতে থাকল, সেই শোকসভায়, হে ঈশ্বর, এই বাসটা এক্ষুনি আমাদের যেন পৌঁছে না দেয়, যেন এই যাত্রাপথ দীর্ঘ—আরও দীর্ঘ হয়। বিস্মিত শর্বরী হঠাৎ আবিষ্কার করেছে—করে নিজের কাছে লজ্জাও পেয়েছে নিজে—তাহলে সে কি সত্যি সত্যিই সন্দীপ নামে অকালে বিগত বন্ধুটির জন্যে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সভায় যেতে রাজি হয়নি, সে কি—সে কি চেয়েছিল শুধু চমৎকার একটা সন্ধ্যায় মনোমত প্রত্যাগত এক সঙ্গীর সঙ্গে কিছুটা সময় রোমাঞ্চিত আবিষ্ট কাটিয়ে দিতে? সভাটা শুধু একটা সুযোগ, সভাটা একটা ছল? লক্ষ্য আর উপলক্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করে শর্বরী বিদ্ধ হল, অস্থির হল, যত হল ততই বিজনের আরও গা ঘেঁষে ঘেঁষে ঘন হয়ে সরে বসতে থাকল। ধনেখালিটা সেই সরে আসাটাকে এমন ভুতুড়ে খসখসে গলায় খালি জানিয়ে দেয় কেন, লণ্ড্রিতে এত মাড়ই বা কেন দেয়, ইস্তিরিটাও কী কড়া, সমস্ত সত্তায় ফুটছে, ছি!

গানের যেমন স্বরলিপি হয়, মনের কথারও তেমনি স্বরলিপি রচনার কোনও পদ্ধতি যদি থাকত তবে সেদিন তার পরেকার অনেকখানি সময় জুড়ে বিজনের ভাবনা-চিন্তা কতকটা এইরকমই ভাষা পেত। এই অংশটার নাম দেওয়া যেত "স্বগত—বিজন"।

...অনেকখানি দেরি করেই আমরা সভায় পেঁছোলাম, মানে যে-সময়টা বলে দেওয়া ছিল, তার চেয়ে বেশ কিছুটা দেরি। দেরি করলাম কেন? ছানাপট্টির মোড়ে বাসটা অনেকক্ষণ ধুঁকতে থাকল যে, বোধ হয় ইচ্ছে করেই, আসলে ওর মতলব ছিল আরও সওয়ারি তোলা। কনডাকটারের মেট্ ছোকরাটা (ওরা কি মেট্ বলে, না পারটনার?) সুর করে কঁকিয়ে কঁকিয়ে হাঁকছিল হাতিবাগান-শ্যামবাজার, মানে সেই সব প্রান্ত যেখানে গিয়ে এই জিরজিরে লঝ্‌ঝড়ে বাসটা জিরোবে, একদম দম নেবে—সেই সব এলাকা। বাজে মেয়েরা লোক ডাকে, লোক ডাকে বাসের ছেলেরাও। আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ঢংটা একরকম। যাক্‌গে, ডাকছে ডাকুক, ডেকে ডেকে গলা ফালা ফালা করে ফেলুক, আমার তো দিব্যি লাগছে। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে বলে ভরে উঠছে মন। মন, না শরীর? একটু ছোঁয়া, একটু চমক, একটু বিদ্যুৎ। রবীন্দ্রনাথ হয়তো বাঁশি বলতেন, কিংবা সুর। ছোঁয়াছুঁয়িতে কি বাঁশি বাজে, কারও সঙ্গ, কারও অঙ্গ কখনও হয়ে ওঠে গান? যত্তো সব! বাতিক। এতক্ষণ ঝড় ছিল, এক্ষুনি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, হতেই থাকল বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঝিরঝির ঝিরঝির, এইরকম সময়ে এই কুৎসিত শহরটাকে স্নানান্তে সুন্দর একটি রমণীর মতো লাগে।

দেরি করে সভায় পেঁছোলাম, তবু দেখি শুরু হতে তখনও বেশ খানিকটা দেরি। ছোট হল, মাঝে সারিগুলো ভরে গেছে, খালি শুধু সামনের সারিটা, ওখানে লোকে স্বেচ্ছায় বসে না, সম্ভবত বিনয়বশত, আমরাও যে একেবারে পিছনের দিকের খুপচি একটা কোণ বেছে নিয়েছি সেও কি বিনয়ে, নাকি—নাকি—কী? একটু নির্জন হব বলে? জনতায় নির্জনতা, কথাটা শুনতে বেশ। পিছনে বসার আর একটা সুবিধে, সব দেখতে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। যেন মেঘের আড়াল থেকে যে লড়াই করত সেই বীরবরের মতো, যার বধ নিয়ে বাংলায় একটা কাব্যই লেখা হয়েছিল। এখান থেকে দেখছি মঞ্চসজ্জায় কোনও ত্রুটি নেই, এমন কি সন্দীপের একটা ফোটো বিরাট করে বাঁধানো। সামনে ফুল, ফুল আর ধূপ। যে-ধূপ নিজেকে গন্ধের ভিতর বিলিয়ে দেয়, আর যে-ফুল ঠোঁটের পাপড়ি কাঁপিয়ে অকাতরে বিলিয়ে যায় গন্ধ। এও একটা মজা—সকালের কিরণ প্রত্যেকটি পুষ্পকে রূপবতী করে, তাদের বাইরেটাকে ফুটিয়ে তোলে, পুষ্পেরা কিন্তু নিজেদের হৃদয়ের সব সুবাস উজাড় করে দেয় বাতাসকে, বিশেষত বাতাস যদি, বাতাস যখন ভিজে থাকে। এও কি দ্বিচারিতা? আমি—এখানে সমবেত আমরা সবাই কি দ্বিচারী? একটি কোণে বসে চোখ দিয়ে সব টুকে নিচ্ছি। সামনের সারিতে যে বসিনি তার কারণ অনেক। ওরা কেউ কেউ আমাকে চিনতে পেরে যদিও ঝুলোঝুলি করে-ছিল যথেষ্ট। একে তো সামনে বড় বেশি আলো, ফুটলাইট, ফ্লাডলাইট, ফোকাস, ফোকাস, চোখে ধাঁধা লাগে, সব পষ্টাপষ্টি বেপরদা দেখা যায় না। দুই, পাদ-প্রদীপের মুখোমুখি একেবারে আলোকিত হয়ে বসলে শর্বরীর সকাতর হাতের পাতাটা এইভাবে চেপে বসতে পারতাম কি? না। এই কোণে বসে এক ঢিলে অনেক পাখি মারছি, শোক বলো তো শোক, সুখ বলো তো সুখ।

সেই যে কোন্ একটা লেখক কবে লিখেছিল না, একটা বয়সের পরে কেউ মরলে আমরা যখন কাঁদি, তখন মৃতের তরে ততটা কাঁদি না, যতটা কাঁদি আসলে নিজ নিজ নিয়তি স্মরণ করে? অর্থাৎ লোকে বস্তুত কাঁদে আপনারই মৃত্যু-শোকে। অনেকটা নিজের পিণ্ড নিজেই দিয়ে যাওয়ার মতো, এর জন্যে কোনও গয়ায় যেতে হয় না। সেই গল্পটা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে আমার অল্প বয়সের সেই বন্ধুটির কথাও যার মা মারা গেলে সহানুভূতি জানাতে আমরা অনেকে মিলে তার বাড়িতে যাই। বেদনার্ত সেও কিয়ৎকাল আমার বক্ষে মস্তক ন্যস্ত করে অশ্রু বিসর্জন করে। অথচ সেই ফোঁপানিরই ফাঁকে ফাঁকে সে তৎকালীন গভরনরের মিলিটারি সেক্রেটারি যে তারবার্তাটি পাঠান, সেটির সারমর্ম আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। তৎক্ষণাৎ সন্দেহ হয় বিয়োগ-ব্যথার সঙ্গে কোথাও একটুখানি গর্বও মিশে গেছে বুঝি—আহা যেন গঙ্গা আর যমুনা, পবিত্র সঙ্গম। আর একটু পর ওই সঙ্গমও সটান প্রবাহিত হয়ে গেল মোহানায়, যখন বন্ধুটির অ্যাটরনি কাকা এলেন। দুজনে মিলে ঝুঁকে পড়ে বাড়িটার দলিল পরচা কবুলতি নিয়ে সে কী অধীর—অঝোর পরখ করা। তখন বন্ধুটির চোখে বাষ্পের বিন্দুমাত্র আভাসও ছিল না। দেখেছি তো আরও কত কিছুই। আমার সদ্য-বিধবা এক মামিমা ডুকরে ডুকরে যখন সমাগত সহৃদয় পড়শীদের বলছিলেন, ইস, সিলেকশন গ্রেডে প্রোমোশন পেতে না পেতেই মামা অকালে চলে গেলেন, তখন আমার তখনকার কিশোর-মনে যে অনুভূতি জাগে তার নাম কী? সে কি শ্রদ্ধা, সে কি শ্রাদ্ধ, কী আশ্চর্য দুটো শব্দ কত সহসা-সমার্থক, কত কাছাকাছি, যেন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় বারোটা আর এগারোটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট।

স্টেজটা দারুণ সাজিয়েছে কিন্তু, উপরে ওই যে কালো ঝালর, ওটা কার আইডিয়া? বোধ হয় শৈলেশের, সন্দীপের ডজন দুই বন্ধুর মধ্যে একমাত্র শৈলেশই আরটিসট। তবে বৃথা আয়োজন, এই ডাকসাইটে মঞ্চে আজ হাজার ডাকাডাকি করলেও আসল নায়কটি আবির্ভূত হবে না। সবটাই কেমন যেন হলদেটে প্রেতচ্ছায়া। দু-চারটে পার্শ্বচরিত্র বড় জোর হাত-পা নেড়ে কিছু বক্তৃতা দিতে পারে। অথবা গান। বিলেতে ভাড়াটে মোরনার, মানে শোককারক মেলে শুনেছি। আমাদের দেশেও তার কোনও প্রতিকল্প আছে কি? ভাড়াটে অশ্রুপাতকারী কিংবা গায়ক-গায়িকা? চোখের জলও তবে কি ভাড়া পাওয়া যায়, ফরমাস করলেই মেলে কিছু অর্থমূল্যে কেনা সুর? অথবা কে বলতে পারে ফ্রি-তে পড়াশোনার মতো ফ্রি-তে কান্নাকাটি জোগাড় করাও সম্ভব। যারা তারস্বরে রামনামের সত্যতা ঘোষণা করে, বিকট করে তোলে উদ্‌গ্রীব হরিধ্বনি, বুঝি বা তারাও ঝুটা, তারাও ভাড়াটে। হায়ার-করা প্লেয়াররা যেমন ম্যাচে জিতিয়ে দেয়, ভাড়া-করা শববাহীরাও তেমনই অক্লেশে পরমানন্দে পৌঁছে দেয় পরপারে—যে মরেছে তাকে দ্বিতীয়বার মারে।

কিন্তু সন্দীপের এই ছবিটা এতকাল ছিল কোথায়? কী করুণাঘন, কী ক্ষমা-সুন্দর, চুলোয় যাক সেই কবিটা যে আজও আমার চিন্তার রাশকে চলের

ঝুঁটির মতো কঠিন মুঠিতে ধরে ঝাঁকায়, চুলোয় যাক। আমি এই পঞ্চাশ গজ দূর থেকে যে-সন্দীপকে আর কখনও দেখতে পাব না, তার সহাস্য বিস্ফারিত মুখশ্রী নেহারি। এই ছবিটা ছিল কোথায়? ছবিরা তোলা হয়, থাকে, আলবামের পাতায়, তোরঙ্গের তলায়, ছবি-টবি ওইরকমই থাকে। তারপর তাদের খোঁজ পড়ে একদিন, যখন আসল মুখমণ্ডলটি নেই, তখন এই সব ছবিকেই লারজ, লারজ-এনলারজ করে প্রকাণ্ড ফ্রেমে বন্দী করে দেওয়া হয়। তবু তারা মরিয়া কয়েদির মতো ওই ফ্রেম থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে, কাঠামোটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিয়ে।

এখন সন্দীপ যেমন আসছে, আলোক-চিত্রায়িত হয়ে টলটল ভাসছে। এই প্রতিকৃতিটা বস্তুত অপ্রকৃত, অনেকটাই ফাঁপানো, ওতে সত্তাকে এমন একটা আকৃতি দেয় যা শ্যামপু করা চুলের মতো। ওড়ে ওড়ে ওড়ে, ঘনগহন চোখের মোহে, মায়ায় ছেয়ে ফেলে। আমাকে ফেলছে। আমি যে কাঁপছি ভিতর থেকে অস্থির অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত ভূমণ্ডলের কম্পনের মতো, শর্বরী কি তা টের পাচ্ছে? যদিও এক্ষণে আঙুলে আঙুলে যুগলবন্দী আমরা উভয়ে।

শর্বরী, চেয়ে দ্যাখো, হা-হা, মঞ্চে এইমাত্র যিনি উঠে দাঁড়ালেন, তিনি কিন্তু সন্দীপের বিষয়ে না বিসর্গ না বিন্দু কিচ্ছু জানতেন না এখানে আসার অব্যবহিত পূর্বেও। তবু উনি দাঁড়িয়েছেন ওই সুপুরুষ নয়নাভিরাম অরিন্দম বন্দ্যো, কারণ শোক নয়, একটুখানি লোভ, জিভের ডগায় আপ্লুত কয়েক ফোঁটা লোলুপতা। প্রথমত এই লাইট, এই ফোকাস ওঁকে খুব শালপ্রাংশু দেখাচ্ছে, উনি আশা করছেন এক্ষুনি বোধ হয় কোনও চতুর সুযোগসন্ধানী ঝোপ বুঝে কোপ-মারা ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ-বাল্‌ব জ্বলে উঠবে, অর্থাৎ উনিও চিরায়ত চিত্রার্পিত হয়ে যাবেন, সোজা কথায়, এই আসরে হবেন দ্বিতীয় ছবি, আর-একটি সন্দীপ। মনের তলায় তলায় ওঁর আরও একটা স্রোত বইছে কি-না জানি না—হয়তো অরিন্দমবাবুর ধারণা এই সভার বিবরণী কোনও না কোনও সংবাদপত্রে কাল-পরশু সমারোহে শোভা পাবে।

এই সব দুর্বলতা শর্বরী, এই সব দুর্বলতা। যেমন নিরীক্ষণ করো, এই আসরে আমরা দুটিতে মিলে এই যে জুটি, খালি আমরাই কপট বা পাপী নই, একই অপরাধে অপরাধী আরও অনেকে। শ্রীলতাকে দেখতে পাচ্ছো? ও কেমন আধো-নিমীল পোজ নিয়ে বসে আছে? সেই থেকে কেবলই হাই তুলছে আর ঢুলছে। আমি বাজি রাখতে পারি শর্বরী, নিশ্চয়ই আজ বিকেলে, আজ তো ছুটির দিন, ও, মানে ওই শ্রীলতা নিশ্চয় কারও না কারও সঙ্গে বিছানা নিয়েছে। অবৈধ কেউ না হোক, অন্তত ওর সঙ্গত স্বামীর সঙ্গে তো আলবৎ। নিরুপমের সঙ্গে। পরে, গা ধুয়ে শ্রীলতা পবিত্র হয়েছে, যত্ন করে পরেছে টিপ, আজকাল তো সিঁদুরের চলন কম, তাই টিপটা বোধ হয় কুমকুমের কিংবা সিঙ্গার-মার্কা কোনও পণ্যের, ও উষার সোনার বিন্দু অবশ্যই হতে পারত, কিন্তু শ্রীলতা নির্বাচন করেছে খয়েরী। খয়েরের রঙে বোধ হয় কোনও অন্তর্লিপ্ত কামনা আছে। তোমরাই জানো ভালো। কিন্তু শ্রীলতা আজ

অনতিপূর্বে যে জীবনকে সাধ করে এসেছে, সাধ না ভোগ না উপভোগ, কোন্ শব্দটা সঠিক কে জানে, তা নিয়ে আমার হাজার টাকা বেট ধরা রইল। আরও তরল করে বলা যাক, ও একটি মৃত বন্ধুত্বকে শেষকৃত্য নিবেদন করতে আসার আগে অন্তত একটি পুরুষকে তাৎক্ষণিক মরণে মেরেছে। তারপর, শোকও অবশ্যকর্তব্য এই সত্যটি ধ্রুব জানা আছে বলেই শ্রীলতা সর্বাঙ্গ প্রক্ষালন করার অন্তে পতি-সমভিব্যাহারে এখানে সমুপস্থিত। ওকে দারুণ দেবী দেবী দেখাচ্ছে, না? বিশেষত খয়েরী টিপটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ওই প্রসন্ন বয়ানের তুলনা হয় না।

শুধু কি শ্রীলতা? না শ্রীলতা তো শুধু শারীরিক কোন রিফ্লেকস অর্থাৎ ব্যবহারবাদের অধীন হয়ে স্রেফ হাই তুলছে। হাই তুলে ধরিয়ে দিচ্ছে বিকেলের পাপটাকে বা যদি বলো পুণ্যে তবে তাই, তবে তাই সই, সখি, তবে তাই। তবে একা শ্রীলতাই তো নয়! এই আলো-আঁধারিতে পশ্য পশ্য, অন্যান্য রমণীদের। তুমি খুঁটিয়ে দেখছ কি-না বলা শক্ত, কারণ আমি তো তোমার চোখ দেখছি না, শুনছি শুধু তোমার হাতের পাতাটাকে, একটু সুড়সুড় ইশারায় উঠে গেলে আমি হয়তো তোমার কব্জির নীল সাপগুলোর, মানে রগগুলোর ফোঁস ফোঁসও শুনতে পাব। যাকগে, তুমি না দ্যাখো আমি তো দেখছি, যখনই ওপ্ন প্লট ফর সেল ধরনের খালি খাঁজ আর পেটের থলথলে ভাঁজ চোখে দেখি, চেখে দেখি, তখনই কী জানি কেন, আজও আমার চরিত্রবান জিহ্বাও লালায় ভিজে গিয়ে লকলক করে।

এই সব মহিলারা অতি অবশ্যই হয় শ্রীলতার মতো একটা শারীরিক চাহিদা চুকিয়ে এসেছেন নয় তো অতি অতি অবশ্য অবিলম্বে সঙ্গত ভঙ্গিতেই উপগত হবেন। নতুবা গাত্রাবরণ এত অল্প কেন, স্থানে স্থানে এত আমন্ত্রণের খোলাখুলি ইশারা কেন, গাত্রবরণ কোথাও যে ফিকে কোথাও যে ঘন, ওদের বাড়িতে কি আয়না নেই, সেই আয়না কদাচ কি ওদের সত্য কথা বলে দেয় না?

এত হাই শর্বরী, এত হাইয়ের আর কোনও মানে নেই। বৃষ্টির আগে যেমন খানিকটা তপ্ত হাওয়া বয়, এই হাইও তেমনই।

আমি যে এমন কত দেখেছি এমনতরো আরও কত জেনেছি। জানো, একটা দুপুরে একবার সটান হেঁটে নিমতলায় হাজির হই। সাজানো চিতা, কাঠ ফটফট ফটাস সব পেরিয়ে বসতে যাই চিড় ধরা ঘাটলাটায়। যেখানে ছলছল পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। কী দেখি সেখানে বলো তো? একটি রোগা মেয়ে ততোধিক হাড়গিলে এক যুবকের বুকে মুখ গুঁজে আছে, আর যুবকটি তার ঠোঁট খুঁজছে। থিয়েটার হলে ক্ল্যাপ্ দিতাম, বলে উঠতাম, সাবাশ, চমৎকার, এনকোর আরও একবার। ওরা দুটি ভীরু খরগোশ। অথবা উট-পাখি। খুঁজে খুঁজে প্রেম করার মতো ঠিক জায়গাটি পেয়ে গেছে। নিমতলা মানে শ্মশানের তুল্য আর কিছু নেই। প্রথমত, এখানে হয় কিউ দিয়ে শোয়া মড়া, মড়ারা কিছু দেখে না, দেখলে নির্বাক ক্ষমা করে দেয়, আর শববাহী বা শ্মশানবন্ধুরা! তারা তো অতিশয় বিচলিত শোকাতুর, চোখ মেলে কিছু

দেখার মতো ধৈর্য-স্থৈর্য তাদের কই? অতএব প্রেমের পীঠস্থান হিসেবে শ্মশানের মতো তোফা নির্ভয় জায়গা জগতে কোথাও নেই। দেখে ফেললেও বাড়ি ফিরে কেউ বলে দেবে না, এই যা ভরসা।

এই শোক-সভাতেও শর্বরী এমনই সুযোগের ধান্ধায় কতজন এসেছে, কেউ কি তার আদমসুমারি করতে পারবে? যথা তুমি আর আমি। যথা প্রণয়াসক্ত মধুর পাত্রে আটকে যাওয়া ছটফট আরও কত মৌমাছি! হায়, এই শহরটায় যে দু' দণ্ড কাছাকাছি আসার, ঘেঁষে-টেঁষে বসার ফাঁক-ফুরসুৎ বড়ই কম। ময়দানে পুলিশের চৌকি। পুলিশের হাতে চোখ-ঝলসানো অগ্নিগর্ভ টর্চ। তার চেয়ে এই সব সভা-টভা দিব্যি। চোখে চোখ মেলানো, হাতে হাত রাখা। হাঁটু সরিয়ে সদয় কোনও উরুর ছোঁয়া পাওয়া, কনুই নাড়ালেই পরিস্ফীত যৌবনের ইঙ্গিত ঈষৎ। একেবারে পরিপাটি ব্যবস্থা। শোক আর সঙ্গসুখকে মেলানো—দুটোই অতীব মানবিক, স্বাভাবিক। আমরা, মানুষেরা মরি, কেউ মরলে বুক-চাপড়ানো হা-হুতাশ করি এবং অতঃপর শুভ লগ্নের সংযোগ ঘটলে ছোট্ট একটা একটা মিষ্টি মরণে মরি।

মনুষ্যত্বের মানে তো এই। কিন্তু শর্বরী, আর মনে মনে বকবক করে তোমাকে জ্ঞান দিয়ে কাজ কী? বরং ওই মঞ্চে মনঃসংযোগ করি। অরিন্দমবাবু অনেকক্ষণ প্রস্থান করেছেন, তারপর সন্দীপের ফাঁপানো ছবিটার তলায় ধপাস করে বসে বসে এতক্ষণ অনেক জন পর পর পর কী যেন পড়ে গেলেন। সন্দীপের ডায়েরি? ওর লেখাটেখার অংশবিশেষ? কিন্তু আমি তো জানি শর্বরী, ওদের অনেকেই যা কিছু পড়লেন তা যেন পড়লেন এই প্রথমবার, ওঁদের চশমাকে মাইক্রোসকোপ বানিয়ে পড়ার ধরন থেকে ব্যাপারটা ডাহা বোঝা যাচ্ছিল। এই কপটতা কেন?

অথচ শর্বরী, আমি তো সঙ্গে সঙ্গে বলতে পারছি না যে, এখন সমবেত কণ্ঠে যা গাওয়া হচ্ছে, সেই গান কেন? ওই গাওয়ার মধ্যে যদি বা কোনও তৈরি করা ব্যাপার থাকে, গানগুলোর মধ্যে নেই। এ গান সন্দীপের, এ গান আমার, তোমার সবাকার। সকলেরই চোখের সামনে দুঃখ মৃত্যু আর আনন্দকে পাশাপাশি রেখে দেখিয়ে দেয়। এই সব গান। যে-গানে ঝলকে ঝলকে মৃত্যু হয় প্রাণ। এই যে, ওই সুরে সম্মোহিত আমি ওই সুরে আবিষ্ট অভিভূত তোমার অধরোষ্ঠের কাছে আমার মুখ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, হলঘরটার এই নিরালোক কোণটি কি নিরাপদ, কেউ দেখছে না, দেখল তো বয়েই গেল কেননা এই মুহূর্তে একই সঙ্গে অশ্রুপ্লুত আর বাসনায় জর্জরিত আমরা দুজন বেপরোয়া, কাকস্য পরিবেদনা, জর্জর আমরা দুজনই, তবু শর্বরী, আমাকে লক্ষ্মীটি, স্বীকার করতে দাও, আমি একটু ধূর্ত, তুমি একটু বোকা।

তুলে ধরা ঠোঁট দুটি নিয়ে তুমি যখন ভাবছো আমি তোমাকে প্রাণ দিতে যাচ্ছি, তখন শর্বরী, আমি তো জানি, আমি একটা নিপাট মিথ্যুক। আজ

বিকেল থেকেই আসল একটা খবর চেপে গিয়েছি। আমার ওই রাজরোগটা একদম সারেনি. রিলাপ্‌স করে, আফটার কেয়ার কলোনি থেকে শেষ জবাব দিয়ে আমাকে ছুটি দিয়েছে। শর্বরী, তুমি জানো না. প্রাণ নয়, একটি মৃত্যুর আসরে তোমাকে আমি মৃত্যু দিচ্ছি।

সেই রাত্রি

সেই স্তম্ভিত, পাথরের মত ভারী রাত্রিটিতে ওরা পরস্পরকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেছিল। মা আর দাদা আর বড়দি, বউদি আর ছোড়দি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে।

মানুষগুলো, মনে আছে, সেই ঘোলাটে-আলো মিটমিটে ঘরে হঠাৎ কেমন যেন ছোট হয়ে গিয়েছিল। ছোট, নিষ্ঠুর আর আলাদা। লঘু-গুরু মানেনি, সম্পর্কের বাছ-বিচার করেনি।

রাত্রিটির স্মৃতি ময়লা একটা ছবি হয়ে মনে এইভাবে টিঁকে আছে : ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা হ্যারিকেন, কালির ভেজাল মিশিয়ে বরাবর যেটা আলো বিলোয়, সেদিনও বিলিয়েছে। আলোটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা সবাই, সকলেই সকলের আপন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কথাটা কারুর মনে নেই। কয়েকটা বন্যজন্তু যেন হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গোঁ-গোঁ রোষে রোঁয়া ফোলাচ্ছে। জোনাকির মত একরকমের আলো সকলের চোখে : সবুজ-সবুজ, আবছা।

বাইরের হাওয়া থেকে থেকে জানালার পাল্লাটার টুঁটি টিপে ধরেছে, আমরা, আমি রিনু, অস্থির হয়ে এ ওর মুখের দিকে চেয়েছি, কথা বলতে সাহস হয়নি তো, শুধু বোবা চোখের মিনতি দিয়ে বলতে চেয়েছি, 'বড়দি, বড়দি, তোমরা চুপ কর।' দাদা মাঝে মাঝে হেঁকে বলেছেন, 'ছোটরা এখানে কেন, যাও, চলে যাও, বড়দের কথায় কেউ থেক না' আমরা তবু পালাইনি, এ-ওর মুঠি ধরে সরে সরে বসেছি, কেন থাকব না আমরা, কেন, কেন, এ-বাড়ি কি আমাদেরও নয়। বড়রা বিশ্রীভাবে ঝগড়া করলে দোষ হয় না, যত দোষ কি ছোটরা সে-কথা শুনলে!

মনে আছে, বউদি একবার চাপা গলায় কিন্তু ঝাঁজ মিশিয়ে দাদাকে বলে উঠল, 'মর, মর তুমি' তার উত্তরে দাদা, যাকে বরাবর নিরীহ, মিনমিনে বলে জানি, যে-ভাবে খেঁকিয়ে উঠে এগিয়ে এলেন, বউদি পালাতে পথ না পেয়ে বড়দিকেই একটা ধাক্কা দিল, দেয়ালে ঠোকর খেয়ে বড়দির কপালের কাছটা উঠল সুপুরির মত শক্ত হয়ে, আর বউদির বারো মাস রোগে ভোগা বাচ্চাটার ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না থমথমে আবহাওয়াটা সুতো-মুখ ছুঁচের মত ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেলাই করে গেল।

ঘরের এক কোণে কাঠ হয়ে আমি, রিনু আর মিনু ঠকঠক হাঁটুতে থুতনি রেখে দেখেছি। মেঝেয় নিরুপায় নখ টেনে টেনে ছিঁড়েছি হঠাৎ যারা ভীষণ হয়ে গেছে সেই বড়দের ভুতুড়ে ছায়া।

অথচ বিকেলের ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে, সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় এই রাত্রিটির আভাসও ছিল না।

ইস্কুল থেকে অন্যদিনের মতই সোরগোল করে ফিরেছি। মা রান্নাঘর থেকে ডেকে বলেছেন, খাবি আয়, আর আমরা জামা কাপড় না ছেড়েই এমন কী হাত-পায়ে জলটুকুও না ঢেলে ছুটে গেছি, মাকে ঘিরে বসেছি। রিনু কিনা সবচেয়ে ছোট, সে মার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছে, 'কই কী দেবে দাও।'

মা বলেছেন, 'কী আবার, মুড়ি।'

মুড়ি, শুধু মুড়ি?

রিনু সবচেয়ে ছোট; ছোট বলেই অবুঝ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বলেছে, 'হবে না, আজ সকালে রসগোল্লা আনিয়ে রেখেছ, দেখেছি। আমাদের দাও।' আর কীর্তনে যেমন দোহার ধরে, সায় দিতে আমরাও তেমনি হাততালি দিয়ে বলেছি, 'হবে না, হবে না। দাও, আমাদের দাও।'

মা এবার রেগে গেছেন। 'ছি তোরা কী! আজ মায়া আসবে না? সারা সপ্তাহ খেটেখুটে দু-দিনের জন্যে জিরোতে মেয়েটা আসে, তার জন্যে লুকিয়ে দুটো রেখেছি, তাতেও চোখ দিলি?'

মায়া, মানে আমাদের বড়দি।

আমরা মুহূর্তে চুপ করেছি। ফিস ফিস করে বলেছি, 'বড়দি বুঝি আজ আসবে, মা?'

'আজ শনিবার না?'

রিনুর জন্যে ফ্রক আনবে? আনবে। আমার বই? আনবে। মিনুর জামার ছিট? তাও আনবে বৈকি।

ছোড়দি কোথায় ছিল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। কুণ্ঠিতভাবে বলেছে, 'আর মা, আমার জন্যে? কানের সেই জিনিসটা আনবে না? যেটার প্যাটার্ন বদলাতে দিয়েছি?'

জেরায় জেরায় অস্থির হয়েই হয়ত মা রূঢ় গলায় বলে উঠেছেন, 'আনবে বাছা আনবে। লেখাপড়া তো শেখোনি, শুধু গয়নার ফূর্তি নিয়েই আছ।'

সব কথায় ফোঁড়ন দেওয়া বউদির বরাবরের অভ্যাস, আজও সুযোগ ছাড়ল না, পিছন থেকে বলে উঠল, 'সত্যি ভাই, তুমি যেন কী। নিজে বিয়ে না করে তোমার বিয়ের খরচ দিচ্ছে বড় ঠাকুরঝি, আর সামান্য একটা কানের দুল বদলে আনবে না? বরং খোকনের টনিক ওষুধটার কথা ভুলে না গেলে বাঁচি।'

সায় পেয়েও মা খুশি হলেন না, শুকনো গলায় বললেন, 'মায়া সংসারের কোন্ দরকারী কথা কবে ভুলেছে, বউমা?'

অপ্রতিভ হয়ে বউদি বলেছে, 'ভোলেনি মা।'

'তবে বল কেন। দেখছ তো নিজের চোখে; ওই তো কাঁচা বয়েসের একটা মেয়ে, নিজের সাধ-আহ্লাদ বলতে কিছু রাখেনি, রঙিন শাড়িটাও পরে না, গহনা বলতে একগাছি চুড়ি পর্যন্ত নেই, একটা হাতঘড়ি কিনেছে বটে, সেও কাজে লাগে বলে, সারা সপ্তাহ কলকাতায় হোস্টেলে থেকে মুখে রক্ত তুলে

খাটে, কার জন্যে বউমা? এই সংসারের জন্যেই। সপ্তাহের শেষে একদিনের জন্যে বাড়িতে যা জিরোতে আসে, শখ যদি বল, তবে এইটুকু শখ নিজের জন্যে রেখেছে।'

তারপর ঝিঁঝিঁ ডেকেছে, জোনাকির চোখে চোখে সন্ধ্যা জ্বলেছে। কুয়োতলায় বসে আমরা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে শুধু বড়দির কথাই ভেবেছি।

বলেছি, 'তোর মনে আছে মিনু?'

'কী?'

'সেবারে এখানে দাঁড়িয়ে বড়দি ছোড়দিকে যা বলে গিয়েছিল?'

'আছে।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না, কিন্তু মনে পড়ে গেল সবই। ছোড়দিই বুঝি বড়দিকে নির্জন বলে কুয়োতলাতে ডেকে এনেছিল। এনেছিল কিন্তু অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারেনি। বড়দিই তাড়া দিয়েছে, 'কই, কি বলবি বল।' তবু খানিক চুপ করে থেকে, থেমে থেমে ছোড়দি বলেছে, 'আমার একটা ব্যবস্থা করে দে, দিদি?'

বড়দি হেসে উঠেছে। 'কিসের ব্যবস্থা রে, বিয়ের?' ছোড়দি লজ্জা পেয়েছে, তবু অভিমান ধরা গলায় বলেছে, 'তুই তো হাসবিই। শরীরে খুঁত নেই, লেখাপড়া শিখেছিস, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিস। আমার দশাটা ভেবে দেখেছিস কখনও? একে মূর্খ, তাতে একটা পা ছোট, টেনে টেনে চলি। মা মারা গেলে কী হবে আমার, কোথায় থাকব? দাদার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস, টুকটাক কী করে কে জানে, নিজের বউ আর বাচ্চাটাকে পর্যন্ত খেতে দিতে পারে না।'

বড়দি আর হাসেনি। কুয়োর নীচেকার জলের দিকে চোখ রেখে বলেছে, 'বেশ, ছায়া, তোর বিয়ে হোক, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করে বা যেমন করে হোক, খরচ আমি দেব।'

ছোড়দির বড় বড় চোখ দুটি ছলছল করে উঠেছে, বলেছে, 'আর দিদি তুই?' বড়দি অন্যদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলেছে, 'আমার আবার কী। যেমন চলেছে তেমনি চলবে।'

ইতস্তত করে ছোড়দি আবার বলেছে, 'সংসার, বিয়ে-টিয়ে, এই সব?' এতক্ষণে বড়দিকে তরল গলায় হাসতে শুনেছি। 'বিয়ে-টিয়ে দূরের কথা, নিজের সম্পর্কে এখন অবধি কোন কিছুই ভাববার সময় পাইনি ছায়া।'

'তোর সাধ বলে কিছু নেই?'

'না। কী করেছি জানিস? সব সাধ আর ইচ্ছে একটা কৌটোয় পুরে এই কুয়োর জলে একদিন ফেলে দিয়েছি।'

সেই বড়দি আসছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই বৃষ্টি নামল, জোরে নয়, ফোঁটা ফোঁটা, তাতেই আমাদের শহরতলির রাতকানা গলির কোণের টিমটিমে মিউনিসিপ্যাল বাতিটা ঝাপসা হয়ে এল।

মা একবার জানালায় এসে পথের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। ছট্‌ফট্‌ করেছেন, মাঝে মাঝে বলেছেন, 'মায়া তবে বোধ হয় বিকালের গাড়িটা ধরতে পারেনি। নইলে এতক্ষণ এসে যেত।'

দাদা কোথা থেকে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির হয়েছে। কলাপাতায় জড়ানো গোটাকয়েক বকফুল রেখেছে চৌকাঠের ওপর। মা বলেছেন, 'এ কী রে।' লজ্জিত গলায় দাদা জবাব দিয়েছে, 'আজ মায়া আসবে না? ও যে বকফুল ভাজা খেতে ভালবাসে।'

হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে মা আমাদেরই—আমরা যে এত ছোট, তবুও সাক্ষী মেনেছেন।—'ছোট বোনের ওপর টান দেখেছিস? কী খেতে ভালোবাসে, খুঁজে খুঁজে নিয়ে এসেছে। আমি আর ক'দিন। ভাইবোনের এই ভালবাসাটুকু বরাবর যেন থাকে বাবা।'

অপ্রতিভ দাদা পালাতে পথ পায়নি।

আরও কিছু পরে শোবার ঘরে মাদুর পেতে আমরা সকলে গোল হয়ে বসেছি। হ্যারিকেনটা আছে মাঝখানে সাক্ষী, আমাদের সম্মুখে বইয়ের পাতা খোলা। হাত-পা ধুয়ে দাদা তক্তপোশে বসেছে পা ঝুলিয়ে। মা-ও একটু পরে পাশে এসে বসেছেন।

আগেই বলেছি, বইয়ের পাতা খোলা, কিন্তু ওই খোলাই। আমরা পড়ছি না তো, উৎকর্ণ হয়ে আছি। জানি, এই সময়টাতে মা-দাদাতে মিলে সংসারী কথা হয়, তার কিছু কিছু আমাদেরও কানে আসে, শুনে শুনে শোনাটাই আমাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ঠোঁটে আঙুল রেখে আমরা বলেছি, 'চুপ, চুপ।' রিনু, মিনু আর আমি।

মাকে বলতে শুনেছি, 'ছায়ার বিয়েটা তাহলে এখানেই ঠিক করি? খুব ভাল ঘর-বর অবশ্য নয়, তবে গেরস্ত ঘর, খাওয়া-পরার দুঃখ হবে না। তাছাড়া খুঁতো মেয়ে, এর চেয়ে ভাল বর পাচ্ছিই বা কোথায়?'

দাদা বলেছে, 'টাকা?'

'মায়া বলেছিল তো সে-ই দেবে। অফিস থেকে ধার করে। কত টাকা চাই, সে-হিসাবও মোটামুটি করে ফেলেছি। মায়া আজ এলে ওর সংগে বসে হিসেবটা একবার দেখিস বাবা।'

দেখতে পেয়েছি, ছোড়দি দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ইশারায় মিনতি করে বলেছে, 'বলিস না, বলিস না।' ওর বিয়ের কথা কিনা, চুরি করে শোনবার লোভটুকু সামলাতে পারছে না। এক একবার এসে দাঁড়াচ্ছে, মুখে আঁচল, কপাটে কান, আবার পা টেনে টেনে চলে যাচ্ছে ও-ঘরে, বউদির রোগা টিঙটিঙে বাচ্চাটাকে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলেছে।

দাদা বলেছে, 'মায়া টাকা দেবে ছায়ার বিয়ের? আর আমি আর সতীশ মিলে অর্ডার সাপ্লাইয়ের নতুন যে কোম্পানী খুলব ঠিক করেছি, তার জন্যে মায়ার কাছে কিছু টাকা চাইব ভেবেছিলুম যে। মায়াকে আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টর করে দেব। ও এলে তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না মা।'

মা বললেন, 'ছি। এমনিতেই তো কত টাকা দিচ্ছে সংসারে। ছোট বোনের কাছ থেকে আর টাকা নিতে নেই বাবা। তাছাড়া ছায়ার বিয়ে হয়ে যাওয়াটাও যে খুব দরকার, সোজা কথাটা বুঝছ না?'

শুনেছি, মা চোখ বুজে গদগদ গলায় বলে গেছেন, 'এই বিয়েটা চুকে যাক, তারপর আমি আমার বড় মেয়েরও বিয়ে দেব। বাছা আমার কত দিন যোগিনী হয়ে থাকবে। তুই তখন খরচাটা চালিয়ে নিতে পারবি না?'

মাথা চুলকে দাদা এদিক ওদিক চেয়েছে।—'পারব মা!'

হঠাৎ ভয় পেয়ে মিনু যখন চেঁচিয়ে উঠেছে, 'সাপ, সাপ', তখনও বড়দি এসে পৌঁছোয়নি। দাদা আর মা ছুটে এসেছে। সাপ? কোথায় সাপ। হ্যারিকেনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা হল, কিছু তো নেই। জড়োসড়ো হয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে এ ওকে, আঁকড়ে ধরে কেঁপেছি, মিনু, লজ্জিত, বিব্রত, কাঁদো কাঁদো হয়েছে, 'পায়ের পাশ দিয়ে ঠান্ডা কী একটা গেল যে।'

তখন দেখা গেল, সাপ তো নয়, জল; জলের স্রোত। ছাদের একটা কোণে কবে ফাটল ধরেছে টের পাইনি, আজ এতক্ষণ ধরে মেঝের অন্ধকার কোণে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়েছে, এখন আমাদের পড়বার জায়গাটুকুর পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নর্দমার দিকে।

সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মা বলেছেন, 'বাসাটা তো বদলাতে হয়, বলাই। কবে দেয়াল চাপা পড়ে মরব ঠিক নেই।' ও-ঘরে অনেকক্ষণ ধরে বউদির বাচ্চাটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছিল আর কাশছিল। মা বলেছেন, 'ওই শোন। ও-ঘরটাও যে স্যাঁতসেঁতে, বুকে সর্দি বসেছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, ঘুমোতে পারে না।'

শুকনো, হয়ত ঈষৎ বিরক্ত-গলায় দাদাকে বলতে শুনেছি, 'বুঝি তো সব, কিন্তু করব কী, বল?'

আর ঠিক তখনই আমরা সকলে, মনে হল সকলেই একসঙ্গে বড়দিকে দেখতে পেয়েছি। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জুতো ছাড়ছে।

মা তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে দিলেন ছুঁড়ে, 'মাথাটা মুছে নে। ইস, একেবারে নেয়ে এসেছিস, জামা কাপড়টাও ছেড়ে ফেল। আগের গাড়িটা বুঝি ধরতে পারিসনি?'

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল বড়দি, আর আমরা একটু ভয়ে একটু কৌতূহলে ওকে মিটমিট করে দেখতে থাকলুম। মিটমিট করে, কেননা বড়দির দিকে সোজাসুজি চাইতে কোনদিনই সাহস হয় না, সেদিনও হয়নি। ফি শনিবারে যেমন, আজও বড়দি তেমনি। তেমনই করুণ, গম্ভীর, ক্লান্ত। আঁচলে বারবার মুখ ঘষছে, বোধহয় এত পথ হেঁটে এসে ঘেমেছে, মা হাত-পাখা নিয়ে পাশে দাঁড়ালেন।

'এবারে হাত মুখ ধুয়ে আয়। কিছু মুখে দিবি?'

প্লেট থেকে রসগোল্লা ভেঙে ভেঙে নিজেই বড়দিকে খাইয়ে দিতে গেছেন মা, বড়দি লজ্জায় পড়ে খালি মাথা নাড়ছে, কিছুতে মুখ তুলবে না, বারবার বলেছে, আমার হাতে দাও মা, আমি খেতে জানি, মাও ছাড়বেন না—এই মধুর

দৃশ্যটুকু ভোলবার নয়। একটু দূরেই লুব্ধ, বিস্মিত আমরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম যে। রিনু, মিনু আর আমি।

এই সময়ে, নিয়ম এই যে, আমরা বড়দির কাছে যাব না। বড়দি ইশারায় ডাকলেও না। কেননা, গেলেই নিজের খাবারের থেকে আমাদের ভাগ দেবে বড়দি। মা বকবে।

আমরা বড়দির কাছে এসেছি। দূর থেকে বড়দিকে মনে হয়েছিল শুধুই ক্লান্ত. কাছে গিয়ে দেখেছি একটু খুশি খুশি ভাবও মুখের কোন্‌খানটাতে যেন লুকোন রয়েছে।

রিনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বড়দি বলেছে, 'কী রে পড়তে বসিসনি আজ?'

আদর পেলে রিনু আরও যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়, আধো আধো গলায় কথা ফোটে কি ফোটে না। আমরা তাই তিনজনেই একসঙ্গে বলেছি, 'বসে-ছিলাম বড়দি, কিন্তু ছাদ থেকে জল পড়ল যে!'

আমাদের কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন, 'সত্যি মায়া বাড়িটা বড় পুরনো হয়ে গেছে. কবে কি হয় বলা যায় না। অসুখ তো লেগেই আছে। বাচ্চাটা সেই থেকে কেমন কাশছে. শুনছিস না?'

'শুনছি তো।'

'তুই তো কবে থেকে বলছিস. আমিই এতদিন গা করিনি। এখন ভেবে দেখছি মায়া, তোর কথাই ভাল. ছায়ার বিয়েটা চুকে গেলে কলকাতায় আমাদের সকলের জন্যেই ছোটখাটো একটা বাসা দেখ। এ-বাসায় আর চলে না।'

বড়দি অন্যমনস্ক সুরে বলেছে, 'বেশ তো। কিন্তু দাদা—দাদার বিজনেস কী হবে?'

বউদি কখন এসে দাঁড়িয়েছিল. ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ভারী তো বিজনেস। ঘরে কোনদিন পয়সা তো আসতে দেখিনি। বাচ্চাটা তো আগে বাঁচুক. আমরা তো প্রাণে বাঁচি। ঠাকুরঝি. তুমি কলকাতায় বাসা ঠিক কর। আর শোনো'— বড়দির কানের কাছে মুখ নামিয়ে বউদি বলল. 'তোমার দাদা ব্যবসার জন্যে তোমার কাছে কিছু টাকা চাইবে। কক্ষনো দিও না।'

হালকা অলস ভঙ্গিতে দু হাত তুলে বড়দি হাসল। 'খেপেছ। কিন্তু এবার খেতে দাও তো, মা। ঘুম পেয়েছে. সত্যি।'

হ্যারিকেনটা ঘিরে পাতা পড়েছিল। সপ্তাহে এই একটা দিন আমরা এক-সঙ্গে খেতে বসতুম! মা নিজের হাতে পরিবেশন করতেন।

বড়দের খেতে সময় লাগে। ওরা খায়. গল্প করে খায়। আমরা ছোটরা কয়েক গ্রাসে পেট পুরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি, শুয়ে পড়েছি ঢালা বিছানায়।

যতদূর মনে পড়ে. মিনুই প্রথম কথাটা তুলেছে। ফিসফিস করে বলেছে, 'বড়দি কেমন একটু বদলে গেছে. দেখেছিস!'

'বদলে গেছে? কই, দেখিনি তো!'

'কেন. ওই যে হাতের দু-গাছি চুড়ি। বড়দিকে কখনও এসব কিছু পরতে

দেখেছিস।'

রিনু সায় দিয়ে বলেছে, 'আর তেল। কী তেল যে আজ মেখে এসেছে বড়দি। আমি তো ওর পাশেই বসেছিলুম। জানিস, মাথা ঝিম-ঝিম করে আমার ঘুম এসে গিয়েছিল।'

তখনই কানে এল, বড়দি খিল-খিল করে হাসছে। অনভ্যস্ত বলেই কানে একটু বেসুরো লেগেছে। মনে হয়েছে, বড়দিকে এতখানি শব্দ করে হাসতেও কি কখনও দেখেছি!

বালিশের আড়াল থেকে চুরি করে চেয়ে দেখেছি, মা আস্ত একটা কলা ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন বড়দির দুধের বাটিতে, আর কপট আতঙ্কে দু-হাত তুলে বড়দি মিনতি করে বলছে, 'না, না।'

নিস্তেজ হ্যারিকেনটা ঠোঁট টিপে হাসছে।

কেননা, একটু পরেই কী ঘটবে সে বুঝি জানত। জানত যে, মধুর এই ছবিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। স্নেহ-প্রীতি-মায়ার টানে বাঁধা কয়েকটি মানুষ স্বল্পালোক ঘরে বাঘের মতো জ্বলজ্বল চোখে পরস্পরের দিকে তাকাবে আর হাপরের মতো হাঁপাবে।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েও বড়দি চৌকাঠের উপরে থমকে দাঁড়িয়েছে। একটু চমকে গেছেন মা-ও। তাড়াতাড়ি বড়দির শখের থলিটাকে পিছনে লুকিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু বড়দির কিছু চোখ এড়ায়নি। ভুরুতে কুঞ্চন এবং গলায় বিরক্তি ফুটেছে। 'ও কী মা, ও কী, আমার ব্যাগ খুলেছ কেন।'

মা ধরা পড়ে গিয়ে ঢোঁক গিলেছেন, সত্যি-মিথ্যা জড়াতে গিয়ে এলোমেলোভাবে বলেছেন, 'খুলেছি? কই না তো। ও হ্যাঁ, দেখছিলাম কেমন জিনিসটা, চাবি ছাড়াই খোলে কিনা। ক-টা খুচরো পয়সার দরকার ছিল।'

শুকনো গলায় বড়দি বলেছে, 'পয়সার দরকার তো আমার কাছে চাইলে না কেন। কেন হাত দিতে গেলে আমার ব্যাগে? জানো না, না-বলে অন্যের জিনিসে হাত দেওয়াকে কী বলে?'

মার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। রুদ্ধ গলায় বলেছেন, 'কী?'

'চুরি। চুরি। চুরি।' মুখের পেশী কঠিন, জিভটাকে ছুরির ফলার মতো ধারালো করে বড়দি বলেছে।

'কী বললি, কী?' দেখেছি মার শরীরটা পা থেকে মাথা অবধি কেঁপে উঠেছে, দু-হাতে সমস্ত জোর জড়ো করে তিনি ব্যাগটা বড়দির গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন, বড়দির গায়ে লাগেনি, কিন্তু ব্যাগটার মুখ বন্ধ ছিল না বলে ভিতরের সব জিনিস ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। খুচরো পয়সা, টুকরো কাগজ, নানা টুকিটাকি।

আর, আমরা, ছোটরা, বিছানা থেকে উঠে পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কুড়িয়ে তুলতে গেছি। রিনু একটা ফোটো পেয়েছিল। ফস করে বউদি সেটা কেড়ে নিল, তুলে ধরল আলোতে—'তোমারই রবি।' মুচকি হেসে বলল, 'রবি

কে ঠাকুরঝি! কার ফোটো?'

ভয়, বিদ্বেষ, তেজ—বড়দির চোখে সব একসঙ্গে জ্বলে উঠতে দেখেছি। হিংস্রভাবে সে এগিয়ে গেছে বউদির দিকে, বলেছে, 'দাও, দাও, ও-ছবি দাও।'

'দিচ্ছি। দেব। তোমার জিনিস আমি কি আর রাখব ঠাকুরঝি। কিন্তু বললে না তো কে?'

বড়দি বলেছে, 'আমার বন্ধু।'

একটা চোখ অতিশয় ছোট, চাউনি অতিশয় অর্থময় করে বউদি নিতান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলেছে, 'বুঝেছি। এই জন্যেই কি মা তোমার ব্যাগে হাত দিতে না দিতে অমন খেপে গিয়েছিলে ঠাকুরঝি?'

সাহস পেয়ে ছোড়দিও এগিয়ে এসেছে। দুটো সিনেমার টিকিটের টুকরো বড়দির চোখের সামনে মেলে ধরে বলেছে, 'আর এই বন্ধুটির সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলে বলেই বিকেলের গাড়িতে বুঝি আসতে পারনি?'

হ্যারিকেনটার শিখা দপ-দপ করে কাঁপছিল। ভয় হয়েছিল, চিমনিটা ফট করে ফেটে ঘরটা বুঝি কালো কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে।

মা হঠাৎ বলে উঠেছেন, 'ছি, মায়া, ছি! তুই এতটা নেমে গেছিস?'

মনে আছে চকচকে অপলক কালো চোখ—বড়দি ফোটো তোলার মতো সুন্দর ভঙ্গি করে দাঁড়াল, উদ্ধত উন্নত উদ্যত।—'নেমে গেছি? কী করে এসব যে তোমাদের মাথায় আসে মা। জানলেই যদি, তবে সবটাই জেনে রাখ। রবিকে আমি বিয়ে করব!'

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে কনকনে হিম বরফ-ঝরানো হাওয়ায় যেন ঘরটা ছেয়ে গেছে। সহসা সকলে চুপ করে গেছে। কঁকিয়ে উঠেছে বউদির কোলের বাচ্চাটা, দমকে দমকে কেশে নীল হয়ে গেছে। সে থামলে মা-ই প্রথম কথা বলেছেন, 'বিয়ে করবি?'

'করব। আমি নিজে থেকে পরে বলতাম, কিন্তু তোমরা জোর করে আজই জেনে নিলে। হ্যাঁ করব, আসছে মাসেই।'

'আসছে মাসে যে ছায়ার বিয়ে পাকা করেছি। তুই তো গরজ দেখিয়েছিলি, খরচপত্র জোগাড় করবি বলেছিলি' 'পারব না। আমরাও বাসা করব। অনেক খরচ আছে।' পিছন থেকে হিস-হিস করে কে বলে উঠেছে, 'স্বার্থপর, স্বার্থপর কোথাকার।' চেয়ে দেখেছি, ছোড়দি। ঘৃণা আর হতাশা দু-চোখে পুরে নিয়ে বড়দির দিকে চেয়ে আছে।

এবারে মা মরিয়ার মতো হয়ে বলে উঠেছেন, 'খোঁড়া বোনটা তবে আই-বুড়ো হয়ে থাকবে?'

'দায়িত্ব তো আমার একার নয়।'

মা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছেন, 'কলকাতায় আলাদা বাসা করবি বলছিস, আর আমরা এখানেই পড়ে থাকব, এই ভাঙা বাড়িতে, ঝড়-জলে কষ্ট পেয়ে।'

বড়দি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে, উত্তর দেয়নি।

হঠাৎ তীব্র, ঝাঁঝালো গলায় মা বলে উঠেছেন, 'এত লোভ তোর! তবে

যে বলতিস তুই যোগিনী, সন্ন্যাসিনী, সে কি শুধু লোকের কাছে দাম বাড়াতে?'

তিক্ত স্বরে বড়দি বলেছে, 'মিথ্যে কথা বলো না। ও-সব বড়াই আমি কখনও করিনি। খোঁড়া বলে এক মেয়ের বিয়ে হয় না, ছেলে বেকার, বিয়ে করেছে কিন্তু ঘরে এক পয়সা আনে না, তাই তোমরাই সকলে মিলে আমাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছিলে। মনে নেই? তা, অনেক দিন তো হল মা, বয়স আমার এখন বত্রিশ, সন্ন্যাসিনীর পার্টে প্লে-ও মন্দ করলুম না। এবারে ছুটি দাও!'

দাদা এতক্ষণ কিছু বলেনি, কিছু বলার সুযোগ না পেয়েই বুঝি মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে উঠেছে, 'ছোটরা সব সরে যাও, শুয়ে পড় যে যার জায়গায়,' বাকী সময়টা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে। সে এইবার বোকার মতো বলে উঠল, 'ঠিক বলেছিস মায়া, আমাকে রোজগার করতে হবে। একটা কোম্পানী খুলব ঠিক করেছি। তুই আমাকে কিছু টাকা দিবি মায়া, শেয়ার কিনবি? তোকে ডিরেক্টর করে দেব।'

ন্যালা-ভোলা মানুষ, পাগলের মতো আরও কত কী বলে যেত ঠিক নেই, কিন্তু বৌদি বলতে দেয়নি, দাদাকে টেনে পিছনে নিয়ে গেছে। কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে বলেছে, 'ছেলে-বউ খাওয়াতে পার না বলে সব সময় খোঁটা শোন, লজ্জা করে না তোমার?'

দাদা তবু বোকার মতো হাসছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বউদি বলেছে, 'অক্ষম অপদার্থ! মর, মর তুমি।'

আশ্চর্য, এতক্ষণে দাদার পৌরুষে লেগেছে, মুঠি পাকিয়ে এগিয়ে গেছে, আতঙ্কিত চোখ দিয়ে আমরা সব দেখেছি, অস্থির হয়ে এর কাছ থেকে ওর কাছে ছুটে গেছি, চোখ দিয়েই বলতে চেয়েছি, 'বউদি, চুপ কর পায়ে পড়ি। দাদা, দাদা, থাম।' ভীত বউদি পালাতে গিয়ে বড়দির গায়েই পড়েছে, বড়দির কপালটা ফুলে হয়েছে সুপুরি, আর বউদির রোগা বাচ্চাটা কান্না আর কাশি মিশিয়ে অবিরল ঘর্ঘর গলায় একটানা কেঁদে গেছে।

শেষবারের মতো দপ-দপ করে হ্যারিকেনটা তখনই নিবেছে।

সেই রুদ্ধশ্বাস আর বিশ্রী আর কালিঢালা রাত্রে আমরা বালিশে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। বড়দি আলাদা বাসা করবে, পর হয়ে যাবে, সেই দুঃখে। এতকালের এত আপন কয়েকটি মানুষ হঠাৎ কুৎসিত ঝগড়া করে একেবারে পর হয়ে গেল, সেই লজ্জায়।

আসলে তখন বয়স কম ছিল, মূঢ়, অব্যক্ত যন্ত্রণায় কষ্ট পেতাম, কিন্তু কিছু বুঝতাম না। বুঝলে টের পেতাম, কিছুই পর হয়নি, আপন যারা, তারা আপনই আছে। নিজেদের ভালও বাসে। আর নিখাদ ভালবাসা কাঁচা লোহার মতো ঠুনকো। ঘৃণা দ্বেষ এইসবের মিশাল দিলে তবে সেই ভালবাসা ইস্পাতের মতো মজবুত আর কঠিন হয়।

আরও একটা কথা সেদিন ভেবে দেখিনি। রাতটা অসহ্য লাগছে, কিন্তু রাতের পর তো সকাল আছে। সকালের আলোয় অনেক কিছু চোখে পড়ত

বড়দির, যা আগের দিন আধো-অন্ধকারে ভাল করে দেখা হয়নি। তখন নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেত।

দেখত, ছাদ আর দেয়ালের ফাটলে বৃষ্টির জলের শুকনো দানা, বউদির বাচ্চাটার জিরজিরে বুকের হাড় ক'খানা সত্যিই গোনা যায়; একটা পা টেনে টেনে ছোড়দি হাঁটে; তার অসহায় করুণ রূপ ওর চোখকে বারবার পীড়া দিত। এই পরিবার থেকে পর হয়ে যাবার দুর্বল ইচ্ছাটা সঙ্গে সঙ্গে শিকড়-সুদ্ধ উঠত নড়ে।

তারপর চুল আঁচড়াতে আয়নার সামনে দাঁড়ালে যখন একটি দু'টি পাকা চুল চিকচিক করে উঠত, তখন কুণ্ঠায় ভয়ে ওর হাত থেকে চিরুনিটাও কি খসে পড়ত না। শেষবারের মতো বড়দি ভাবত, সব সাধ-আহ্লাদ কৌটোয় পুরে একদিন তো কুয়োতেই ফেলে দিয়েছিল, কৌটোটা জলের তলেই থাকুক, তাকে আর তুলে এনে কাজ নেই।

অসুখের সুখ

দরজার দিকেই মুখ ফেরানো ছিল। প্রথমে চৌকাঠে, পরে ঘরের ভিতরে, মেঝের উপরে আস্তে আস্তে পা ফেলে ওকে এগোতে দেখেই লতা অস্ফুট একটা শব্দ করল; করল, অথবা শব্দটা বেরিয়ে এল তার নিজস্ব, স্বয়ংক্রিয় কোনও অবধারিত বলে, উচ্চারকের সত্তার অন্তর্গত কোনও স্বভাবী প্রতি-ক্রিয়ায়; ওটা আধিমানসিক, আধিদৈহিক কোনও বিজ্ঞান-বশবর্তী নিয়মের আজ্ঞা? ঠিক বোঝা গেল না। বস্তুত বোঝার জন্যে তখন কেউ ব্যস্তও ছিল না, তলিয়ে দেখেনি কেউ, না লতা, না ঘরে যে এসেছিল সে। ওই ধ্বনিটার গোত্র-চরিত্র কেউ কি কখনও বিচার করে দ্যাখে, ওটা আসলে খানিকটা সুখের, খানিকটা অবাক-ভাবের সূচক অব্যয়মাত্র। লোকে অজ্ঞাতসারে উচ্চারণ করে (লতা যা করেছিল), অন্যেরা শুনেও শোনে না, বা অন্যমনস্ক গ্রহণ করে (সে যেভাবে গ্রহণ করল।) "তুমি!" কিংবা অনুরূপ কোনও আকস্মিক অভিব্যক্তি জগতের আবহধারায়, মানে অদ্যাবধি যত ধ্বনি নানা সূত্রে নির্গত হয়েছে সেই অলক্ষ্য প্রবাহে আপনা-আপনি অশ্রুত প্রথিত হয়ে যায়।

যে এসেছিল তার এক হাতে কিছু ফুল, আর-এক হাতে ফল, একটু আনাড়ি, একটু-বা অপ্রস্তুত সে ফুলের গোছাটাকে কোনও রকমে শুইয়ে দিল লতার মাথার বালিশের পাশে, কিন্তু ফলগুলোকে গচ্ছিত রাখার কোনও জায়গা ছিল না, কিংবা স্নায়বিক সাময়িক অন্ধতাবশত সে তেমন কোনও জায়গা খুঁজে পাচ্ছিল না; এ-রকম হয়, এর মূলে কি অহেতুক কোনও ভয়? —সে জানে না, খালি হয় যে সেই ব্যাপার, স্বকীয় অঙ্গ-প্রত্যয়ের সেই বেয়াড়া ব্যবহার সে জেনেছে বহুবার, আজ আবার জেনে, ফলগুলো ধুপ করে নামাল বেড-এর পাশের অদ্বিতীয় টুলটাতে, পরিশেষে হালকা, ভারমুক্ত হাত দুটির একটি দিয়ে রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত কপাল মুছল।

"হাঁপাচ্ছ", লতা বলল, ঠিক জিজ্ঞাসা নয়, জিজ্ঞাসা আর বিবৃতির মাঝা-মাঝি শুধু একটি শব্দে সম্পূর্ণ একটি বাক্য, আর সে, এইমাত্র দেখতে শ্বেতপাথরের মতো কিন্তু আসলে অন্য কোনও নকলনবিশ ধাতুতে নির্মিত উঁচু উঁচু ধাপ টপকে যে উঠে এসেছে সে বলল, "সিঁড়ি ভাঙতে হল যে!"

"ক'টা?"

"গুনিনি। তবে এই চারতলা অবধি শ' দেড়-দুই তো হবেই।"

"লিফ্‌ট ছিল না?"

"ছিল হয়তো, কিন্তু ডাক্তার-নার্স-পেশেণ্ট আর স্পেশাল পারমিশন-

পাওয়া ভিজিটর ছাড়া কাউকে নেয় কিনা জানি না, তা ছাড়া, দাঁড়িয়ে থাকলে খুব দেরি হয়ে যেত. ঘড়ি দেখলাম, সওয়া ছ'টা বেজে গেছে, সময় ছিল না।"

লতা অল্প অল্প মাথা নেড়ে, ফলে কপাল আর কানের দু'এক গাছি শুকনো চুল উড়ল, সায় দিল "না, সময় ছিল না। কিংবা বলা যায়, ছিল, কিন্তু চলে গেল।"

বেডের ধারেই পা ঝুলিয়ে বসল সে। রুগ্ন একটা হাত, স্পষ্ট শিরা-উপশিরার নদীপথ আঁকা সেই ফ্যাকাশে হাতটা যেন প্রাকৃতিক মানচিত্র, বালিশের পাশে শিথিল পড়ে; সে-দিকে চেয়ে সে লতাকে, অথবা হয়তো-বা লতাকে নয়, কাউকেই নয়, তার নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল "কবে গেল?"

বলেছিল খুব আস্তে, তবু লতা শুনতে পেল। লতা বলল, "টের পাইনি তো; ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রাখিনি। সময়ের ওই স্বভাব! না বলেই যায়।" শুনে, সে—পিন-ফোটানো বেলুন থেকে বাতাস যেমন ফুস করে, কতকটা চাপা দীর্ঘশ্বাসের ধরনে, বেরিয়ে যায়, সময়ের প্রস্থানের দৃশ্যটিও কি তেমনই?—সে ভাবছিল, এবং থৈ না পেয়ে রোগিণীকে সায় দিয়ে সান্ত্বনা দিতে শুদ্ধ নিখাদ সহানুভূতির সুরে বলল, "যাক না। তুমি তো সেরে উঠছ, সেইটেই তো আসল, তাই না?"

"সেরে উঠছি? হবে।" লতা বলল স্তিমিত স্বরে। ঘরের মেঝের মরা রোদ্দুরের দিকে চেয়ে। আর সেই সঙ্গে তার কালচে সিঁটিয়ে যাওয়া ঠোঁটে একটুখানি হাসিও বুঝি ফুটিয়ে তুলতে চাইল সে, যেন ওই হাসিটুকু জেবলে দিয়েই আলোর অভাব মেটাবে, ঝাপসা বাদুড়ডানা সন্ধ্যাটাকে ভিতরে ঢুকতে দেবে না। পা ঝোলাতে ঝোলাতে হাসল লোকটিও, তবে মনে মনে, আহা, মানুষ কত বিশ্বাসই পুষে রাখে, লতা এখনও রেখেছে। বিষয় পালটাতে অথবা বলা যায়, কথা তো চালিয়ে যেতে হবে, সেই জরুরী তাগিদে লোকটি বলল, "ভেবেছিলাম, ভিড় দেখতে পাব, কেউ আসেনি? আসে না?"

"আসে। এসেছিল। চলে গেছে।" (যেন সময়েরই মতো—এই অংশটুকু লতার অনুক্ত স্বগত।) তবু কী আশ্চর্য লোকটি যেন ওই না বলা সংলাপ-টুকুও শুনতে পেল আর তারই খেই ধরে সে বলল "তুমি একটু আগে সময়ের কথা কী যেন বলছিলে?"

"যা বলছিলাম, তা তুমিও জানো, জানতে হয়, একদিন না একদিন, সবাইকেই। সময়ের স্বভাবের কথা। যায় অনেকেই, কেউ কেউ আবার ফিরেও আসে। সময় একবার গেলে আর ফেরে না।"

"আমি কিন্তু ফিরলাম।" তৎক্ষণাৎ এই জুৎসই জবাবটা সে দিলেও দিতে পারত, কী ভেবে তবু চুপ করেই থাকল, কারণ সততা তার জিভের মুখে পাহারা বসিয়েছে, ফিরেছে কি ফেরেনি সে প্রকৃতই জানত না, ধরতে পারছিল না। সুতরাং মেঝেয় জুতো ঠুকে ঠুকে সে বার কয়েক শানটা কত কঠিন, সেটাই যেন নিরর্থক পরখ করতে থাকল, আসলে পা কাঁপছিল তার, বিছানার কিনারে যে স্থিতি আর ভারসাম্য বার বার হারিয়ে ফেলছে সেটাকেই পায়ের নিচের

সিমেনটে মেলে কি-না, ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইছিল।

এই দিনটা তার কাছে পরে দীর্ঘকাল ছিল অস্পষ্ট, মানে দিনটির স্মৃতি, যার ঝকমকে কোনও ছাপ মনের পাতায় মুদ্রিত রইল না। অথবা টাটকা ছবি ক্লিপ দিয়ে আঁটা হয়েছিল হয়তো, আমরা যেভাবে অ্যালবামে চিত্রাবলী সংরক্ষণ করি তেমনই কোনও বিশ্বস্ত, অর্ধসচেতন আবেগ বা ইচ্ছার অনুবর্তী হয়ে, কিন্তু ক্লিপ খসে ছবি পড়ে যায়, কিংবা অ্যালবামটাই অবহেলায় ধুলোর স্তরে কবে যে ঢাকা পড়ে, কবে যে! আমরা টের পাই না। প্রকৃতপক্ষে সেদিন কী কী ঘটেছিল পুরোপুরি স্মরণ করতে না পেরে নিজের উপরেই মাঝে মাঝে খেপে গেছে লোকটা। গাল আর থুতনি বেয়ে অসতর্ক, অন্যমনস্ক দাড়ি কামাবার কারণে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত নেমেছে, কিংবা ডালিম দানার মতো শক্ত হয়ে টকটকে চটচটে কয়েকটি বিন্দুর আকৃতি নিয়েছে। যত ভুলছে, যত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি, লোকটা ততই চটে যাচ্ছে, অস্থির পায়চারি করেছে ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে ঘরে, অকারণেই বার বার গেছে অফিসের টয়লেটে, বেসিনের গহ্বরে মুখ নুইয়ে, যেন তাকে কতই গোপন কথা বলবে, এমন ভঙ্গি, বলবে ওই বেসিনটাকে, তারপর হঠাৎ মাথা তুলে আয়নার দিকে সটান তাকিয়ে ক্রমাগত থুতু ছিটিয়েছে। নিজেকে? লতাকে? নাকি লতা যে দুটি অপোগণ্ডের ভার তার উপরে চাপিয়ে একদিন হারিয়ে গিয়েছিল সেই স্মৃতিটার, সেই অবাঞ্ছিত সংসারটার গায়ে? আগে, প্রথম প্রথম, যখন তার দিনরাত আঘাতে ম্রিয়মাণ, অস্থিরতায় টলমল, মানে সেই তিন-চার বছর আগেকার রাহুগ্রাসে আধখানা খাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া সময়ে, সে ঘুমের বড়ি খেত ঘন ঘন, ভাগ্যিস মাত্রা ছাড়িয়ে কোনদিন গেলেনি, ট্যাবলেটের সংখ্যা গোনা-গুন্তির মধ্যেই আবদ্ধ রেখেছিল (এ-সব ব্যাপারে চিরভীরু নির্জ্ঞান আমাদের সহায়তা করে, অর্থাৎ আড়াল থেকে লাইফ-বেলট ভাসিয়ে রাখে বরাবর চেতনার সাগরে, আচ্ছা, চেতনা কি একটা সাগর), ওই ছটফট কালেই সে একবার আকণ্ঠ চোঁ চোঁ শান্তি পান করতে সমুদ্রতীরেও যায়, কিন্তু পান করা হয় না, এত নীল গলাধঃকরণ করা সোজা নাকি, অতএব গুটিকয় ভাঙা ঝিনুক ঝাঁপিজাত করে ফিরে এসে সে বিবিধ আকারের সুপ্রাচীন শামুকাদির খোলস (একেই কি ভালো বাংলায় জীবাশ্ম বলে?) বাচ্চাদের হাতে তুলে দেয়, তাদের তৎক্ষণাৎ কাড়াকাড়ি করতে দেখে হঠাৎ মেজাজটা কেমন বেবলগা, তার স্থিতধী ব্যক্তিত্ব কেমন নগ্ন, নিষ্ঠুর, হিংস্র হয়ে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে সে পশুদের চেয়েও অনুচিত আচরণ করে, মানে, বাচ্চাদের চড়-চাপড়-মারধোর, অবশেষে হাল ছেড়ে কেমন আলগা হয়ে নিজেই হাঁপায়, এক মনে এক কোণে কাঁদে কাঁদে কাঁদে, বলা ভালো যতটা নিঃশব্দে পুরুষদের কাঁদা সম্ভব ও সমীচীন সেই রীতি সে সম্পূর্ণ রক্ষা করে। তবু দু-এক ফোঁটা জল চোখ থেকে ঠোঁটের কিনারে গড়ায়, এবং এই প্রক্রিয়া সমাপন করতে ফোঁটাগুলো পনর-বিশ সেকেণ্ডের

অধিক সময় নেয় না, তারাও নোনতা অতএব বিখ্যাত সেই বাঙালী লেখক কথিত সমুদ্রের স্বাদ ঘরেই এনে দেয় তারা, দেয় লোকটিকে, বাকিটুকু, মানে সমুদ্রকে শুধু চেখে দেখার নয়, চোখের নেশাও মেটাতে সে পানশালায় যায়, যেখানে ফরমাসমতো পরিপূর্ণ গ্লাসগুলি নিজেরা স্থির কিন্তু তারা এক-দণ্ড গতে বুকের মধ্যেই আস্ত একটা সমুদ্রের উত্তাল তোলপাড় এনে দেয়। এ-সব অবশ্য কিছুকালই চলেছিল, যখন লোকটি পানীয়ের বিল মিটিয়ে রুমালে প্রথমে ভিজে চোখ, পরে ফেনা লেগে-থাকা ঠোঁটের কোণ মুছে নিরুদ্দিষ্ট লতাকে উদ্দেশ করে তার জানা কয়েকটি ভাষায় বকতে শুরু করে। বস্তুত এই সময় কিছু জানা ইংরাজী আর কয়েকটি মাত্র শব্দজ্ঞানসর্বস্ব তার স্টকের ফরাসীও বেশ কাজে আসে। আসলে মুহূর্তগুলো যখন ধুঁকছে, তখন রুখে উঠতে বাছাই করা বিদেশী ভাষা বেশ সহযোগিতা করে, ওরা খুব উপকারী, অপিচ প্রত্যুৎপন্ন, সে বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছে।

তবে মন যখন নরম, তখন লতাকে খুব কুৎসিত গালাগালি সে কখনও দেয়নি, দেওয়া অসম্ভব, নিপাট ভদ্রলোক কিনা, তাই দু-হাতের পাতায় মাথা ডুবিয়ে সে পলাতকা পত্নীকে বলে গেছে, "আমাদের প্রথম বাচ্চা ভালো-বাসাকেই যখন মেরে ফেলতে (রাক্ষসীরা যেভাবে মারে) তোমার বাঁধল না, তখন এই ছেলেমেয়ে দুটোকে আমার কাঁধে কেন চাপিয়ে গেছো। কেন, কেন। তুমি কি মেনকা না উর্বশী, ওরা নাকি সদ্যোজাত শিশুদের এইভাবে স্খলিত-সাধনা মুনিদের কোলে ফেলে রেখে উধাও হয়ে যেত।" খুব আদরে আর অভিমানে, যেন কুরুশকাঁটা বুনে বুনে লোকটি লতাকে এই সব বলত।

কিন্তু সেদিন? ওই হাসপাতালে? যেখানে সময় যায়, কিন্তু ফেরে না, জানালার বাইরে শিরীষ গাছটা পড়ন্ত বেলায় অনবরত অশ্রান্ত নকশা তৈরি করে, করতে তার চাই কয়েকটা শুকনো শুকনো ন্যাড়া ডালপালা, মরা রোদ্দুর খানিকটা, আর খানিকটা ছায়া, অকালে বিকাল ডেকে আনতে আর কিছু লাগে না, ওই উপাদানে যেমনটি চাই ঠিক তেমন একটি ম্রিয়মাণ পরি-বেশ দিব্য রচিত হয়, তার সঙ্গে একটুখানি উগ্র ঝিম্‌-ধরানো গন্ধ, প্রত্যেক হাসপাতালেরই যা কি-না নিজস্ব সম্পদ, মিশিয়ে দিতে পারলে তো সোনায় সোহাগা, আরও চমৎকার। সেখানে কোনও এক রোগিণী নেমে আসা সন্ধ্যাকে ঠেকাতে ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির আলো জ্বালায়, লতা সেদিন যা জেবলেছিল, সত্যিই কি জেবলেছিল? লতা বলেছিল, সত্যিই কি সত্যিই কি বলেছিল, অথবা এ সবই তার বানানো, মরমী মনের আঙুলের টানে টানে সযত্নে বোনা, যে অভ্যাস তার বেশ কয়েক বছরের, অর্থাৎ কু-সংসর্গে পড়ে যখন সে ড্রাগে রপ্ত হয়, তখন থেকেই, তখন নিমেষে আড্ডায়, ঘরের বিছানায় স্বর্গ প্রণীত হয়ে যেত, প্রণেতা সে নিজেকে ভাবত ইন্দ্র, গায়ে যাত্রার দলের জমকালো জোব্বা না চাপালেও এ সব ক্রমাগত ঘটত, অনেক প্রয়াসে,

কঠিন প্রতিজ্ঞার সমারোহে প্রাণপণে তার পিঠের উপর লাগাম ধরে শুয়ে পড়ে ওই সব অলীক গোলাপী রঙ দেখা, যে গোলাপ শূন্যের উদ্যানে কোটি কোটি ফোটে, পাপড়ি ঝরায়, ঝরায়, আর তাদেরই ধরবে বলে নেশাগ্রস্ত আচ্ছন্ন মানুষ তাদের আজ্ঞা না মানা অবাধ্য হাত দুটো বাড়ায়, ছোটে ছোটে ছোটে, ছুটে যায় বিস্তর ক্ষেত পেরিয়ে, লঘু নির্ভার মেঘলোকে পেঁছে গিয়ে চারদিকে দেখে খালি রামধনু, কত ছটা কত রঙ, সাতটি রঙ না সত্তর কেউ জানে না, অদ্যাবধি গোনেনি, খালি আন্দাজে বলেছে নীল, লাল, সবুজ, কমলা, ইত্যাদি, সেই অফুরান রঙের ঘোর চোখে মেখে মেখে তার খানিকটা চুরি করে অকেজো করতে সাধ যায় বলেই অনেকে রামধনুগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে, আসলে ছোঁয়ামাত্র শিউরে উঠে সমস্ত রঙ সমেত রামধনুরা নিজেই আকাশের সায়রে ঝুপ করে ডুব দেয়।

সেই অভ্যাস গেছে, কিন্তু রেখে গেছে তার জের, যেমন লতা, একদিন সট্‌কে পড়ল কিন্তু রক্ত-মাংসে তৈরি ছোট্ট দুটি জের ফেলে যেতে তার একটুও বাঁধল না, ওই মাদকের অভ্যাসের অবশেষ এখনও এঁটোর মতো লেগে আছে লোকটির ব্যক্তিত্বে, সে কল্পনার মান্দাস ভাসায়, সাপের বিষে নীল লখিন্দরের মতো কোন্‌ মোহানায় কখন পেঁছে যায় অসাড় দেহ নিয়ে নিজেও টের পায় না। সেই হেতুই হাসপাতালে গিয়েছিল কিনা আজও তার সঠিক প্রত্যয় হল না। তবে গিয়েছিল যে, এই কথা ভাবতে তার ভালো লাগে, তুলির টানে টানে একটি পরিবেশ সে তৈরি করে যখনই সময় ফাঁকা, মগজ অবশ, তার কোষে কোষে অলক্ষ্য কোনও মাকড়সা জাল বোনে, শুধু পরিবেশ কেন, কথার পিঠে সে কথা সাজায়, তারপর লোকে যেভাবে প্রীতিভাজন কারও মুখে পান কি সন্দেশ তুলে দেয়, সেই মতো কোনও কোনও সংলাপ সে তুলে দেয় লতার মুখে, আর কোনওটাকে বা লোভীর মতো নিজেরই গলায় টুপ করে ফেলে দেয়।

"সবাই চলে গেছে।" লোকটি কি সেদিন হাসপাতালের বেড্‌টার ধার ঘেঁষে জম্পেশ বসে এই কথাই বলেছে লতাকে? বলেছে, না বলতে চেয়েছে? আর কিচ্ছু যে মনে পড়ে না। যদি বলে থাকে, তবে তো লতা নিশ্চয় একটা উত্তর দিয়েছে? কী, সেটা কী! খুব বেশি কথা খুব সম্ভব নয়, বেশি কথা বলা লতার পক্ষে সম্ভবই নয়; রুগ্ন শরীরে ওতে বৃথা খানিক পরিশ্রম হয়, পরিশ্রমে বড়ো হাঁপ ধরে, বড়ো শক্তি যায়। তাই সংলাপের ছেঁড়া সুতোটা টেনে লতা হয়তো বা শুধু বলে থাকবে, "সব্‌বাই", একটু টেনে টেনে, "সব" অর্থাৎ আগন্তুকদের সমুদয়ত্বের উপর ইচ্ছাকৃত জোর দিয়ে দিয়ে।

আর সে? সে কি বলল "এত তাড়াতাড়ি?" আর মলিন ঠোঁট একটু বেঁকিয়ে লতা এই কথাই বলল কি "তাড়াতাড়িই তো ভালো, তাই না, যেতেই যদি হয়।" এই কথার পিঠে সে তৎক্ষণাৎ বলতে পারত "তুমি যেমন গিয়ে-

ছিলে?” প্রশ্নবোধক বাক্যের ছদ্মবেশে ওটা আসলে একটা মন্তব্য, ওটা বলতে নেই, ওতে আঘাত করা হয়। রোগিণীকে আঘাত করতে নেই।

তবু মানুষ তো সে, কৌতূহল ছিলই, একটু,—এখনও একটুখানি। বলি বলি করেও যে-কথা সে বলতে পারছিল না, সেটা বুঝি লতা নিজেই বলে দিল? মনে পড়ে না। লতা হঠাৎ কতকটা খাপছাড়াভাবে, কপালের চুল সরিয়ে জানালার দিকে আড়চোখ রেখে “সমীরও এসেছিল আজ (দম নিয়ে), সঙ্গে লীলাও ছিল, আর ফুটফুটে বাচ্চাটা বোধহয় বছর তিনেকের হয়েছে”, এই খবরটাই শোনাল নাকি? (মনে পড়ে না), যদি শুনিয়ে থাকে, তবে লোকটা কীভাবে নিয়েছে সেই ঘোষণাকে? নির্লিপ্ত? নিস্পৃহ? অথবা, তার চোখের মণিতে কি সবুজ কোনও জোনাকি জ্বলে উঠল, যে-জোনাকিটাকে আমরা হিংসা নাম দিয়েছি, অথবা তার চোখের পাতায় পাতায় কাঁপছিল কোনও উল্লাস, তারায় তারায় হলুদ একটা অসুস্থ দীপ্তি, যাকে আমরা ‘প্রতিহিংসা’ এই ডাকনামে ডেকে থাকি? (মনে পড়ে না)। না, না, না ও-সব নিশ্চয়ই নয়, মানে উচিত নয়, আমরা হিংসে করব কেন, করলেই বা দেখাব কেন, ভদ্র সমাজে ও-সব নখের মতো দস্তানায় ঢাকা থাকে, আমরা মুখে শুধু সঙ্গত, আপ্যায়িত একটু স্মিত ভাব ফুটিয়ে রাখি। রাখতে যদি না হত তবে লোকটা নির্ঘাৎ গর্জে উঠত, দাঁতে দাঁত চাপা গলায় বলত, “ইতর, স্কাউনড্রেল, ওর একটু লজ্জা হল না?” কিন্তু—

ছিঃ ও-সব বলে না, কবর দাও কবর দাও রাগ নামে চণ্ডালটাকে, সেদিনই যদি দিতে পেরেছ, মুখ চেপে সব সহ্য করেছ, সমীর যখন টগবগে তাজা ঘোড়ার সওয়ার হয়ে সেদিনের তন্বী শ্যামা লতাকে প্রায় নুয়ে পড়ে দু’ হাতে সাপটে তুলে নিয়ে গেল। সেদিনই যখন রা কাড়োনি, তখন কি রাগ দেখাবে আজ, সব যখন স্তিমিত, অস্তমিত? ছি!

“ওদের বাচ্চা হয়েছে বুঝি?” বড় জোর সে এই ভদ্র উক্তিটা করতে পারত। উক্তি, তবে উৎসুক কিছু নয়, সাদামাটা প্রশ্নটা শোনাত কতকটা স্বগত সংলাপের মতো।

মনে পড়ে না, মনে পড়ে না, মনে পড়ে না, অথচ সেদিন সারাক্ষণ সে মনে মনে সমীরকে কত কী যে বলেছে তার ঠিক নেই। আগে বলত চোর, দস্যু, লুঠেরা, ঠগী, বদমাস ইত্যাদি, সেদিন তার সঙ্গে যোগ করল “গ্রাম্য ইতর কোথাকার”! অর্থাৎ লতাকে নিয়ে সরে পড়া যদি সমীরের পক্ষে হয়ে থাকে পাপ, তবে সেই লতাকে নতুন করে মা হতে না দেওয়াটা লোকটার পক্ষে আরও বড় একটা পাপ—স্বার্থপর স্বার্থপর! আর লতাকে ছেড়ে গিয়ে লীলাকে গ্রহণ করা—সে পাপের তুলনা নেই। এবং সবচেয়ে মহাপাপ হল লীলাকে তাড়িঘড়ি মাতৃত্বে পূর্ণ করে দেওয়া। লতাকে যা দেয়নি।

মনে মনে সে সমীরের কৃত পাপ ধাপে ধাপে সেদিন সাজালো কেন, মনের এ কী গূঢ় রহস্য, ক্রূর লীলা, সেটা আসলে যেন মন নয়, কোনও পানাপুকুর,

যার তলায় নানা মাপের হাজারো মাছের খেলা, যে-সমীরের সঙ্গে মুখোমুখি পাঞ্জা কষতে সাধ হয়নি তার, হয়তো বা সাহসও ছিল না, আজ আড়ালে সেই অনুপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে হাতে পেয়ে সে আশ মিটিয়ে ঝাল ঝেড়ে নিচ্ছে—এরই নাম কি পৌরুষ, হে ঈশ্বর, এরই নাম কি কাপুরুষতা? লতাকে সমীর কোনও শিশুর জননী হতে দেয়নি, এর জন্যে সে একদিকে যেমন আসামীর কাঠগড়ায় সমীরকে দাঁড় করিয়ে অদ্ভুত একটা আক্রোশ চরিতার্থ করছিল, অন্য-দিকে তেমনই কী অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখো, একটা অপূর্ব আনন্দে সে টইটম্বুর হয়ে যাচ্ছে। লতার পরবর্তী জীবনের শূন্যতাতেই লোকটির পরিপূর্ণতা। আবার তার মনে ফোঁটা ফোঁটা জমা কৃতজ্ঞতার সঞ্চয়ও ওইখানেই। শুধু একটা বিষয়ের ব্যাখ্যা এখনও নেই। সমীর ছেড়ে গেল বলেই কি লতাকে ক্রমে ক্রমে এই কালব্যাধি অধিকার করল, অথবা সমীর আগেই কোনও দিন বুঝি টের পেয়ে থাকবে লতার দুরারোগ্য এই রোগটার কথা, এই রোগের চোখে কালো কালো ছোপ, এই রোগের নিঃশ্বাসে নীল বিষ, আর তাই সে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে লীলার বাড়ানো দুটো হাতে, লীলার ছড়ানো কোলে আশ্রয় নিল কি-না, আজ এতদিন পরে সেই ইতিহাসটা কিছুতেই সঠিক লেখা সম্ভব না।

তার আনা ফুলগুলো লতার শিয়রে ইতিমধ্যেই কেমন ক্লান্ত, ক্লান্ত লতাও, ওর কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, সে কি নুয়ে পড়বে, সে কি পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে দেবে, কুলত্যাগিনী প্রাক্তন পত্নীর প্রতি কোন্ আচরণ সমুচিত স্থির না করতে পেরে লোকটা রুমাল বের করল বটে কিন্তু অবশেষে নিজেরই ঘাড় আর গলা মুছল। তার হাত কাঁপছিল।

এবার সে উঠবে, এখন উঠতে হয়, সময় তো কবেই গেছে, এখন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আঁকা সময়টাও পিছলে যাচ্ছে, তাই বিদায় নেওয়ার আগে, যদিও তার অন্তরে তখনও বিরাট একটা পাথরের চাপ, সুপ্রাচীন একটি অভিমান, যদিও, তবু লোকটা এইবার যেহেতু এটা শেষবার, তাই বুঝি মুহূর্তের জন্যে অন্তরঙ্গ সেইক্ষণে ফিরে যেতে মরিয়ার মতো চেষ্টা করল।

—"তোমার রাগ হয়নি লতা? সমীর যখন তোমার চোখের উপরেই লীলাকে নিয়ে লীলাকে নিয়ে" (বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে পারছি না, হে বিধাতা, আমার হয়ে তুমি যথাস্থানে একটা পূর্ণ যতি বসিয়ে দাও।)

—"লীলাকে নিয়ে কী?" (আমি কি ঠিক দেখছি, লতার করুণ কৃশ মুখটিতে কি একটু হাসি ফুটে উঠেছে?)

—"তুমি তো জানো আমি কী বলতে চাইছি। সব কথা কি খুলে বলা যায়? বলতে হয়?"

—"না", লতা বলল "না। হয় না। কিন্তু জানো, এখন আর আমার কোনও জ্বালা নেই। একজনকে দেওয়া কষ্ট আর একজনের হাত দিয়ে ফিরে আসে। সেটা হাত পেতে নিয়েছিও। ওইটেই বিধির বিচার। আমি মাথা

পেতে নিয়েছি।” (এইটুকু বলেই হাঁপাচ্ছে কেন লতা, বলো আরও বলো, আমাকে দেওয়া কষ্ট তোমার কাছে কী করে সুদে-আসলে ফিরে এলো, সেই কথা, আবার বলো।) “তাছাড়া জানো, আমার এই অসুখটা...ও যদি তখনও আমাকে জড়িয়ে থাকত, তাহলে অসুখটা ওকেও জড়াত যে! আমরা দুজনেই যেতাম! তার চেয়ে এই ভালো যে, অন্তত একজন বেঁচে গেল। সেই একজন পরে দুইও হল, দুইও হল তিন, ফুটফুটে ফুটফুটে কী সুন্দর বাচ্চাটা, ঠিক একরাশ ফুলের মতো, এই! তুমি যে ফুলগুলো আজ নিয়ে এসেছ, সেগুলো কোথায়, আমার শিয়রে? গন্ধ পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না। একবারটি এক গোছা আমার নাকের সামনে তুলে ধরো না, একটু ছুঁই, বুক ভরে যাতে একটু সুবাস পাই।”

—“কষ্ট তোমার কোনোদিন হয়নি লতা, একদিনও না?”

—“হত, মিছে বলব না, হত। প্রথম প্রথম। সবচেয়ে চমক খেলাম কবে? তোমাকে আজ বলি। একদিন ও, মানে সমীর, মুখটা ওদিকে ফেরাও, তোমার চোখে চেয়ে বলতে পারব না, এখনও আটকায়, একদিন যখন সমীর আমার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েই কী দেখে কে জানে হঠাৎ ছিটকে সরে গেল। হয়তো আমার বুক ঠেলে তখন এক ঝলক কাশি উঠেছিল, হয়তো আমার ঠোঁটের কোণে ছিল ভয়ংকর একটা রঙের শুকনো কোনও রেখা, সূর্য ওঠার ঠিক আগে আগে রোজ সকালে আকাশের ঠোঁটে যে-রঙ লেগে থাকে।”

লতা একটু দম নিল, ফুলগুলোকে আলতো আদর করল খানিকটা বুকে রেখে, বাচ্চাকে লোকে যেভাবে ঘুম পাড়ায়, ঠিক সেইভাবে, লতা একটু দম নিয়ে ফের বলতে থাকল “সেদিনই বোধ হয় সমীর প্রথম বুঝল। বুঝলাম আমি। বুঝলাম যে আমার অসুখটাকেই ও বড়ো করে দেখল, ঝুঁকে পড়ে যা চাইছিল, সেই সুখটাকে নয়। যা পেতে পারে তার চেহারাটা প্রকাণ্ড হয়ে উঠল, আর সেই ভয়েই যা পেতে পারত তার কিনারা থেকে পিছিয়ে গেল সমীর। আসলে সেই দিন থেকেই তো ছাড়াছাড়ি আমাদের। পরে লীলাকে নিয়ে, লীলাকে পেয়ে ও যা করেছে সেটা তো শুধু প্রত্যাশিত একটি পরি-পূরণ, তার মধ্যে চমক কোথায়?”

এর পর আর কথা ছিল না, এর পর আর কথা থাকতে পারে না। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল লোকটি, ক্ষীণ কোনোমতে শ্রুত গলায় বলল, “আজ যাই।”

কী বলেছিল লতা তখন? মনে পড়ে না, মনে পড়ে না, মনে পড়ে না। টলটলে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে সে কি নিঃশব্দ ইশারায় বিদায় দিল? অথবা লতা বুঝি বলেছিল, “হ্যাঁ, যাও। এসো বললাম না, যদিও সেইটেই বলা নিয়ম। কিন্তু তোমাকে তো আমি আর এসো বলতে পারি না! কোন্ মুখে বলব। তা ছাড়া, এটা বড়ো বিচ্ছিরি অসুখ। এই অসুখের কাছে বারবার আসতে নেই। যদি ছোঁয়াচ লাগে? বলা তো যায় না!”

আর কী আর কী আর কী?—মনে পড়ে না। এই পর্যন্ত লিখে লোকটি

কাচের জার কাত করে একটি গ্লাস ঠাণ্ডায় ভরে নিয়ে নিঃশেষে শুষে ফেলল, বাইরে হাওয়া উতরোল, তার ছোঁয়া কেমন সেটা জানতেই সে বুঝি তৎক্ষণাৎ ফটাস করে জানালার একটা পাল্লাও খুলে ফেলেছিল। ছোঁয়া-ছোঁয়া-ছোঁয়াচ; রাগ-অনুরাগ-বিদ্বেষ-কষ্ট-যন্ত্রণা। এই সব থেকে লতা এতদিন নিশ্চয় নিষ্কৃতি পেয়ে থাকবে। তার শরীর থেকে সব বেদনা রহিত হবার আগেই লতা তার মনটাকে ধুয়ে মুছে তৈরি করে রেখেছে। তৈরি? কার জন্যে তৈরি? আমরা কেউ জানি না, যার জন্যে শেষ প্রস্তুতি কখনও তার মুখ দেখি না, কারণ সেই শুভদৃষ্টির মুহূর্তে আমরা সকলেই অন্ধ, আমাদের চেতনাই বা কই, তবু তৈরি হই, কোনও এক অদৃশ্য নির্দেশে, এক আমোঘ আদেশে যার বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোনও আপীল নেই। জীবন নিজেই মরণের প্রতি সতত ধাবিত।

সেদিন চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবার ঠিক আগের ক্ষণটিতে লতাকে বলে আসি "আসব, আমি শীগগিরই আবার আসব", আর লতা তখন শুধু চোখ দিয়ে, ছোটরা যেভাবে শেলেটে লেখে সেইভাবে যেন অক্ষরের পিঠে অক্ষর লিখে লিখে বলে গেল "না, এসো না। কিন্তু বলছি কেন? তুমি যে আর কোনোদিন আসবে না, আমি যে তাও জানি।"

ওই একটি অব্যক্ত বাক্যে লতা হঠাৎ যেন তার আকারের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেল, সে আকার আকাশ-ছাওয়া আষাঢ়ের মতো। ঘন, গম্ভীর, পুঞ্জীভূত। লতার আর কোনও জ্বালা নেই, সেদিন সে বলেছিল। সুখ আর অসুখের সমন্বিত চৌকাঠে যে দাঁড়াতে পেরেছে, একমাত্র তারই মুখে ওই ভাষা ফোটে। "একজনকে দেওয়া কষ্ট আর একজনের হাত দিয়ে ফিরে পেলাম, আমার আর চাই কী" আর কী আর কী, লতা আর কী যেন বলেছিল? সত্যিই তো লতার আর কিছুতে দরকার নেই। ওকে পরিত্যাগ করে সমীর বৃহত্তর ব্যগ্র করুণার বাহুর ঘেরে ফিরে এসেছে, আমি কি নতুন করে সেই কারণে সমীরকে হিংসা করছি? না না, তা যেন না হয়, অত ছোট আমি হব না। এই তো কিছুদিন আগেও প্রত্যাখ্যানের ঘায়ে আমি পাগল ছিলাম, আক্রোশে ফুঁসেছি, লতা আর সমীরের দিকে লেলিয়ে দিয়েছি বুকের মধ্যে পুষে রাখা দলে দলে শিকারী কুকুর, কই সেগুলোর ডাক তো আর শুনতে পাচ্ছি না। কুকুরের ঘরগুলো এবার বন্ধ করে দেব, খাঁচা ভেঙে বাজপাখিগুলোকে উড়িয়ে দেব, রাগ নেই, রাগ নেই, আমারও জ্বালা আর ঘৃণা যেন হঠাৎ বিবর্তিত হয়ে গেল করুণায়। একটু কৃতজ্ঞতাও অনুভব করছি যেন। আমাকে ছেড়ে যাওয়ার যে-পাপ তার দাম লতা কি দিল না তার জীবনের পরবর্তী পর্বের নিঃসন্তানতায়? অবশেষে দারুণ একটি রোগ-ভোগ? একদিন সমীর যদি ছিল তার স্বেচ্ছা-নির্বাচিত, তবে লতার পক্ষে তার সন্তানের জননী হতে অনিচ্ছাটাও নির্বাচিত, স্বয়ংকৃত।

আশ্চর্য, এতদিন বাদে অনেক ঘটনাকে লোকটি যাচাই করতে পারছে স্থির আলোকে, নতুন করে অনেক মূল্য আপনা থেকেই নিরূপিত হয়ে যাচ্ছে। এ

এক অপরূপ আলো, যেখানে প্রতারণাকেও সম্মাননা বলে প্রত্যয় হয়, যেখানে পূর্ব পরিচিতি, সম্পর্কসমূহ দেখা দেয় নতুন আকারে। যেমন সমীর আর সে। সমীর কি তার 'প্রতিদ্বন্দ্বী'? দূর, তা কেন হবে! তাদের দুজনেরই আর এক পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী গোকুলে বাড়ছিল, কালান্তক এক ব্যাধি। অবশেষে সে নয়, সমীরও নয়, ওই ব্যাধিই লতাকে অধিকার করে নিল। এই মুহূর্তে সমীরকে সহযোদ্ধার মতো লাগছে, দুজনে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, দুজনেরই যুদ্ধ ওই ব্যাধির বিরুদ্ধে।

"আমি যাব, আবার লতাকে দেখতে যাব"—লোকটি এই প্রতিজ্ঞাটি স্বগত উচ্চারণ করল, কিন্তু করেই এ কী! সর্বাঙ্গে সে শিউরে উঠছে কেন, কেন তার কানে "এখানে বেশি এসো না, রোগটা ভারী ছোঁয়াচে" বারবার ভেসে আসছিল লতার এই কথা কয়টি, কথা তো নয় যেন ফুল্ল কুসুমিত কয়েকটি ধ্বনি। কার? লতার। কে লতা? যে আজ সব জ্বালা, সব বিদ্বেষের উপরে বিজয়িনী। দু হাতের পাতায় চোখ ডুবিয়ে দিয়েছে লোকটি, তবু দেখতে পাচ্ছে পাণ্ডুরশ্রী একটি পবিত্রতা, ক্ষমার কোনও প্রতিমা। "যাব, আমি তোমার কাছে আবার যাব" বিড়বিড় ঠোঁট নেড়ে নেড়ে নিজের কাছে নিজেই এই স্বগত-সংকল্প উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরই ভিতরে কী ভীষণ বিদ্যুতের ঝিলিক। তার ভিতরে এতদিন যে-প্রেতগুলো সতত নৃত্যপর ছিল, তারা কোথায় গেল, খুঁজছে লোকটা খুঁজছে, সেই সঙ্গে এও টের পেয়ে গেছে সেদিন ঠিকই বলেছিল লতা। রোগটা সত্যিই খুব ছোঁয়াচে। সেদিন হাসপাতাল থেকে তারই জীবাণু বহন করে এনেছে সে—রাগ নেই, রোগ আছে, সেই সংক্রামক ব্যাধিটার নাম বিস্মৃতি, সেই ব্যাধিটার নাম ক্ষমা। নইলে সে আবার লতাকে, যে কিনা তাকে একদিন ছেড়ে গিয়েছিল, তার কাছে ফের যাওয়ার কথা ভাবে কী-ভাবে। সেই যাওয়ার ইচ্ছেটারই নাম ছোঁয়াচ।

দ্যাখো দ্যাখো অবিশ্বাস্য এক অসুখের সুখে লোকটা এখন আকুল কাঁপছে।

পাখি মরে গেলে

'বাবা !'

নিখিলেশের তখনও ঘুম ভাঙেনি, কিংবা ভেঙেছে, খালি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার প্রতিজ্ঞাটা সে সংগ্রহ করতে পারেনি। কাল শেষ রাত্তিরে বেজায় ঝড় উঠেছিল আর তার সঙ্গে অঝোরে বৃষ্টি। আকাশটার এই ব্যবহার নিখিলেশের বরাবরই অদ্ভুত লাগে। হাতড়ে হাতড়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। ধরিয়ে ওড়ানো ধোঁয়া আর দার্শনিক ধোঁয়া, এই দুটো মিলিয়ে কতকটা মগ্ন হয়ে গেল।

সুমিতা চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকল তখনই। নিখিলেশের ইচ্ছে হল, সুমিতাকে তার ভাবনার ভাগ দেয়। বুঝিয়ে দেয় যে সে কতখানি জ্ঞানী। বলল, জানো, একটাই তো আকাশ, কিন্তু একই সঙ্গে কী-রকম রাগে আছড়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় একেবারে ভিজিয়ে দেয়, ভাসিয়ে নেয়—সে একটা ভেলকি।

জানি তুমি এরপর কী বলবে, সুমিতা বলল, তুমি বলবে যে ঠিক মেয়েদের স্বভাবের মতো, তাই না ? রাগ আর কান্না পাশাপাশি মেশামেশি।

হাত বাড়িয়ে নিখিলেশ খপ করে সুমিতার আঁচলটা টেনে ধরল, তুমি এত বোঝো ? আমি ঝড়বৃষ্টির ব্যাপারে কী বলব, তুমি আগে থেকেই বুঝে ফেলেছিলে, তাই না ?

আঁচলটা ছাড়িয়ে সুমিতা বলল, ছাড়ো। আমার শাড়ির পাড়ের চেয়ে চায়ের কাপের হাতলটা তোমার পক্ষে এখন অনেক বেশি দরকার, নইলে বাথরুমে যেতে পারবে না। শুয়ে শুয়ে খালি হাই তুলবে আর আড়মোড়া ভাঙবে।

আজ ভোর থেকেই ভিজে হাওয়া দিচ্ছে যে! শেষ রাত্তিরে যে আকাশটা একই সঙ্গে ঝড়ে রেগে আর কান্নায় আলুথালু হয়ে গিয়েছিল, এখন সে কী-রকম সুর করে 'বাইরে যাসনে যাসনে' বলছে, তুমি শুনতে পাচ্ছ না ?

—আমার অত কবিত্ব-টবিত্ব নেই বাপু।

—সুমিতা, তোমার কান নেই।

—আমার যদি কান না থাকে, তোমার চোখ নেই। মেয়েটা তখন থেকে শিয়রে দাঁড়িয়ে 'বাবা' 'বাবা' বলে ডাকছে, তুমিই কি শুনেছ ? বল না খুকু, বাবাকে কী বলতে এসেছিলি বল।

খুকুর মুখ ততক্ষণ অভিমানে ফুলে উঠেছে। নিখিলেশ ওকে কাছে ডেকে ফাঁপানো কিন্তু ছোট-করে-ছাঁটা চুলসুদ্ধ মাথাটা বুকের উপর টেনে নিয়ে এল।

—তোরা তো তেল মাখিস না, তবু এই গন্ধটা কোত্থেকে আনিস রে? কোথা থেকে পাস?

সুমিতা মুখ টিপে হাসছিল।—তুমি বলতে না, এসব গন্ধ মেয়েদের ভেতর থেকেই জন্মায়! জলজ উদ্ভিদের মতো।

খুকুর এখনও সে বয়স হয়নি। নিখিলেশ গম্ভীর মুখে বলল। ততক্ষণ খুকুর মুখে রোদ ফুটেছে। কিংবা ওই রোদটুকু যার অন্য নাম হাসি, কিন্তু যে নাম, যে অর্থ কোনও চলন্তিকায় দেওয়া নেই। খুকুর মুখে একটুখানি মেঘও লেগে ছিল। একটু ছোঁয়া পেলেই যে মেঘ ছলো ছলো হতে পারে।

নিখিলেশ তখনও জনান্তিকে বলছে, জনান্তিকে কারণ সুমিতা মেয়েকে বাপের কাছে গছিয়ে দিয়েই ঢুকে গেছে কলঘরে, তাই জনান্তিকে। নিখিলেশ ইতিমধ্যে সকালের তৃতীয় পক্ষের সিগারেটটাকে লালার স্পর্শ দিতে দিতে (কী আশ্চর্য, আমরা আদরে যার ঠোঁটে ঠোঁট দিই, তাকেই আসলে পোড়াই, ছাই করে ছাড়ি?) নিখিলেশ উদাস, স্বগত নিখিলেশ বলছে, কে জানে গন্ধটা খুব দূরের বলেই ভালো লাগে কি-না! দূরের? কই না তো। খুকু তো আমার পাশেই। আমার বুকের ওপর ওর মাথা। আমার নাকে ওর চুলের ঘ্রাণ। তবে? তবু? আমি এই গন্ধটাকে দূরের বললাম কেন? কে জানে কেন। হয়তো খুকুটা বাচ্চা কিনা, ও শৈশবকেই সুদূর ভেবেছে। যে শৈশব আমার নেই। খরচ করে ফেলেছি। খরচ করে ফেলি তো এমন কত কিছুই। কিন্তু সেসব ফের রোজগার করি। অথচ হায়রে, এই ব্যয়বহুল অব্যয়, হায়রে, অথচ কী হুলস্থুল শূলের মতো সত্য। খরচ হয়ে যাওয়া শৈশব আর অর্জন করা যায় না। তাই দূর থেকে আসা রিমঝিম আবেশটুকুই বেশ লাগে।

পাঁচটা আঙুলকে চিরুনি করে নিখিলেশ খুকুর চুলগুলো চষে দিচ্ছিল। আস্তে আস্তে বলল, আজ এত সকালে উঠেছিলে যে, মামণি?

—বারে, আমার তো আজ শেষ রাত্তিরেই ঘুম ভেঙে গেছে। যেই ক্লকটায় —তুমি যাকে ঠাকুরদা ঘড়ি বলো—ঢং ঢং চারটে বাজল, তখনই। কী বৃষ্টি, বাবা কী বৃষ্টি! আর ঝড়।

বলতে বলতে ভারী হয়ে এল খুকুর গলা।—জানো বাবা, সকাল হতে না হতে আমি বারান্দায় ছুটে গিয়েছিলাম। খাঁচাটা ছিঁড়ে একেবারে তুবড়ে গেছে। আর, বাবা, একটা শিক গেঁথে গেছে ময়নাটার গলায়। পাখিটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে বাবা। পাখিটা মরে গেছে। তুমি ওকে একবার দেখতে যাবে না?

হাই তুলল নিখিলেশ।—গিয়ে আর কী করব? বাঁচাতে তো আর পারব না। জমাদার এলে বরং বলে দেব, ওটাকে সরিয়ে নিতে। তোর মা'র উচিত ছিল, ঝড় উঠতেই খাঁচাটাকে ভেতরে নিয়ে আসা।

এতক্ষণ তবু চেপে চেপে কোনওরকমে কথা বলছিল খুকু। এবার সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে খোলাখুলি কাঁদতেই শুরু করে দিল।

—মা না-হয় তার কাজ করেনি, আমিও আমার কাজ করিনি বাবা! কিন্তু তুমি তোমার কাজ করবে না?

—বললাম তো, জমাদার এলে—

—সে তো ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। কাক-চিল ঠুকরে ঠুকরে খাবে। বাবা, আমার ময়নাসোনাকে তুমি শ্মশানে নিয়ে যাবে না? খই ছড়াতে ছড়াতে পয়সা ছিটোতে ছিটোতে, ফুলে ঢেকে দিয়ে—সবাইকে যেরকম নিয়ে যায়?

—দূর, পাগলী! একটা তো পাখি—

কিন্তু নিখিলেশ কথাটাকে সম্পূর্ণ করতে পারল না। খুকু তার আগেই বলে উঠল, হোক পাখি, ও যে বলত খু—কু খু—কু। তুমি তো শুনেছ, শোনোনি?

কিছুটা রাগে, কিছুটা শোকে, কিছুটা বা হতাশায় বাবার বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল খুকু। যেন বিড়াল হলে আঁচড়াত, শকুন-টকুন কিছু হলে ঠোকরাত, বাঘ হলে বসিয়ে দিত নখ, এমন-কী সাপ হলে খুকু বুঝি বাবার বুকে একটা হিমসিম ছোবলও মারত। এক লহমায় একটা বাচ্চা মেয়ে একই সঙ্গে বাঘ আর বাঘের মাসি, সাপ আর শকুন, সব হয়ে গেল।

॥ দুই ॥

খুকু জিগ্যেস করেছিল, আমি শুনেছি কিনা। শুনিনি, আমি শুনিনি। আমার কানে তুলো, আমার চোখেও রাশ রাশ পেঁজা তুলোর আঁশ।

আমি শ্রীনিখিলেশ চক্রবর্তী (চক্রবর্তী না শাকরাভারটি? তাহলে ফরাসি নামে আমার পদবীটা খুব উচ্চমূল্য হয়ে যায়) এখন অফিসের যাত্রী। দুনিয়াটার ব্যাভারস্যাভার কী মজার, তাই না? এই বৃষ্টি, এই ঝড়, আর এই সুবোধ বালক রোদ। অথবা কিশোরও বলা চলে। চনমনে। যদি কিশোরী বলি? তবে বিশেষণটা হবে ছলবলে।

পাখি মরে গেছে বলে মরে কেঁদে কেঁদে—কে লিখেছিল না? ধেততেরি ছাই, কলকাতার রাস্তায় ট্র্যাফিকের ভিতরে গাড়ি চালানো মানে যেন ছুঁচের ছ্যাঁদা দিয়ে সুতোর মতো গলে যাওয়া। গলতে গলতে কোনও পদ্য, কোনও শোক, কোনও ঝড়বৃষ্টি কিচ্ছু খেয়াল রাখা যায় না। তখন অর্জুন কী দেখছ? উত্তর, শুধু পাখিটার চোখ।

দুসশালা! আবার সেই পাখি। খুকুটা এত আপসেট হল কেন, ভেবে পাচ্ছি না। চটাস করে কত রাত্তিরে সে-ও তো মশা মারে। তখন কি এতটা টলোমলো নৌকোর মতো আকুল হয়? কই, টালমাটাল হওয়া দূরে থাক, ছলাৎটুকুও তো শুনিনি কখনও!

কিংবা। কত নাকি জীবাণু প্রতি পলে আমরা শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসে সংহার করি। একেবারে জেনোসাইড যাকে বলে। সেই গণহত্যার জন্যে কিছুমাত্র পাপবোধ, সেইসব গতদের জন্যে কিছুমাত্র শোচনা তো আমাদের নেই। থাকে না। তার মানে কি তবে এই যে, কোনও কোনও প্রাণের দাম আর ওজন একটু

কম বা একটু বেশি? সব প্রাণী তাহলে সমান নয়। বিধাতা সৃষ্টিতে অন্তত সব প্রাণকে করেননি তুল্যমূল্য, সেখানে সাম্য আনেননি।

আমাকে লিফটটা বিশ্বস্ত উপরে নিয়ে এল। এবার আমি, নিখিলেশ চক্রবর্তী পা ছড়িয়ে বসতে পারি। রিভলভিং কুর্শিটায় খুশি হলে ঘুরে নিতে পারি সাত পাক, বা সাত চক্কর। ক্ষতি কী? সাত কেন সাতাত্তর পাক খেলেও আমার তো আর বিয়ে হবে না। সেই রুচি বা অভিরুচি নেই।

এখন এইখানে আমার ভাবনাই আমার সঙ্গিনী। নিঃসঙ্গ কামরা বলে এই সঙ্গ আরও অবাধ, আরও মধুর। আচ্ছা, 'গীতা' না কোন্ বইতে লিখেছে না—ন জায়তে, ম্রিয়তে বা কদাচিৎ? শুনেছিলাম এর মানে হল এই যে, আত্মা জন্মায়ও না, মরেও না।

মরার কথাটা আপাতত যেখানে আমার কোটটা টাঙিয়ে রেখেছি, সেই হুকটায় না হয় ঝুলিয়ে রাখি। কিন্তু আত্মা আর জন্মায়ও না? সত্যি? মাইরি? যদি না-ই জন্মাবে, তবে সেই গীতার টাইম থেকে এ যাবৎ স্রেফ এই ভারতবর্ষেই মনুষ্য-পরিবার যে বাড়তে বাড়তে চার পাঁচগুণ হল, এতসব বাড়তি আত্মা এল কোথা থেকে? অন্যান্য মুলুক আর অন্যান্য প্রাণী-কুলের কথা না-হয় নাই-ই ধরলাম। তবে কথাটা দাঁড়াল এই যে, বিধাতার আত্মার ভাঁড়ার দ্রৌপদীর মতো। কখনও বাড়ন্ত নয়, বরং বাড়-বাড়ন্ত। কিংবা ভগবান এই দেশের ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর আওতায় পড়েননি তো, তাই আত্মা প্রসবের ব্যাপারে লাল ত্রিকোণের ধার ধারেননি।

সুপুরির মতো শক্ত শক্ত ব্যাপার এই যে আমার বুদ্ধি-বিচারের জাঁতি দিয়ে কাটছি, এর একটু দাম নেব না? পরিশ্রমের কিছুটা মজুরি তো চাই। খালি একটা বাতানুকূল কামরা আর অধস্তনদের সেলাম সেই মজুরি পুরো-পুরি জোগাতে পারে না।

এবার তাহলে ওই হুকটা থেকে কোটটাকে বাঁচিয়ে শোক দুঃখ-টুখ্খ পেড়ে আনি। বিচার করে করে এই পর্যন্ত জেনেছি, এক—সব প্রাণই প্রাণ, তবু সব প্রাণী সমান নয়। দুই—নিতুই নব আত্মা নিশ্চিতই জন্মায়।

এই বোধিতে উপনীত হয়েও আমি বুদ্ধ হতে পারছি না কেন? মনে মনে খুকুকে খানিক আগে ঠাট্টা করলাম। একটা তো ঝড়ে মরা পাখি। তার জন্যে এত? কিন্তু এই মুহূর্তে আমার দিদির বিয়ের আগে নেমন্তন্নের জন্যে কেনা পাঁঠাটার কথা মনে পড়ল কেন? তাকে দশ মাইল দূরের একটা হাট থেকে কিনে আনা হয়। আমি তখন বালক। পাঁঠাটাকে সারা রাস্তা হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে আসে। সে জানত না, কিন্তু সবাই জানত তার পরমায়ু মোটে আর একটি দিন। অজশিশুটিকে যত পারি তত কাঁচা পাতা জোগাড় করে ঠেসে খাওয়াই, তার কালো কুচকুচে লোমে হাত বুলোই। এ কি মায়া? এ কি আদর? অথবা এ সবই ভালোবাসার নামে ভণ্ডামি—পরে সারা জীবন যা অনেকবার করেছি।

সেই পাঁঠাটাকে যখন কাটা হয়, তখন সামনে দাঁড়াইনি, মাত্র ওইটুকুই

আমার সততা। নেমন্তন্নর দিনে মাংস মুখে তুলতে পারিনি। কিন্তু, কিন্তু এবং কিন্তু। পরদিন সকালে বিশ্রী রকমের খিদে পেল কেন?

আমি বাসি মাংস ঝোল সমেত চুষে চুষে খেয়েছিলাম। লুচিগুলোও বাসি ছিল, কোনও কেডস জুতোর ফরসা শুকতলার মতো।

॥ তিন ॥

সেই বালকটি যদি আজ প্রত্যবায় ভোগী না হয়, যদি সে গাড়িঘোড়া চড়ে, গলায় পরে বাহারী কাভাত বা আপনারা যাকে বলেন, টাই, তা-ই, যদি সে শীত আর আতপ উভয়ের থেকেই কোনও দূরবর্তী স্থান, কামরা কাল আর বয়েসে পৌঁছে গিয়ে থাকতে পারে, তবে বাচ্চা একটা মেয়ের আর দোষ কী? সেও ভুলবে। ভুলবে যে সদা-মরা একটা পাখি "খু—কু" বলে ডাকত। আমার উপরে এইখানে তার জিত, যে পাঁঠাটাকে এত সযত্নে কচি ঘাস আর পাতা খাওয়ালাম, সে কিন্তু আমাকে একবারও নাম ধরে ডাকেনি। অসহায় ব্যা-ব্যা উচ্চারণ? নো বিলিগোট, আই হ্যাভ নো উল।

আমার পশম নেই, রেশম নেই। তোমার ডাকে আমি সাড়া দেব কী করে? খুব মৃদু গন্ধ কারও কারও ছড়ানো চুলে দূরকে কাছে টেনে আনে। কিন্তু অনেক দিন আগেকার, অনেক দূরের ডাক এখন আর এই বুকে কোনও কিছু থিরিথিরি কাঁপায় না। আসলে থিরিথিরি তো কাঁপে পাতা। বটের, শিরীষের, অশ্বত্থের।

আমার বুকে আজ আর কোনও পাতা নেই।

॥ চার ॥

ঝনঝন করে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ইনটারকম? পি-বি-এক্স? না-কি ডাইরেকট লাইনটা? ও এই মুহূর্তে বাচাল হয়ে উঠল কেন? মূর্খরা ততক্ষণই শোভা পায়, যতক্ষণ তারা চুপ করে থাকে। টেলিফোনের বিষয়েও সেই কথা। ও কেন চেঁচিয়ে উঠল, কেন ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে দিল আমার এই মসৃণ টেরিলিন একাকী চিন্তাকে। তুলব না, আমি তুলব না। বাজুক, টেলিফোনটা বেজে যাক। ওর নাম যদিও প্রিয়দর্শিনী, ও তো আর প্রিয়শ্রবণী নয়।

যদি তুলি, যদি কান পাতি, কী শুনব? হ্যালো, হ্যালো, এই তো? ইজ দ্যাট মিস্টার চকরাভারটি? কান পচে গেছে। মিস্টার?—মিস্টার কেন? আমি তো যে নামচে বাজার ছাড়িয়ে সবে সাউথ কল অবধি উঠেছি, এভারেস্ট অনেক দূর, এতদিন স্যার-ট্যার না হলেও কম-সে-কম পদ্মর দ্বারা শ্রীমণ্ডিত, এমন কি ভূষিত বা বিভূষিত হলেও বিচিত্র কিছু ছিল না। ওসব পাট উঠে গেছে,

বালাই গেছে। ফের বলি, কান পচে গেছে। আমি আজ বট বা অশ্বত্থ না হই, নিজেকে সেগুন বললে ঠেকায় কে? অন্তত কুলোর মতো কানের গুণটুকু আমার আছে।

সব শুনতে পাই, যেমন এই মুহূর্তে শুনতে পেলাম। ইয়েস, স্যার, ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, টেলিফোনটা আমি তুলেছিলাম।

কী শুনলাম, কী বলল টেলিফোন?

সীতামাসি মারা গেছে। আবার ভুল হল। গেছেন বলা উচিত ছিল। একটা দন্ত্য-ন খরচ করতে কেন যে আমি কখনও কখনও কঞ্জুস? হতে পারে, ওই খরচাটাই বিহ্বল করে দিল আমাকে, 'ন'টাকে কেড়ে নিল।

লেডিজ অ্যান্ড জেনটেলমেন! পাঠিকা এবং পাঠকবৃন্দ, আপনারা ভাবছেন আমি সত্যিই খবরটা শুনে মুষড়ে গেলাম? দূর দূর, ওটা ভন্ড আমার আরও একটা ভণ্ডামি। একটা অকালে ঝড়ে মরা পাখির ব্যাপারে সকালে তার বাচ্চা মেয়ের (পাখিটা খুকুকে খু—কু বলে ডাকত, শোনাত কতকটা কোকিলের কুক-কুর মতো।) কান্না শুনে যে বিচলিত হয়নি, ইলেকট্রিক শেভারে আমূল দাড়ি কামিয়েছে, সেরেছে স্নান এবং আর যা যা কিছু যথাবিহিত প্রাতঃকৃত্য, সেই আমূল তরুটি পরে পরিজ-এ পেট ভরে (প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে) নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছে এতদূর, এই মহানগরীর বজ্রবৎ রাজপথে। আগেই তো বলেছি সুত্রস্য এব আমার গতি, ঠান্ডা ঘরে বসে কোনও কাঞ্চনপ্রভ জঙ্ঘার উত্তাপ আর পরিবেশ মৌজ করে গায়ে মাখছি, তার জন্যে এই ফোনটা কেন?

মৃত্যু? মৃত্যুকে সে ভয় পায় না। সে মানে, এখানে আমি নিখিলেশ, পাই না। আগে যখন কোনও মরণের খবর পেতাম তখন প্রতিটি শবকে বিবিক্তভাবে দেখতাম। তখনও বয়েস তো কম। মৃত্যুর কল্লোল কানে পৌঁছয়নি। মৃতদেহে নির্বিকার সসম্মান মালা দিতাম, তবে সেই সঙ্গে এইটুকু ধারণা মনে লেপালেপি হয়ে থাকত এই মৃত্যু আমার নয়। সময় আসেনি, বয়েস হয়নি, এই পৃথিবী এখনও আমার। আরও অনেকদিন ধরে আমারই থাকবে। আমার অধিকারে।

সুতরাং তখন শোকের একটা মানে ছিল অহংকার, যৌবনের অহংকার, আর একটা মানে করুণা।

এসো এসো ঝিল্লি এসো। তুমি যে ট্যাপ না করেই আজ ঘরে ঢুকলে এই জন্যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দরকার ছিল আজ এক্ষুনি এই মুহূর্তে যে-কোনও একজনের আসার দরকার ছিল।

(ঝিল্লি তার বটুয়া খুলে মুখটাকে যথাসম্ভব মেরামত করে নিল। বলল তোমাকে বড্ড যে রান-ডাউন দেখাচ্ছে?)

—রানআউন? হেসে উঠল নিখিলেশ। বরং রান ওভার বলতে পার। জানো, এইমাত্র ঝনঝন করে টেলিফোনটা জানিয়ে দিল, সীতামাসি আর নেই।

পাউডারের শেষ বোলানো বুলোতে বুলোতে ঝিল্লি বলল, শি মাস্ট হ্যাড মেনট এ লট টু ইউ।

শুনে হো-হো করে হেসে উঠল নিখিলেশ। সেই হাসির তরঙ্গের তোড়ে তার বাতানুকূল কামরার ছাদটাও উড়ে যেতে পারত।

সে বললে, অব কোরস শি ডিড। কিন্তু সেটাই একমাত্র কথা নয়। তোমার বয়েস এখনও কম ঝিল্লি, এখনও মৃত্যুকে নিরাসক্ত বিষাক্ত পরকীয়া ভাবে দেখতে পারো। কারণ আকস্মিক দুর্ঘটনা কিছু না ঘটলে এই জগৎ এখনও তোমার। আরও অনেকদিন তোমার। কিন্তু আমি পারি না যে! যে-কোনও শবের সম্মুখীন হলে মনে হয় পরের পালা হয়তো বা আমার। এতদিন আর এখনও যে বেঁচে আছি, এই তো বিস্ময়, এই তো কারও কৃপা, কোনও করুণাময়ের হাতের ভিক্ষা। ইজারা ফুরোলেও যিনি তৎক্ষণাৎ উৎখাত করেন না, তাঁর উদারতা। মৃত্যু সম্পর্কে আমার দেখার ধারা ক্রমে ক্রমে বদলাচ্ছে ঝিল্লি। সেই বদলানোর খুব সামান্যই তোমাকে বলতে পারলাম।

॥ পাঁচ ॥

এর পরেও ঝিল্লি ওই ঘরে আরও বেশ খানিকক্ষণ ছিল। হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়াচ্ছিল তার মৃদু মিষ্টি সৌরভ, তার কিছুটা কেনা আর আনা, কিছুটা বা দেহজ।

ঝিল্লি বলল, সীতামাসির কথা তোমার মুখে অনেক বার শুনেছি। তাঁর চলে যাওয়ায় তুমি একেবারে ভেঙে পড়েছ। তাই না, নিখিলেশ?

উত্তরে নিখিলেশ একটানে খুলে ফেলে দিল তার গলাবন্ধ। তার চোখের মণি পুকুরে মরা মাছের মতো ভাসছিল। অস্বাভাবিক অলৌকিক হাসছিল সে।

নিখিলেশ বলছিল, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আবার সবটা ঠিক বলোনি। সীতামাসিকে আমি ভালোবাসতাম ঠিক। তিনিও—তাঁর ছেলেপুলে হয়নি তো—আমাকে পাগলের মতো স্নেহ করতেন। কিন্তু বয়েস হয়ে গেলে আর মা-মাসির তেমন অনিবার্য প্রয়োজন থাকে না তো। আমি বয়স্ক, সীতামাসিও ক্রমে ক্রমে আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিংবা আমিই দূরে চলে এসেছিলাম তাঁর কাছ থেকে।

তবু তো তুমি আঘাত পেয়েছ! ঝিল্লি বলল।

বোকা মেয়ে, বোকা মেয়ে—চিৎকার করে উঠল নিখিলেশ, একটা কারণ তো তোমাকে আগেই বলেছি। যে-কোনও মৃত্যুতে ইদানীং আমি আমাকেই দেখি। সূর্যের দিকে উঁচিয়ে ধরা চিতায়-শোওয়া যে-কোনও মরা মুখই আমার আয়না। আমার ভয় হয়। আমার কান্না পায়। আবার ঈর্ষাও আমাকে কাতর করে। কে

যে কোথায় যায় আমরা জানি না। কিন্তু গেল বলেই শোকে কাতর? তা হই না। আর না। এই বয়েসে না। খালি ভাবি। ভাবি যে, একজন যেতে পারল, আমি এখনও পারিনি। হিংসেয় পুড়ি, পুড়তে থাকি। সে যখন চিতায় পোড়ে আম্যর পোড়াটা শুরু হয় তার ঢের আগে থেকে। এই পোড়ার ব্যাপারে আমি তার অগ্রজ অগ্রগামী।

তার মানে বুঝতে পারছ ঝিল্লি, একই সঙ্গে হিংসে আর শোক আমাদের মনে শুয়ে থাকে। তার মানে বুঝতে পারছ ঝিল্লি, ওই হিংসা আর কোনও শোক হঠাৎ একই সঙ্গে জেগেও ওঠে। মাই পায়নি এমন বাচ্চার গলায় চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।

তখন ভয়ও পাই। পাব না কেন? রিপুরা যে সব শিশু। তাদের কান্নাকে ভয় পায় না কে? কায়দার বাংলা বলছি? ঝিল্লি, এই তো আমার কামরার লুকোনো সেলার থেকে এক ঢোঁক গিলে নিলাম। এবার আমি সাহসী।

ঝিল্লি, তুমি এই সাহসী ব্যক্তিটিকে দ্যাখো, তার কথা শোনো। সে শিউরে ফিরে ফিরে আসে। চায় না সে পুড়তে, চায় না। এক্ষুনি না। না কেন? এই জন্যে যে, এখনও জীবন আছে, এখনও বেঁচে থাকা আছে। সেই বাঁচা তোমাদের মতো নিজস্ব শক্তি আর অর্থাৎ বয়েসের জোরে নয়। এ-বাঁচার সঙ্গে যৌবনের কোনও গৌরব মিশে নেই। এ শুধু দিন-আনা দিন-খাওয়া। যে মাছিটা একটু আগে তোমার নাকের ডগায় বসল আর তুমি জাপানী হাতপাখাটা দিয়ে তাকে তাড়ালে, আমার বা আমাদের মাছিটাও কতকটা সেইরকম। সব অনিশ্চিত। সব লঙ্গরখানার 'ডোল'। এই আছি, এই নেই।

না না, ঝিল্লি তুমি বাধা দিয়ো না। বলতে দাও। একই সঙ্গে পুড়তে চাওয়া আর এখনও যে পুড়তে হচ্ছে না এই অহংকার এই কষ্ট—এইসব জড়িয়ে মিশিয়ে থাকে। ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বলতে চাই। বলতে দেবে না?

--নিখিলেশ, তুমি আজ ভয়ানক বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত হয়ে আছ। বরং শ্মশানে যাও।

—তুমিও আমাকে শ্মশানে যেতে বলছ, ঝিল্লি? তুমিও?

হাত বাড়িয়ে নিখিলেশের গালে আলতো একটা চাপড় মারল ঝিল্লি। বলল, দূর বোকা! সেই অর্থে বলিনি। এখনও শ্মশানে গেলে তুমি হয়তো সীতামাসিকে দেখতে পাবে।

—তার মানে, তার যেটুকু পড়ে আছে সেইটুকুকে? তার বদলে আমি তো কোনও ফ্লোরিস্টকে ফোন করে কিছু সময়োচিত ফুলও পাঠিয়ে দিতে পারি। কিন্তু তোমার হাত সরিয়ে নাও ঝিল্লি। তোমার নখে নখে বড়ো ধার। আর রঙ যেন লাল রক্তের মতো। তোমার নখগুলো যেন বল্লম বা বর্শার মতো। বড়ো বেঁধে।

—চামড়ায়?

—তা তো বটেই, কিন্তু তারও তলায়। বুকে। ভুল কোরো না ঝিল্লি, সীতা-মাসির বয়েস সত্তর পেরিয়ে আশি ছুঁই-ছুঁই হয়েছিল। পরিণত, পরিপক্ক একটি

ফল খসে পড়ল। একটা মরা তারা খসে পড়লে কেউ হায়-হায় করে?

—তুমি তো করছ, নিখিলেশ।

—ওই দ্যাখো, তুমিও বললে নিখিলেশ। আমি আস্তে-আস্তে আমার বলার কথাটার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি।

আমাকে আমার মা বলত নীলু, আমার বাবা বলত নীলু, দাদা-দিদি সবাই ওই নীলুই বলত। স্কুলে কলেজে কিছু-কিছু বন্ধুও ওই নামে ডাকত। তাদের অনেকেই আজ বিগত। আর প্রায় সকলেই এখন দূরে দূরে, কত দূরে কে জানে। কেউ ভিলাইয়ে, কেউ কোচিনে, কেউ বা ব্রিটেন বা কানাডায়—দূরে দূরে মুলুকে। এবার ঠাকুমার কথা জিজ্ঞেস কোরো না যেন। ওই বুড়ি আমাকে ডাকত দাদা বলে। তিনকাল-যাওয়া মেয়েমানুষ কিনা, তাই ফোকলা দাঁতে এই বাচ্চাটার ছোট্ট বোনটি হতে চাইত।

—নিখিলেশ, চুপ করো।

—করব। তার আগে তোমার ভুলটা শুধরে দিয়ে যাই। বাকি ছিল এক সীতামাসিই।

—তিনি তোমাকে খুব ভালোবাসতেন। তুমিও খুব ভালোবাসতে তাঁকে। জানি।

—কী করে জানলে?

—নইলে তোমার চোখে জল কেন?

—জল জল জল—কেমন যেন বিকৃত গলায় বলে উঠল নিখিলেশ—লক্ষ্মী সোনা, জল দেখে তোমার বিচারবুদ্ধিকে বিকল কোরো না।

—কিন্তু সীতামাসির মৃত্যুতে তুমি যে ভীষণ আঘাত পেয়েছ। এটা তো ঠিক। নইলে কাঁদবে কেন?

—ঠিক আবার ঠিক নয়ও। আমি যে এখনও কাঁদতে পারি তুমি কি বিশ্বাস করবে ঝিল্লি, সেটাই আমার আনন্দ। প্রমাণ পাচ্ছি আমি এখনও মরিনি। এখনও চোখে জল আসে। শোক আর দুঃখ এই মুহূর্তে কী আশ্চর্য দ্যাখো একসঙ্গে মিশে গেছে।

—এই তোমার শেষ কথা নিখিলেশ?

—নিখিলেশ নিখিলেশ নিখিলেশ!

টেবলের উপরে জোরে এমন একটা চাপড় মারল সে যাতে প্লাশটপ টেবলটা থরো-থরো কেঁপে উঠল। সেই মুহূর্তেই আমাদের পুরুষ নায়কের মুখে অদ্ভুত একটা হাসি হলুদ হয়ে গেল—একমাত্র কালামুখী মেয়েরাই কখনও-কখনও যে-রকম হলদে হাসি হাসতে পারে।

সেই হাসি সারা ঘরে ছড়িয়ে দিয়ে, সেই হাসিতে সমস্ত ঘরটাকে ভরে দিয়ে নিখিলেশ বলল, আমি এখন শুধুই নিখিলেশ। আমার বাঁধানো সোনার দাঁতটা সেই কথাটা বলে দিচ্ছে, তাই না? কিন্তু ঝিল্লি, একটা বড়ো রকমের ভুল করেছ তুমি। (নিখিলেশ এইখানে একটু থেমে আর এক ঢোঁক তার গলা দিয়ে অধঃকৃত করল)। আবার বলল, একটা বড়ো রকমের ভুল করেছ তুমি।

একটু আগে বলছিলে না সীতামাসির মৃত্যুশোকে আমি একেবারে কাতর হয়ে পড়েছি? কাৎ হয়ে গিয়েছিও বলতে পারতে। শেষবারের মতো শুনে রাখো ঝিল্লি, আমি কাতর হয়েছি ঠিক। কাঁদছিও আমি। তবে শুধু সীতা-মাসি মরল বলে নয়, তার সঙ্গে আমার ডাকনামটাও মরল বলে। আর তো কেউ আমাকে কোনওদিন নীলু বলে ডাকবে না। কেউ রইল না। ওই নামটাও চিরকালের মতো গেল। একটা ডাক নিশ্চিহ্ন হল। এতক্ষণ বাদে মেয়ে খুকুর কষ্টটা বুঝতে পারছি। যে ময়নাটা তাকে খু—কু বলে ডাকত, আজকের ঝড়ে সে মরে গেছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হো-হো করে অনর্গল হাসতে থাকল নিখিলেশ। ঝিল্লির মুখের উপরে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এইবার বলো আজকে কোথায় তোমার পার্টি, কোথায় যেতে হবে?

শূন্যযান

অনীতা তাকে বকল। তুমি যেখানে সেখানে থুতু ছিটোও কেন বলো তো? সারা ঘর নোংরা হয়ে যায়।

লোকনাথ ফোকলা দাঁতে হাসল। —বয়েসের দোষ। কী করি বলো তো? যেমন পেচ্ছাপ, তেমনই থুতু, এখন আর ইচ্ছেমতো সামলাতে পারিনে।

অনীতা হাসল। বিশ্রী। অন্তত সেই হাসির ঝিলিকে লোকনাথের মনে হল বিশ্রী। দাঁতে এত মিশি, এত? বুক মানে কি শুধু বোঁটা? ঊরু মানে খালি দুটো ঢ্যাঙোস ঢ্যাঙোস ঠ্যাং? অথচ মেয়েদের শরীর নিয়ে, এমন কি অনীতার খাঁচাটাকে নিয়েও একদিন লালায়িত জিভে কত না রস ঝরেছে! চোখের দু-দুটো মণি হয়ে গেছে চারশো পাওয়ারের বাল্‌ব।

মেয়েদের শরীর, মেয়েদের শরীর। আর কিছু না থাকুক পুরুষের চেটে চেটে নেওয়া চোখ আছে। লোকনাথ তার চব্বিশটা দাঁত মেলে (বত্রিশটা আর নেই তাই চব্বিশটা) হাঁ করে একটা দীর্ঘশ্বাস না ছেড়ে পারল না। হাপর যেমন ছাড়ে। তবে হাপরে আগুনও থাকে, এই কটকটে হাঁ করায় কোনও আগুন নেই।

নাই থাক, তবু বাতাস আছে। হাওয়া, হাওয়া, ফুরফুরে হাওয়া। যে-হাওয়ায় একদিন সমস্ত রোম এবং সংগোপনে আরও অনেক কিছু চনমন করে উঠে দাঁড়াত। সেই হাওয়া আজ নেই।

কিংবা আছে। লোকনাথরা আর তা টের পায় না। তাদের শরীরের রোম রেডিও বা টিভি-র অ্যানটেনার মতো খাড়া হয় না। আগে হত। কখন হত? ধরা যাক, ছোটনাগপুরের এবড়ো-খেবড়ো জমি যখন পাড়ি দিচ্ছে, তখন মেয়েরা, মাইরি মেয়েরা, তাদের দেহের নরম-গরম, শক্ত-কোমল ছায়া নিয়ে আতুর চোখে দিব্যি বাংলাটা কী যেন হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে, উদ্ভাসিত হত।

মেয়েরা বন্ধু কিংবা বান্ধবী। তাই বলে তাদের অবয়ব এমন বন্ধুর প্রাকৃতিক মানচিত্র হবে কেন?

আজ অনুভূতিতে এই সব নেই। মানে চামড়ায় নেই। চামড়ায় যা নেই, তা চালান হয়ে গেছে মগজে। সুতরাং লোকনাথ খুব সুস্থির, সুস্থিত আর সংযত হয়ে পিছনের সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে।

যেভাবে আমরা নদীর ওপারে গিয়ে এপারের দৃশ্য-ট্রিশ্য দেখি। একটু ঝাপসা, একটু কুয়াশা, তবু তো দেখি।

এত কথা অনীতাকে বলা যাবে না বলেই লোকনাথ অনীতার ধমকের

জবাবে শুধু বলল, বয়স গেছে। বলেছিলে না? প্রকাণ্ড এই হলঘরটায় থুতু ছিটোনোর সাফাই হিসেবে বয়সকে দাঁড় করানো। হা-হা। বয়সকে কেউ এর আগে মোক্তার হিসেবে ভেবেছে?

লোকনাথ বলেছিল বয়েসের দোষ আর সঙ্গে সঙ্গে গুলতি থেকে ছিট-কোনো গুলির মতো অনীতা বলে উঠল, বয়সকেও দোষ দিচ্ছ? কিন্তু বয়স কি তোমার আর আছে?

ফোকলা দাঁতে ফ্যাঁসফেঁসে গলাতেও এই তেড়িয়া প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। দেওয়া যেত, যদি এক থাপ্পড়ে। কিন্তু থাপ্পড় মারবে যে-হাত, সেই হাতও তো কুঁচকে প্রায় কুমীরের পিঠের চেহারা নিয়েছে। রগগুলো যেন নদী-নালা। কব্জি চিমসে।

লোকনাথ সুতরাং ওই হা-হা হলঘরে হাসতেই থাকল। যখন জবাব নেই, যখন মারার উপায় নেই, তখন হাসি ছাড়া আর গতি কী? হাসতে হবেই। হোক না যার দিকে ছুঁড়ে মারা সেই হাসি, তার দাঁতে মিশি, তার সমস্ত শরীর বঙ্গদেশের মতো সমতল!

তবে ওই সমতট, সমতল বঙ্গদেশই তাকে স্তোক দিল। অনীতা বলল, আচ্ছা, তোমার না হয় সাড়ে তিন কাল গিয়ে আধকালে ঠেকেছিল, তাই তুমি এখানে এলে। কিন্তু আমি তো তোমার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের ছোট, আমাকে এখানে আসতে হল, বলতে পার কী জন্যে?

লোকনাথ বলতে পারল না। পারল না বলেই ফের হাসল। চব্বিশটি দাঁতে যতটা হাসি বিকশিত করা যায়, ঠিক ততটা।

হাসতে হাসতে সে বলল, তুমি বোধ হয় খুব পাপ করেছিলে, তাই!

ছাড়বার পাত্রী নয় অনীতা। সঙ্গে সঙ্গেই বলল, যদি করে থাকি, তবে তোমার সঙ্গে। আমার সোয়ামির সঙ্গে তো করিনি! সোয়ামির সঙ্গে যা যা হয়ে থাকে, সে-সব কি পাপ? সে-সব তো পুণ্যি! প্রয়াগের কুম্ভমেলার গঙ্গাজলে চান করাও যা, সোয়ামির সঙ্গে শোয়াও তা-ই। কর্তব্য।

লোকনাথকে তখন কথায় পেয়েছিল। তাই বলল অনেকটা ঠিক বলেছ বটে, কিন্তু প্রয়াগের জলে পেটে বাচ্চা আসে, এটা তো কখনও শুনিনি।

—অথচ দুটোই সঙ্গম। দুজন এক স্বরে বলল।

আর ঠিক তখনই দেখল, আশেপাশে যারা ছিল, তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

ওরা পাশাপাশি ছিল, লোকনাথ আব অনীতা। লোকনাথ ফ্যাঁসফেঁসের বদলে চিত্তকে স্থির করে কণ্ঠস্বরকে ফিসফিস করে বলল, আচ্ছা, এটা কি সহমরণ? তুমি তো আমার বিয়ে-করা বউ ছিলে না। তবু আমারই সঙ্গে এখানে এলে কেন, এবং কী করে? আমাকে বাঁচাতে?

—তোমাকে বাঁচায় কারুর বাপের সাধ্যি নেই। অ-নেক চেষ্টা করেছি। অ-নেক! পারিনি বলেই শেষ পর্যন্ত আমিও এলুম।

—কী করলে? বিষ খেলে না গলায় দড়ি? দড়ি-কলসি অবিশ্যি হতে পারে। জানো, আমি এমন হতচ্ছাড়া, কলসি দেখলেই তোমাদের দিব্যি সুডৌল

গড়নটা মনে পড়ে যায়। বলো, কোন্‌টা তুমি বেছে নিয়েছিলে?

এখনও জেরা মুখপোড়া? দেখছিস না, সক্‌কলে রেলিং-এর ওদিকে চলে যাচ্ছে?

হঠাৎ ফোকলা মুখেও কী করে যেন লোকনাথের গলা গাঢ় গদগদ হয়ে গেল। সে তুই-তোকারি করল না। আস্তে আস্তে গভীর করে বলল, ভেবো না অনীতা, সকলেই যায়, সকলকেই যেতে হয়। ভেবো না অনীতা, আমরাও যাব।

—মাইরি বলছ একসঙ্গে যাব?

—কোনও কথা দিতে পারছি না। তবে জানি যে, যাব। এগোব।

॥ দুই ॥

পাশপোরট্‌ অফিসার হাঁকলেন, আপনাদের খাতাপত্তর কই? সেসব না দেখিয়েই যে বেশ ভুড়ুক গলে যাচ্ছিলেন?

লোকনাথ—ফোকলা দাঁতই তার সহায়—বলল, এগুচ্ছি না পিছোচ্ছি, তা তো জানি না! শুধু যাচ্ছি।

পাশপোরট্‌ অফিসার বললেন, এই বেড়া ডিঙোতে হলেও একটা বই চাই। আপনার আছে? ওনার আছে? সব দেখেশুনে তবে আমরা স্ট্যামপো মেরে দিই।

লোকনাথ অমায়িক পিছন দিকে হাত বাড়াল। সেখানে উঠে এল অনীতার পাশবই।

ঠক ঠক দুটো ছাপ মেরে অফিসারবাবু বললেন, ঠিক আছে। আপনারা যে মরেছেন, তাতে ভুল নেই।

উল্লুক লোকনাথ—সঙ্গে সঙ্গে বলল, মরেছিলাম তো আগেই। যখন আমরা এ ওর প্রেমে পড়ি।

অফিসারবাবু খুব জ্যোৎস্না হাসলেন। প্রেমে পড়লে মরে তো সবাই। বাঁচে আর ক'জন? কিন্তু বলুন তো, লোকে খালি প্রেমে পড়া বলে কেন? প্রেম কি শুধুই পড়া? ওঠা নয়? প্রেমে ওঠা তবে কেন বলা হয় না?

অফিসারবাবু ঠকঠক স্ট্যামপো মেরে লোকনাথ আর অনীতার প্রতি আবার চাঁদিনী হলেন।

॥ তিন ॥

ওরা এগোতে যাচ্ছিল। তক্ষুনি একটা বেড়া, একটা বাধা।

—কোথায় যাচ্ছেন? খুব ঘড়ঘড়ে গলায় একটা তখ্‌মা-আঁটা লোক জিগ্যেস করল।

—কোথাও যাচ্ছি না তো! কিংবা কোথায় যাচ্ছি জানি না। আমরা শুধু এসেছি।

—হাওয়াই জাহাজে হাওয়া হবেন?

—শুনেছিলাম তো তাই নিয়ম।

—এলেই যাওয়া যায় না। হাওয়ায় হাওয়া হওয়া কি চাট্টিখানি?

—আমরা তো পুলিশ কনট্রোল পার হয়ে এলাম। জমা দিলাম আমাদের পাশপোরট।

—কিন্তু আপনাদের মালপত্তর? তার হিসেব তো দেননি! ওজনও করেননি। এভাবে অন্তত এই হাওয়াই জাহাজে ওঠা যায় না। জেনে রাখুন।

ঘড়ঘড়ে গলাওয়ালা সেই লোকটা নির্বিকার, ভাবলেশহীন বলল, বলে গেল, এর পর আছে 'কাসটমস'।

—হেলথ কাউন্টার নেই? লোকনাথ জিগ্যেস করতে পারত। তবে করল না, কারণ সত্যিকার শরীর থাকলে তবে তো হেলথ! অফিসার কড়া গলায় বললেন, কী আছে আপনাদের সঙ্গে?

—একটা সুটকেস আর একটা ফোলিও ব্যাগ। বিশ্বাস করুন এই শুধু এই।

অফিসার বলল, তবু খুলতে হবে।

লোকনাথ খুলল। শেভিংসেট, টুথপেস্ট আর ব্রাশ। দুই একটি ম্যাগাজিন। বলল, দেখলেন তো শুধু এই।

গ্রাম্ভারী গলায় অফিসার বললেন, দেখার আরও বাকি আছে। কিংবা আপনারা দেখাননি। আরও তুলুন।

—ভাবছেন, তুললে জবরদস্ত কাস্টমস অফিসার আপনি আরও হুলুস্থুলু অনেক ব্যাপার দেখতে পাবেন?

অফিসার এতক্ষণ বাদে মানবিক অমায়িক হাসলেন। বললেন,—দেখতে না পাই, বুঝতে পারব। অদৃশ্য কোনও কিছু যদি আপনি এবং আপনার সঙ্গী মহিলা নিয়ে যেতে চান, তাও আটকাব। এখনও বলুন, এমন কিছু আছে, আছে, আছে?

চিৎকার করে উঠল লোকনাথ। বলল আছেই তো। আলবৎ আছে। আমার সঙ্গিনী মহিলাটি কতটুকু আনতে পেরেছেন, জানি না। তিনি আনতে চেয়েছিলেন কি না তাও আমার জানা নেই। কিন্তু সরাসরি বলছি,—আমি এনেছি। অনেক খুইয়েও আমার আছে। আমার চাওয়া, আমার মোহ, আমার পাপ, আমার উচ্চাশা, আমার ভালোবাসা। সব নিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম আপনারা দেখতে পাবেন না।

অফিসার খুব করুণাময় হেসে বললেন, দেখতে না পেলেও আমরা অনেক কিছু টের পাই। আপনার চাওয়া-টাওয়া, আপনার মোহ, পাপ, কামনা আর ভালোবাসা।

—সবগুলোই কাস্টমসে আটকায়?

—সবগুলোই এই কাস্টমস অফিসার আমরা আটকাতে পারি।

—দারুণ বেড়া তো!

—এই শেষ বেড়া যে। লোকনাথ অপাঙ্গে অনীতার দিকে তাকিয়ে বলল, বৈধ পাশপোরট না থাকলে বিবিধ কারণে ওরা তোমাকেও হয়ত আটকাতো।

অনীতার মুখে ভাবের লেশমাত্র ছিল না। সে শুধু হাসল।

তখন লোকনাথ সটান এগিয়ে গেল আবার সেই কাস্টমস অফিসারের দিকে। বলল, সব ডিক্লেয়ার করেছি। যা ডিক্লেয়ার করিনি তাও আপনি আন্দাজ করে নিয়েছেন। আমার আসক্তি আর পাপ? আমার মোহ আব উচ্চাশা আমার ভালোবাসা?

অফিসার বললেন, ভালোবাসার সাতখুন মাপ। যান না, নিয়ে যান না। ভালোবাসাকে সঙ্গে নিলেও এই শরীরে সেটাকে তো আর পাবেন না।

আমরা অশরীরী প্রেমেও বিশ্বাস করি।

—যেখানে যাচ্ছেন, অমায়িক হেসে অফিসার বললেন, সেখানে দেখবেন কথাটার অর্থই নেই। অশরীরী প্রেম? দেহহীন চামেলি? ওসব এই জগতের রক্তমাংসের শিরায় চনমন খেলে। যেখানে যাচ্ছেন সেখানে ভালোবাসাকে স্মাগল করে নিয়ে গেলেও কেউ কিছু বলব না। কারণ শরীরই যেখানে নেই সেখানে অশরীরী কোনও টানাপোড়েন, ভালোবাসাটাসার কোনও দাম নেই। সেখানে কিছুতেই কিছু হয় না। সত্যি বলতে কি ইচ্ছেই হয় না।

লোকনাথ আর অনীতা বলল, তবে সেখানে আছে কী?

অফিসার আবার হাসলেন, বললেন, যা আছে তা নিজেদের খুঁজে আর বেছে নিতে হয়। কেউ পায় নীল নীল, কেউ বেগনি, কেউ হলুদ কেউ রামধনুর সবকটা রঙ—যে যা পায়। আসক্তি-টাসক্তির কথাই ওঠে না, কারণ সেই হয় হরিৎ নয় পীত ওই ইন্দ্রধনু শূন্যে কেউ বিশেষ করে কিছু চায় না। কাউকে তো নয়ই।

—তবে আমরা পাশ বা এই গেট থেকে খালাস? লোকনাথ বলল। সে তখনও অনীতার কাঁধে তার হাত রেখেছিল।

অফিসারবাবু ফের স্ট্যাম্পো মেরে দিলেন। যেমনই হোক, পাশ বা খালাস আছে।

বেড়ার ওদিকে গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে লোকনাথ বলল, আপনি খালি মোহ আর আসক্তির তল্লাসি করেছিলেন অফিসার সাব। তলায় যেটা ছিল সেটা আর নাড়াচাড়া ক'র দেখেন নি।

অফিসার বললেন, দেখেছি। আপনার লেখা অনেকগুলো কাগজ তো! ওগুলোতে শুধু নিজের কথা। রাগ অনুরাগ ক্ষমা আর বিস্মরণ। চান তো এসব চোতাকাগজ সঙ্গে নিয়েও ওপারে যেতে পারেন। কারুর কিছু যাবে আসবে না।

বেড়া ডিঙিয়েছিল বলেই এতক্ষণ বাদে হো হো করে প্রাণ খুলে হাসতে পারল লোকনাথ। বলল, কাগজগুলো আপনার কাছে রয়ে গেল তো রয়েই গেল। অন্তত আমার ওগুলোতে আর কাজ নেই। কাকে ঘৃণা করেছি, কাকে করেছি ক্ষমা, এসব বিবরণ অতঃপর—বলুন তো কী?—অবাস্তব।

বলতে বলতে লোকনাথের গলা গাঢ় হয়ে গেল। যা পেরিয়ে এলাম সেখানে কত কাম, কত কামনা, কত বাস কত বাসনা। শুধু ভোগ অথবা দুর্ভোগ। আঘাতহানা কিংবা পদাঘাত। সব পেরিয়ে এলাম। জানেন, নিজেকে দারুণ হালকা লাগছে।

অফিসার কী বলতে যাচ্ছিলেন, লোকনাথ তাকে বাধা দিয়ে অনীতাকে বাহু বিস্তারে নিজের আরও সংলগ্ন করে স্ফূর্তে বলে গেলঃ যা পেয়েছি, যা পাইনি যাদের নিয়েছি, যাদের নিইনি, কিংবা ছোট করে বলতে গেলে যারা নেয়নি আমাকে, তাদের সব বৃত্তান্ত আপনার কাছেই জমা থাক। অনেকের সম্পর্কে আর বিরুদ্ধে অনেক লেখা আছে এবং থাক আমার কলমে। বেড়ার এদিকে এসে আমার কারুর সম্পর্কে কিছুমাত্র রাগ অনুরাগ নেই।

লোকনাথ থামল না। বলেই গেল, ওই লেখায় কার হিত কার অহিত আমি তো জানি না, কোনও অভিমান, কোনও অভিযোগ নেই।

অফিসার বললেন, কিন্তু কাগজগুলো যে আমরা নষ্ট করে দেব।

লোকনাথ বলল, কাগজগুলো নষ্ট করতে পারেন করুন না, আমার আর কোনও মায়া নেই। কিন্তু সত্যকে নষ্ট করার শক্তি কার? সেই সত্য রইল। আর কাগজগুলোও যদি আপনাদের নিয়মের আগুন থেকে বাঁচে তবুও কি সেগুলো বাঁচবে? বাঁচে যদি তবে নিজের প্রাণশক্তির জোরে। কোনওদিন নিজের কষ্ট, অভিমান উজাড় করে রক্ত ঢেলে লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, লিখেছি, লিখছি এই ব্যাপারটাই আসল কথা। তার মধ্যে সারবস্তু যদি কিছু থাকে তবে কোনওদিন কেউ হয়ত তার দু'এক পাতা কুড়িয়ে কিছু পাবে। ভুল বললাম অফিসার সাহেব—আমিও টের পাব। আমি আজ মরলাম, কাল বাঁচব। আজ কারুর কাজে লাগল না। কাল কেউ হয়ত তার মধ্যে চকচকে একটা সোনা দেখে ফেলল। দেখে যদি তবে তারই মধ্যে আমি বাঁচব। পুনর্জন্মতত্ত্ব সেখানে সেই অর্থে সত্য হবে। এবার বলুন তো, আমার সুটকেসে সেই হিজিবিজি লেখালেখির কোনও হদিশ পেয়েছেন?

—পেয়েছি। অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন।

—তা হলে কোনও প্রার্থনা তো জানাই নি। শুধু এটুকু বলছি, দয়া করে ওই কাগজগুলো পোড়াবেন না। অন্তত অর্ধদগ্ধ অবস্থাতেও আমাকে বাঁচতে দিন।

—পোড়াব না। অফিসার প্রগাঢ় আশ্বাস দিলেন। আর সেই মুহূর্তে বায়ুর মতো হালকা চপল বয়ে গেল লোকনাথ। বলল, আঃ এবার আমি একেবারে মুক্ত। আপনাদের শূন্যযানে চড়তে আমার আর কোনও বাধা নেই। প্লেনটা ঠিক ক'টায় টেকঅফ করছে বলুন তো?

॥ চার ॥

অফিসার কী বলেছিলেন? তিনি কি বলেন, প্লেন টেক্‌ অফ্‌ করতে ঘন্টা দুই দেরি!

লোকনাথ বলে থাকবে আপনাদেরও তবে দেরি হয়! আচ্ছা বলুন তো, যেখানে যাচ্ছি, সেখানে কী আছে? অফিসার তাঁর চাপা গলায় কী বললেন স্পষ্ট হল না।

অনেক পরে, তখন নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট যাবতীয় প্লেন ছেড়ে গেছে কি না গেছে, ঠিক নেই, লোকনাথ অনীতাকে বলল, "জানো আমাদের এ-যাত্রা যাওয়াই হল না! সব ফ্লাইট মিস্‌ করেছি।"

—করলে কেন?

—ইচ্ছে করে। তুমি তো জানো না, অফিসারের সঙ্গে আমার কানে কানে চুপি চুপি কী কথা হল। উনি বললেন, যেখানে যাচ্ছি—ওঁরা সব জানেন তো—সেখানে নীল ছাড়া কোনও রঙ নেই। আমি যে লালও চাই। আমি জিগ্যেস করলাম, এই যে বেড়ার ওদিকে সব চেহারা দেখতে পাচ্ছি, সব সাদা সাদা। সব ভুতুড়ে। কোন রাগ নেই, শ্লেষ্মা নেই, পিত্তি নেই। টাইট পোশাক আর বিলকুল সাদা। সারকাসের ক্লউনদেরই যা থাকে, বা সাজে। আমি বললাম, ওদের নোখ নেই কেন? আর ওদের দাঁত? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। অফিসার কী বললেন জানো? ওদের আর নোখ, দাঁত-টাতের দরকার নেই যে। আমি বললাম, তবে কি ওরা আঁচড়ায় না, কখনও কামড়ায় না? অফিসার অল্প অল্প হেসে বললেন, দরকারই হয় না। ওখানে ওরা শুধু ভালোবাসে। জানো অনীতা, এই ভালোবাসার নাম আমার কাছে মেনে নেওয়া বলে মনে হল।

—তারপর? অনীতা জিগ্যেস করল।

—পর বলে তো কিছু নেই, এখনটাই শুধু আছে। আমি তবু জিগ্যেস করলাম, ওখানে নদীও কি আছে? অফিসার বললেন আছে। স্রোত? নেহাত নির্লজ্জ, তাই আমি জিগ্যেস করলাম। উনি বললেন, নেই। যেখানকার জল বরাবর সেখানেই টলটল করে। করেই চলে।

লোকনাথ বলেই চলল, জল বয় না থেমেই থাকে শুনে আমি ভয় পেলাম। আবার জানতে চাইলাম, নদী তো বুঝলাম, কিন্তু সমুদ্দুর? অফিসার কী অমায়িক জানো অনীতা, বললেন, আছে। খাসা, নীল, টলটলে। আর তাতে একটুও নুন নেই। অনীতা, নুন আছে বলে সমুদ্রের জল আমরা দেখি কিন্তু চাখি না, কিন্তু নুন নেই শুনে আমার ভিতরটা নুনে পুড়ে গেল।

অবশেষে যখন শেষ ফ্লাইটটাও নেই, কাস্টমসের এদিকে লোকজনও বিশেষ দেখা যায় না, তখন মানুষ হিসেবে, মানুষ বলেই গলা একটু চড়িয়ে লোকনাথ বলল, ভালোই হল অনীতা, শেষ প্লেনটাও যে ছেড়ে গেছে! ওই দেশের

নিষ্কলঙ্ক নীলে যেতে আমার একটুও সাধ নেই জানো? আমি বরং লাল, হলুদ, সবুজ—এই সব রঙ মিলিয়েই বাঁচতে ভালোবাসি। সবটাকে, সাতটাকে মিলিয়ে সাদা করে দিই। কিংবা—হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লোকনাথ—পারলে আবার সেই রক্তাক্ত, কর্দমাক্ত পৃথিবীতেই ফিরে যাই। যেখানে আমি আছি, তুমি আছ, নদীতে স্রোত আছে, সমুদ্রে লবণ। যেখানে আমরা এ ওকে চাই, যাকে ভালোবাসা বলে তা-ই, তবু কখনও কখনও নোখ দিয়ে আঁচড়াই, যখন জাপটে ধরি, তখনও দাঁত বসাই।

—যেখানে যাবার কথা, সেখানে কিচ্ছু নেই?

কিচ্ছু না অনীতা, কিচ্ছু না। দেখছ না ওদের এলুমিনিয়মে রঙ করা মুখ! দেখছ না, ওদের নোখ নেই, দাঁত নেই!

—আছে, সব আছে। অনীতা ঢাকা গলায় বলল। ওরাও হয়তো আর উপায় নেই বলে, আর জীবন নেই বলে নোখ-দাঁত, আঁচড়ানো-কামড়ানোর সব সাধ ঢেকে রাখে!

—তবে ওদের ভিড়ে আমরা যাব কেন? লোকনাথ বলল। বরং এখানেই থাকি না কেন! এই কাস্টমসের বেড়ার এপারে? এখানে কিছু পেলে খাব, না পেলে ঘুমোব, চাটাচাটি, আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়াকামড়ি সব চলবে, আর—আর, হয়তো-বা অনীতা, আমরা পরস্পরে প্রবেশও করব।

—মানে, আমরা থাকব? অনীতা জিগ্যেস করল।

—আমরা থাকব। প্রগাঢ় প্রতিধ্বনি করল লোকনাথ।

পাখিটাও জানে

ওকে একটু ছোঁব, ওকে একটু ছোঁব, যদি বলি এই ইচ্ছেটা আমাকে সেই মুহূর্তে বশ বলুন, অবশ বলুন, যা-ইচ্ছে তাই বলুন, করে বসল, তা হলে ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যাবে কিনা জানি না, মানে তখনকার আমাকে। আমার পাশে বসে শব্দের পিঠে শব্দ চাপিয়ে স্রোতের মুখে ঠেলে দিই, কিন্তু সব শব্দ তো সাঁতার জানে না, পারে পৌঁছবার ঢের আগেই ওদের বেশির ভাগ টুপ করে ডুবে যায়, তবু হায় ওই শব্দ বই আমাদের গতি কী। কথায় কথা গাঁথা, কথার কথা নাকি ! ছবি আঁকতে কি ভিতরটাকে ছেঁকে তুলতে রঙ বলো, তুলি বলো, ছাঁকনি বলো, আমাদের সম্বল ওই সাঁতার-না-জানা কিংবা গলায় মানের কলসীবাঁধা ওই শব্দ।

অতএব অগত্যা শব্দ দিয়েই গল্পটা বলতে চেষ্টা করি। মিহি না হোক, অন্তত মিনি হবে। মিহি-মিষ্টি গল্প বলার পাট তো কবেই চুকে গেছে। সাবেকী নমুনা সমূহ অচিরে মহাফেজখানায় চালান হয়ে যাবে, অথবা শোভা প্যাবে জাদুঘরে, জীবাশ্ম ইত্যাদি সাদর যেরূপ পেয়ে থাকে।

কপালের শুকনো চুল, স্নান করেনি (সম্ভবত), তাই শুকনো, সরিয়ে ও এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকাল। চাপা গলায় বলল, 'কেন এসেছ? তোমার তাকানোর ধরনটাও যেন কেমন...আমার ভয় করছে।'

বললাম 'অলকা, মিছিমিছি নিজেকে ঠকাচ্ছ। আমার তাকানোর ধরনে কোনও ভয় নেই, চেয়ে দ্যাখ, চাউনি একেবারে নির্মল, টলটল, আসলে তুমি ভয় পেয়েছ আমার আসাতেই।' ওর সিঁথিতে পুরু করে টানা নিষেধাজ্ঞার দিকে নিষ্পলক নজর রেখেই বললাম।

অলকা বলল, 'যদি বলো, তবে তাই। এভাবে তোমার আসার কোনও অর্থ হয় না, মানে নেই। ভয় সেই জন্যেই। তা ছাড়া, তা ছাড়া তুমি বদলেও গেছ। আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ও বলল।

'আমি বদলাইনি অলকা; কিছু যদি বদলে গিয়ে থাকে তবে তোমার দেখা, তোমার চোখ, পালটা এই অভিযোগ করা অসমীচীন হত না, তবু কী ভেবে আমি যেমন দ্রব ছিলুম, তেমনই থাকা সাব্যস্ত করলুম।

বললুম, 'ভালো করে তাকাও না একবার অলকা, আমার চোখে তোমার মুখ দ্যাখো। দেখবে ওই চোখে কোনও পাপ নেই। পাপ নেই, কিন্তু একটা পাখি আছে।

"পাখি ?"

"সেই পাখিটা ওকে একটু ছোঁব, ওকে একটু ছোঁব বলে ডাকছে, শুনতে পাচ্ছ ?"

"ওইটেই তো পাপ।"

"পাখির ডাকা পাপ ?"

"ডাকা নয়। আমার পক্ষে সেই ডাক শোনাটা। অতীশ, তুমি এখন যাও। তা ছাড়া ঝুমিটার অসুখ, দেখছ না ও দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। উনি ওর জন্যে ওষুধ আনতে গেছেন, এখুনি হয়তো এসে পড়বেন। কী ভাববেন বলো তো ?"

"কেন, একটা পরিচয় বানিয়ে দিতে পারবে না, বাপের বাড়ির সম্পর্কিত দাদা-টাদা, সেকালের অনেক গল্পে এই রকম নাটুকে সিচুয়েশনে যেমন দিত ?"

নাটকের উল্লেখে ওর সিঁদুর যেন স্পষ্টতর হয়ে আরও আবির আর ওর চোখ আরও কালো ফুলকি ঝরাল। দাঁতে দাঁত চেপে অলকা বলল, 'বানানো কেন, দিতে হলে আসল পরিচয়ই দেব। একটা কাপুরুষের—যে খালি চুরি করে ফুলের বাস নিতে চেয়েছিল, ছিঁড়ে আনার সাহস যার হয়নি।'

এ-ওতো নাটক। কিন্তু পাখিটা থামছে না কেন, কিংবা পাখি নয়, এই ইচ্ছেটা কি পিঁপড়ে ? একটু ছোঁবে বলে কুটুস করে ওঠে ? ওই যে অলকার ঠোঁট দুটি একটু ভিন্ন হয়ে আছে, বেঁকে গেছে কোণের দিকটাতে, ওখানে একটিবার আঙুল বোলানো শুধু মোটে একটিবার, যদিও জানি, ওটাও মিথ্যে, নিজেকে, ভাঁওতা, আঙুল শুধু একটু বুলোনোর পরই থামতে চায় না, ফিরে আসতে তো নয়ই, আঙুল চায় সে ঠোঁট হয়ে ওইখানটা চেপে ধরুক, অথবা আঙুল হয়েই যদি থাকতে হয় ওখানে, তবে ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে যাক, অন্তত দুটি দাঁত দংশন করুক তাকে, রক্ত বের করে দিক। অর্থাৎ "একটু ছোঁব" পাখিটা কখন যেন চিলের ন্যায় হাহাকার হয়ে যায়, পিঁপড়ের মতো ইচ্ছেটা আকার নেয় দাঁতালো শুয়োরের।

সবই জানি। ওকে একটু ছোঁব বলে যখন অস্থির হয়ে উঠেছি, এ-সব টের পেয়েছি তখনই। অথচ এও জানি কাজটা অনুচিত, অসামাজিক, অসম্ভব। ও বিবাহিত, যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ওর স্বামী। তা ছাড়া অসুস্থ মেয়ে, তার শিয়রে দাঁড়িয়ে—

'মেয়ের নাম রেখেছ ঝুমি ?

'ডাক নাম। ভাল নাম কী দেব, এখনও ঠিক করতে পারিনি। আমার ইচ্ছে একটা খুব নতুন কিছু—তুমি, তুমি একটা বলো না।' আসলে আমি জানি, অলকা আমার কাছে প্রকৃতই একটা নাম চাইছে না, শুধু ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার থেকে নির্দোষতর প্রসঙ্গে যেতে চাইছে। বললাম, 'লিখে জানাব এখন, ঠিক এই মুহূর্তে আনকোরা কোনও নতুন নাম মনে পড়ছে না।' বলতে বলতেই গলা নামিয়ে ফেললাম 'মেয়ের মাকে কিন্তু এক দিন অনেকগুলো নাম দিয়েছিলাম, মনে পড়ে ? তার থেকেই না-হয় পছন্দসই একটা বেছে—'

অলকা আবার আমার দিকে সোজাসুজি তাকাল।—'মার নামে মেয়ের নাম?'

হেসে বললাম, 'বা রে, মার পুরনো হয়ে যাওয়া শাড়ি মেয়েরা বুঝি নেয় না? তাই তো নিয়ম। কত বছর বয়স হল ঝুমির?'

'এই ফাল্গুনে তিন।' অলকা তখনও আয়ত, সঙ্গে সঙ্গে যেন তৈরি উত্তর দিল। আশ্চর্য, স্নান করেনি, সকালের শাড়ি বদল বোধ হয় তখনও বাকী, চিহ্নমাত্র নেই প্রসাধনের, তবু ক্রমশ সে যেন আকর্ষণে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে। নিজের উপরে নির্ভরতা হারিয়ে ফেলছিলাম আমি, সামলাতে পারব এই আস্থা টলে যাচ্ছিল। অলকা কি বুঝে থাকবে? নইলে দাঁত দিয়ে ঠোঁটের কোণ চেপে ধরল কেন আবার, চোখের কোণে ভীষণ অপমানের ভঙ্গি কেন আঁকল, আবার? 'চোর বরাবর চোরই থাকে', সেই চোখ যেন বলতে চাইছিল, 'চোর এমন কি ডাকাতও হয় না।'

"জ্বর ক'দিনের?" কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, তবু স্বর যেন ফেঁসে গেল।

"চার দিন। কিন্তু আজ যেন ছেড়ে যাচ্ছে; রেমিশন হবে মনে হচ্ছে এবার।" বলতে বলতে অলকা নুয়ে পড়ে নিজের গাল রাখল ঘুমন্ত শিশুর কপালে, তাপ কতটুকু তাই পরখ করবে বলে। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, নিশ্চিন্ত হাসিতে ওর চোখ দুটি ভিজে-ভিজে, যে-চোখ এতক্ষণ ছিল বিব্রত, ভয়ার্ত ক্লিষ্ট।

"জ্বর নেই মনে হচ্ছে। এই, তুমি একবার দ্যাখো না।" মেয়ের শিয়রে দাঁড়িয়েই অলকা ডাকল আমাকে।

তারপর? পরম্পরা মনে নেই। বোধ হয় পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়েছিলাম ঝুমির মাথার কাছে। ফুলের মতো একখানি মুখ, একটু শুকনো, চোখ দুটি আধবোজা। আমারও হাত কাঁপা-কাঁপা, আস্তে আস্তে আমিও রুগ্ন মেয়েটির মুখের উপরে ঝুঁকে পড়েছি।

ওর কপালের শেষ তাপটুকুও কি নিতে পেরেছিলাম শুষে? জানি না। কিন্তু অলকার চোখে শেষবারের মতো চোখ রেখে যখন রাস্তায় নেমে এলাম, তখন বুকের ভিতরে সেই পিপাসিত পাখিটার ডানা ঝটপট একেবারে নেই। কেননা রুগ্ন মেয়েটির ছোট্ট কপালের যেখানটায় গাল রেখেছিল অলকা, ঠিক সেখানে আমি প্রথমে হাত পরে কী ভেবে ঠোঁটও রেখেছি। সেই পাখিটা এখন তাই থেকে থেকে ডাকছে "পেয়েছি, পেয়েছি।" কী পেয়েছে? শুধু ঝুমির নয়, অলকারও স্পর্শ।

আজ ওই একটা উপায়ই আছে। পাখিটাও সে-কথা জেনে গেছে।

বাঁচার ম্যাজিক

সেই দৃশ্য। উর্মিলা রোজ শেষ রাতে যা দেখতে পায়। রাত্তির ঠিক তিনটেতে দূরে কত দূরে কে জানে, একটা ঘড়ি বেজে ওঠে। হয়তো কেউ পেটায়। হয়তো ঘড়িটা নিজেই বেজে ওঠে যদি কোনও গির্জের হয়। গির্জা, মন্দির প্রভৃতি পবিত্র স্থানের ঘড়িদের ভিতরেই বেজে ওঠার একটা পুণ্য আবেগ থাকে। অন্তত উর্মিলার দৃঢ় বিশ্বাস তাই।

বিশ্বাস, না ধারণা, না অভিজ্ঞতা? হাউসকোটটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে উর্মিলাকে উর্মিলা বলল, সেটা অবিশ্যি আমি ঠিক বলতে পারব না। এই তিনটে ব্যাপার আমার ভেতরে কেমন যেন মিলে-মিশে ঝাপসা হয়ে আছে। এই ফরেস্ট বাংলোর নিচেকার খাদে জমাটবাঁধা সাদা কুয়াশার মত।

সেই দৃশ্য। তার আগে অবশ্য ঘড়ির শব্দটার আওয়াজ ওর স্নায়ু রেকর্ড করিয়েই রেখেছে, কোনওখানে নিয়মিত একটি কুকুর বিশ্বস্ত ডেকে উঠেছে, রোজ যেমন ডাকে, আর ঘন পাইনের ডালপালা পাতাটাতার সঙ্গে ফষ্টি নষ্টির তো কামাই নেই, কিন্তু এসব তো শেষরাতের শ্রুতিপট।

আসল কথা হল দৃশ্যটা। সেই দৃশ্য। নইলে, গলায় সাবধানী মাফলারটা জড়িয়ে উর্মিলা ভাবল, রোজ ঠিক এই সময়েই আমার ঘুম ভাঙে কেন? দৃশ্যটা দেখব বলে অবচেতনের চাকে ফোঁটা ফোঁটা কৌতূহলের মধু কি জমে উঠেছে? ছেলেরা তো বলে মেয়েরা এমনিতেই একটু বেশি কিউরিয়স হয়। আমিও কি তাই? অ্যাভারেজ একটি মেয়ে, তার চেয়ে বেশি কিছু নয়? দূর, অসম্ভব। আমি একটু আলাদা সেটা আমার ছেলেবেলা থেকেই জানি। মানে, আমার মেয়েবেলা আসবার আগে থেকে।

আজ তো একটু ভড়কেই গিয়েছিলাম। বেডসুইচটা টিপে বালিশের তলায় রাখা রিস্টওয়াচটা চোখের সামনে তুলেই দেখি সর্বনাশ! দুটো বেজে আটচল্লিশ। ঠিক চলছে তো? বন্ধ যে হয় নি সে তো বুঝতেই পারছি, কিন্তু যদি শ্লো হয়ে গিয়ে থাকে? তবে তো ব্যাপারটা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে।

তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক করে নিলাম নাইটি (পূর্ণেন্দু, ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ। মিনেসোটা থেকে আমার কথা ভেবে পাঠিয়ে দিয়েছ এই নাইট ড্রেসটা, আগে একটু লজ্জা-লজ্জা করত, কিন্তু এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে, তাছাড়া তাড়াতাড়ি ওপরে হাউসকোটটাও তো পরে নিয়েছি), কিন্তু মোজা পরতে ভরসা হল না, মানে সময় নষ্ট করতে।

কিন্তু কী ঘন কুয়াশা জমে রোজ ফরেস্ট বাংলোর এই খাদটার হাঁ হয়ে

থাকা আনাচে কানাচে, যেন অল্প জমানো খানিকটা দুধ, যেন কুয়াশা নয়, শক্ত হয়ে যাওয়া শ্বেতপাথরের একটা চাদর। ভাগ্যিস কাঁপে মাঝে মাঝে, বিশেষ করে হাওয়ায়, ভাগ্যিস চাঁদের আলোয় এখানে-ওখানে একটু ঝিকিমিক দেয়, যেন চুমকির জরি বসানো সাদা ফিনফিনে একটা শাড়ি। নইলে যেখানে আর যখন কোথাও শব্দ ছাড়া কিছু নেই, আছে শুধু দূরের একটা ঘড়ির ধ্বনি আর কাছের একটা কুকুরের ডাক, পাতার ফিসফাস, নাইট ওয়াচম্যানটা নির্ঘাৎ নেশা করে বেহুঁশ, সেখানে গা শির শির করে। স্থিরতার সামনে দাঁড়ালে সব সময় করে। তবু তো আমার এত সাহস।

নইলে এই শ-তিনেক মাইল দূরে খাড়া পাহাড়ের ওপরে পাইন আর দেওদার ফরেস্ট রেঞ্জের নিজস্ব স্কুলে চাকরি নিয়ে কেউ আসে, বিশেষ করে আমার মত, আমার বয়েসী কোনও মেয়ে? এখানে সকালের রোদ্দুরটাই যা চেনা, আর মাঝে মাঝে রাত্তিরের দু-চারটে তারা। তাও তো শুকতারা, সপ্তর্ষি, কালপুরুষ ধরনের গুটিকয়েক নামজাদা নক্ষত্র ছাড়া, আমি আকাশের লাইট-পোস্টগুলোর একটাকেও চিনি না।

সাহস, সাহস, আমার সাহস, আর সেই সঙ্গে, বেশ বাবা, কিউরিওসিটি তো কিউরিওসিটি। মেয়ে হব, অথচ মেয়েলী স্বভাব একটুও থাকবে না, এর কোনও মানে হয়? আমার আছে। হয়তো একটু বেশি পরিমাণেই আছে। তাছাড়া আমি অনেকের থেকে অনেকখানি আলাদাও যে।

কিন্তু ওই দৃশ্যটা? ভয়ঙ্কর ওই ব্যাপারটা? রোজ রাত্তিরে যেটা ঘটে, ঠিক এই সময়? যে সরু কালো রাস্তাটা এই পাহাড়টাকে মহাদেবের গলায় সাপের মত প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে তারপরে কোথায় যেন ফস করে উদাস হয়ে গেছে তার অনেক নিচের বাঁকে হেডলাইট জ্বলে। প্রথম দিন আমি তো ভেবে-ছিলাম বুঝি বা একটা নেকড়ে, কিংবা চিতা লাফিয়ে লাফিয়ে এই বাংলোটার দিকেই আসছে।

কিন্তু খানিক পরে জীপ কি ল্যান্ডরোভার গাড়ির এঞ্জিনের ধস-ধস কানে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম নেকড়ে-টেকড়ে কিছু নয়, ওটা একটা গাড়ি। গাড়িটা প্রথম দিন দাঁড়াল খাদটার ঠিক মুখে, হেডলাইট জ্বালানো ছিল বলে কুয়াশার সাদা শরীরের ওপর তার ঝলক দেখতে পেলাম। হঠাৎ আলোর ঝলকানি নয়, নিবিড়, স্থির দৃষ্টি—হেডলাইট দুটোর। লম্পটেরা যেভাবে মেয়েদের পাতলা কাপড়ের ওপরে অন্তর্ভেদী চোখ রাখে, কতকটা সেই রকম।

ঠিক তখনই কনকনে হাওয়া দিচ্ছিল, অথচ ওই হাড়-কাঁপানো শীতে স্টিয়ারিংয়ের দিক থেকে লাফিয়ে পড়ল একটা লোক, বেশ মজবুত, শক্ত করে গড়া-পেটা চেহারা, তারপর সে হাত বাড়িয়ে যাকে নামিয়ে আনল, আমার মেয়ের চোখ দিয়ে দেখতে ভুল হল না যে সে একটি মেয়ে। পাতলা ছিপছিপে, গায়ে গরম কোনও কোট-টোট আছে বলে মনে হল না, একটা মেরুন রঙের শাড়ি। মেয়েটা কাঁপছিল। কী চায় ওরা? এসেছে কেন, এখন কেন, এখানে কেন? অনেকগুলো কেন যখন বোলতার মত ঘুরে ঘুরে আমার মগজে হুল ফোটাচ্ছে

ঠিক তখনই আমি ঘটনাটা দেখি।

॥ দুই ॥

—কী দেখলেন?

—লোকটা মেয়েটাকে খাদের ভেতরে ঠেলে ফেলে দিল।

—ঠেলে ফেলে দিল? ঠিক দেখেছেন? মেয়েটি নিজে থেকে নেমে যায় নি তো?

মোটাসোটা দারোগাবাবু এখানে একটু কাশলেন। চুরুটের ধোঁয়ায় চশমার কাঁচ আরও যেন পুরু করে নিয়ে বললেন, মানে ওরা ছেলে আর মেয়ে তো, আপনারই ডেসক্রিপশন অনুসারে বলছি।

—বুঝতে পারছি যা বলতে চাইছেন। কিন্তু রোম্যান্টিক কোনও কিছুর ওই কি স্থান আর কাল? আপনি কাকে বোঝাচ্ছেন দারোগাবাবু, আমার বয়েস অনেকখানি হল, এখানে একটা রেসপনসিবল পোস্টে আছি—

—জানি মিস মিত্র।

—তাহলে ইচ্ছে করে মেয়েটির নেমে যাওয়ার কথা ভুলে যান। তাছাড়া কুয়াশায় ঢুকে গেলে দুজন তো একসঙ্গেই ঢুকবে। লোকটা তো ঢুকত না, আমি স্পষ্ট দেখেছি বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিত।

এতক্ষণে দারোগাবাবু যেন একটু অবাক হলেন, চুরুট ছাইদানে নামিয়ে রেখে বললেন, ফেলে দিত? কথাটার মানে কী মিস মিত্র?

—মানে এই যে, দৃঢ় প্রত্যয়ের গলায় ঊর্মিলা বলল, ঘটনাটা একদিনের না, রোজ ঘটে। কোনও দিন মেয়েটির পরনে মেরুন রঙের, কোনও দিন হালকা নীল, কোনও দিন বা কমলা রঙের শাড়ি, বারান্দা থেকে জ্যোৎস্নায় আমি দেখতে পাই।

—মেয়েটির? তার মানে আপনি বলতে চাইছেন রোজ রোজ একই মেয়ে?

—অন্তত একই রকমের, রাত্তিরে যতটুকু বোঝা যায়। তখন চারধার নিঝুম তো। পাহাড়ীদের পাড়া থেকেও—রকসি খেয়েও ওরা যে মাঝে মাঝে হৈ-হল্লা করে—সেটাও শোনা যায় না, একটা মশালও জ্বলে না।

—শুধু কুয়াশা?

—আর লম্বা লম্বা দেওদার।

তৎক্ষণাৎ একটা ঘন্টা বাজালেন দারোগাবাবু, জমাদারকে ডাকলেন। একটা শিলপে খস খস করে একটা নাম লিখে দিয়ে বললেন, এই লোকটি আপনাকে চকে নিয়ে যাবে, বাস-স্ট্যান্ডের কাছে। সেখানে এই দোকানটা আছে, মালিক আমার চেনা। আপনার চশমার লেন্স আপনি লাস্ট কবে বদলেছেন মিস মিত্র?

রাগে ফুঁসছিল ঊর্মিলা, দাঁতে দাঁত ঘষে সে ইংরেজিতে বলল, বুঝতে পারছেন না ইন্সপেক্টর, এটা একটা মার্ডার কেস, আর আপনি আমার চোখ

নিয়ে—

—রোজই একই মেয়ে, একই মার্ডার?

ঊর্মিলা যখন বারান্দায়, তখনও কামরার ভেতরে পুরু চেয়ারে বসা দারোগা-বাবুর হা হা হাসি তার কানে এল।

॥ তিন ॥

নো, নাথিং রং উইথ ইয়োর প্লাসেস।

চক্ষু-বিশারদ চিকিৎসক একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন। সে জন্যে ঊর্মিলা অবশ্য মনে কিছু করেনি, কারণ মেয়েদের ইমপ্রেস করতে অনেক পুরুষদেরই সে এরকম দেঁতো এ্যাকসেন্টে ইংরাজী বলতে শুনেছে। তদুপরি এই ভদ্রলোকের পরনে আবার খড়খড়ে ক্রীজওয়ালা জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স, সুতরাং একটু বিলিতি চালের বুকনী পেখম মেলবেই তো। সেই সঙ্গে ভদ্রলোকের সোনা দিয়ে বাঁধানো মাঝের একটা দাঁত। সেটা দেখতে ঊর্মিলার তেমন খারাপ লাগে নি। বরং ডাক্তারের হাসিটাকে আর একটু ঝকঝকে, আর একটু পরিস্রুত বোধ হচ্ছিল।

ঊর্মিলা ধমক দিল নিজেকে। যেন সে আর সেই মুহূর্তে ঊর্মিলা নামে কোন টিচার নয়, ঊর্মিলা নামের এক ছাত্রী। টিচাররা যে ভাবে ছাত্রীকে বকেন, সেই ভাবেই নিজেকে সে এই বলে বকতে থাকলঃ 'চোখের পাওয়ার দেখাতে এসে তুমি ডাক্তারের চেহারা আর হাসি টাসি দেখছ? এ তো ভাল নয় ঊর্মি, এ তো ভাল নয়। এই ডাক্তার চক্ষু-চিকিৎসক বটে তবে ওর নিজের চোখের কোন দোষ নেই, নইলে চশমা পরতেন। কিংবা এও হতে পারে, চশমা আছে কিন্তু পরেন নি যাতে ওকে একটু যুবক যুবক দেখায়। বয়স ঢাকতে কে-ই বা না চায়। কেউ স্নো-পাউডারের ফাউণ্ডেসনে, কেউ বা চুলের কলপে, কেউ বা চশমার কাচে বা বিনা কাচে। কিন্তু চক্ষু-চিকিৎসাই এর উপযুক্ত বৃত্তি। এমন প্রদীপ্ত চোখ বড় দেখা যায় না। চাউনি তো নয়, যেন তীর। মাঝখান দিয়ে ধারালো নাকটা একটা খাঁড়ার মত থেমে আছে। শ্রদ্ধা হয়।'

—আমার চশমায় কোন গোলমাল নেই, বলছেন?

ঊর্মিলা এতক্ষণে উত্তর দিতে পারল।

—তবে কি দোষ আমার দৃষ্টিতে?

—না মিস মিত্র, আপনার আইসাইটেও কোন গোলমাল আছে বলে মনে হচ্ছে না।

—তবে যা দেখি, ঠিকই দেখি?

—ঠিকই দ্যাখেন।

চোখের ডাক্তারবাবু হঠাৎ যেন হাকিম হয়ে গেছেন, এই ভাবে রায় দিলেন। আর ততক্ষণে হৃষ্ট, উৎফুল্ল, মনের ভারমুক্ত ঊর্মিলা টেবিলের উপরে ভিজিটের

নোটটাকে রেখে যেন লাফাতে লাফাতে বাইরে বেরিয়ে এল। যেন সে আজ মধ্যবয়সিনী কোন ভারিক্কি মহিলা নয়, হঠাৎ তরুণী, হঠাৎ হরিণী।

বাইরে জীপটা তখনও অপেক্ষা করছিল। সেটা নিল না ঊর্মিলা। সোজা গিয়ে ঢুকল একটা কাপড়ের দোকানে। তারপর গোটা কয়েক শাড়ি কিনে ফেলল সে। পাশাপাশি সব ক'টাকে সাজালে বা ওয়ার্ডরোবে ঝুলিয়ে রাখলে আস্ত একটা রামধনু তৈরি হয়। তফাত এই, রামধনু রং কাঁপে, রামধনু মিলিয়ে যায়, কিন্তু এই সব রংবেরংয়ের শাড়ি খালি মনের মধ্যে ওড়ে, রংয়ের পর রং ছড়ায়। সেখান থেকে ঊর্মিলা ওই একই দোকানের জেন্টস সেক্সনেও গিয়ে ঢুকল।

সোজাসুজি ওপরের আকাশের দিকে চাইছিল ঊর্মিলা, কই, চোখ ঝলসে যাচ্ছে না তো? তবে ঠিকই বলেছিলেন ডাক্তারবাবু, আমার আইসাইট ঠিকই আছে। অথচ এই চোখদুটোকে নিয়ে মানুষের কত ভাবনা, কত ভয়। সূর্য-গ্রহণও দেখে পাথরের বাটিতে জল রেখে, কিংবা আতস কাঁচে। আজ কুয়াশা নেই, এই পাহাড়ী শহরে সূর্য দিব্য দীপ্তিমান। এমন যে প্রচণ্ড এমন যে মার্তণ্ড তারও কিন্তু গ্রহণ হয়। হয়তো এইটেই নিয়ম এইটেই জীবন, চরাচরের আলোয় আলোকময় অধীশ্বরও যার ব্যতিক্রম নয়।

সুতরাং তারও গ্রহণ হয়। আর সেই গ্রহণ, হয় পাথরের পাত্রে নয়তো আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে আমরা দেখি। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই রূপক হতে পারে। সত্যকে সোজাসুজি দেখা শক্ত, তাই আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখি।

কিন্তু কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা তাই জানা হল না যে। জানতে জানতে জীবনের প্রায় আট-ন' আনাই বয়ে গেল। তাতে দুঃখ আছে, কিন্তু বিস্ময় নেই। নদীর অদৃষ্টও তো এমনই। সমুদ্রকে যখন সে পায়, যখন সে জানে, ততক্ষণ সে নিজেই নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়। আমরা নারীরাও তো নদী, তাই না?

॥ চার ॥

একটু অনামনস্ক ছিল ঊর্মিলা। নইলে চশমার দোকান থেকে বেরিয়েই সে একটা বাঁকের মুখে সাকসেনা সাহেবের মুখোমুখি পড়ে যেত না। যখন ভদ্রলোককে দেখতে পেল, তখন আর পাশ কাটানোর উপায় নেই। একে তো এই জায়গাটা উৎরাই, ফলে টাল সামলানোই মুশকিল, হঠাৎ থামতে গেলে একেবারে হুমড়ি খেয়ে সোজা গড়িয়ে যাবার ভয়। সাকসেনা সাহেব ততক্ষণে ওকে একটা নমস্কার পর্যন্ত করে ফেলেছেন। আর নমস্কার এমন একটা জিনিস যা হাতে-হাতে ফিরিয়ে দিতেই হয়।

ঊর্মিলাও দিল, কিন্তু রোদ্দুরে ওর চোখের পুরু কাঁচ ঝলসে যাচ্ছিল বলে সে সৌজন্যসূচক একটুখানি হাসিও গুঁজে দিল কি-না (সেকালে সাজা পানের

সঙ্গে যেভাবে একটা লবঙ্গ গেঁথে দেওয়া হত) বোঝা গেল না।

লোকটি এখানকার বনবিভাগের বড়কর্তা। সাহেব না বললে ক্ষুণ্ণ হন। সেকথা ঊর্মিলা প্রথম দিকেই ওর সহকর্মীদের কাছে শোনে, বিশেষ করে সুমিতার মুখে। সুমিতা কমবয়েসী, ছোট্টটি খাট্টোটি, হাসিখুশি একটি মেয়ে, বিলিতী বইয়ে এদেরই বুঝি বলা হয় স্লিপ অফ এ গার্ল, উপরন্তু সে-ও কোয়ার্টার পায় নি বলে ফরেস্ট বাংলোতে ঊর্মিলার পাশের কামরাটিতে আছে।

একদিন বেশ ভোরের দিকে, সে তখনও রাতকাপড় বদলায়নি, সবে জমাট কুয়াশা গলতে শুরু করেছে কি-না দেখতে বারান্দায় এসেছে, হঠাৎ দ্যাখে সাকসেনা সাহেব একেবারে বারান্দাতেই উঠে আসছেন। গা একটু কেঁপে ওঠে, ভদ্রলোকের যখন-তখন যেখানে-সেখানে অকস্মাৎ প্রকট হওয়ার কায়দা রীতিমত যাকে বলে আনক্যানি, প্রায় ভুতুড়ে।

—চমকে উঠলেন নাকি, মিস মিত্র? গুডমর্নিং।

থতমত খেয়ে ঊর্মিলা বলল—গুডমর্নিং। না, চমকাব কেন।

গলার স্বর তার তবুও যেন কতকটা জড়ানো, যেন স্বর নয়, ওটা আর শরীর যাকে ঊর্মিলা উলের জামায় সাটিনের পেটিকোটে আর শাড়িতে যতদূর পারে, যত কম ফাঁক রেখে পারে, জড়িয়ে নিয়েছে।

—আপনি যে এত সকালে সাকসেনা সাহেব?

একটা ব্যথার ছবি ফুটল সাকসেনার বয়স্ক কপালে, কুঞ্চিত চোখের কোলে। মাথার গরম টুপিটা চট করে তিনি যে খুলে ফেললেন, ওটা বোধহয় কোনও স্নায়বিক দুর্বলতাবশত। নইলে সাকসেনা চট করে তার মাথার মাঝখানে যে ছোট্ট একটা ক্রিকেট খেলার পীচ তৈরি হয়েছে, সেটা সবাইকে দেখাতে চান না।

আহত গলায় সাকসেনা বললেন, আপনিও আমাকে সাহেব বলছেন, মিস মিত্র? ভাগ্যিস ঠিক তখনই খুব কনকনে ছুঁচ ফোটানো হাওয়া দিতে শুরু করল, ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা বলা অসম্ভব। সাকসেনা কাঁপছিলেন ঠক ঠক, স্কুলের বিষয়ে দু-চারটে মামুলি কথা বলেই তিনি তাড়াতাড়ি অন্য দিকে প্রস্থান করলেন।

ঊর্মিলা ঘরে ঢুকতেই তাকে চেপে ধরল সুমিতা। সে-ও পিছু পিছু এসেছিল।—ওই বুড়ো দামড়া লোকটা তোমাকে কী বলছিল ঊর্মিলা? হাসিতে উপচে পড়ছে সুমিতার দুটো চোখ, ও যখনই হাসে তখনই এইরকম দেখায়, মনে হয় কৌতুক নাচতে নাচতে চোখের মণি দুটো কখন না ঠিকরে বেরিয়ে আসে, কিন্তু কমবয়েসী মেয়েদের সবই মানায়, হায়। এমন কী সুমিতা যখন হাসি চাপতে ওর খিল-ধরা তলপেট চেপে ধরে, একটু ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে, তখনও দৃশ্যটা খারাপ লাগে না তো!

—বল না ঊর্মিলি, কী বলছিল লোকটা?

—সাহেব বলতে মানা করছিল।

—কী বলতে হবে তবে? প্রাণেশ-টানেশ বলতে বলে দেয় নি তো? হিন্দী ছবিতে তো আজকাল হামেশাই ডার্লিং কথাটা শোনা যায়।

—তুই বড় ফাজিল হয়েছিস সুমি। ওসব বলতে হবে কেন? শুধু মিস্টার বললেই তো গোল চুকে যায়। গম্ভীর গলায় বলে সটান বাথরুমে ঢুকে গেল ঊর্মিলা। বাসী কাপড় এখনও বদলানো হয় নি।

সুমিতাকে সে ধমকালো বটে, তাই বলে সাকসেনার সম্পর্কে একটুও উচ্ছ্বাস বা ভাবান্তর ঘটেনি ঊর্মিলার। স্কুল নিয়ে মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা বলতে আসেন বটে ভদ্রলোক, কিন্তু তার কাছে কেন, তার কাছে কেন? সেজন্যে তো বড়দিদিমণি রয়েছেন। তিনি রাশভারি, উপরন্তু সেকেলে ব্রাহ্ম কায়দায় 'ফুল-হাতা' ব্লাউজ পরেন, তাই তাঁর ধারে-কাছে এগোনো শক্ত, এই জন্যেই সাকসেনা ঊর্মিলাকে বেছে নিয়েছেন কি?

কিন্তু সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। পুরুষদের চাউনির মধ্যেও যখন একটা সাপ হিস হিস করে ওঠে তখন তাকে চিনতে ভুল হয় না ঊর্মিলার। বয়েস তো নেহাত কম হল না। চল্লিশ হয় নি যদিও তবু এই চশমাজোড়া আসলে চালশের।

সেই মিস্টার সাকসেনা আজ একেবারে বাঁকের মুখে, সরু রাস্তায়, একরকম রাস্তা আগলে।

—কোথায় এসেছিলেন মিস মিত্র?

—এই একটু কাজ ছিল, এখানে।

—এই চশমার দোকানে?

—না, ঠিক তা নয়, আসলে চোখ দেখাতে।

যেন সাংঘাতিক একটা সর্বনাশের খবর দিয়েছে, এমন ভয় পাওয়া মুখভঙ্গি করলেন সাকসেনা।—কই দেখি, ভাল করে আমার দিকে তাকান দেখি।

ঊর্মিলা তাকাতে পারছিল না। সাকসেনা তাঁর হাসিকে এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত ঢেউয়ের মত বইয়ে দিয়ে বললেন, ভাল দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি?

ভালই দেখতে পাই, বোধহয় একটু বেশিই ভাল দেখি সাকসেনাজী।

—উহুঁ, উহুঁ যেন ছোট্ট দুষ্টু ছেলেটি হয়ে গেছেন এমন গলায় সাকসেনা বললেন—আপনি কাছের জিনিস একদম দেখতে পান না।

(তা-ও পাই, ঊর্মিলা এটুকু বলল মনে মনে, এই যেমন তোমাকে হাড়মাস অবধি দেখতে পাচ্ছি। আমার চোখ দুটো রঞ্জনরশ্মি হয়ে গিয়েছে।)

সাকসেনা, নাছোড় সাকসেনা বললেন—মাথা অত নিচু করে চলতে নেই মিস মিত্র, বিশেষ করে এই সব পাহাড়ী শহরে। কখন যে কোথায় ঠোক্কর খাবেন—

(তা-ও হাড়ে-হাড়ে জানি। ঠোক্কর খেলাম তো এক্ষুনি। এখনও খাচ্ছি।)

—মিস মিত্র, আপনি কিন্তু আমার প্রপোজালটা কনসিডারই করলেন না।

বলেছিলাম আমার ওয়াইফকে রোজ দু'ঘন্টা করে একটু ইংলিশ তালিম দিতেন! ও আবার একটু কাঁচা কিনা, সোসাইটিতে যেতে বেজায় অসুবিধে। আপনি তো জানেন, হামেশা কত পার্টি, কত খানাপিনা—

—আমি এবার যাব। ঊর্মিলা বলল মৃদুস্বরে। যতটা সম্ভব ততটা নম্রতাকে একটা পাতলা সেলোফেনের কাগজের মুখোশ তৈরি করে নিয়ে।

—চলুন না, আমিই আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

—না না, মিস্টার সাকসেনা, আপনি আবার কষ্ট করে কেন...তাছাড়া আমাকে এখনও ঘুরতে হবে কয়েকটা দোকানে—অন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে।

—অ্যাপয়েন্টমেন্ট? সত্যিই এবার রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালেন সাকসেনা সাহেব, শুধু ও'র ঠোঁটের কোণে একটা হাসি বাঁকা একটা বঁড়শির মত হয়ে রইল, কয়েক মিনিট আগেও যে হাসি ছিল আকর্ণবিস্তৃত।

॥ পাঁচ ॥

কালো পর্দাটানা অন্ধকার ঘর। ঊর্মিলা সম্মোহিতের মত একটা আধা হেলানো চেয়ারে চোখ বুজে বসে। তার চেতনা ক্রমে ভারি। আধো-অন্ধকারে ছায়ার মত যে মানুষটিকে দেখা যায়, হঠাৎ যেন বিশ্বাসই হয় না সে কোনও একজন স্পেশালিস্ট। ডাক্তার নয়, ঊর্মিলার চেতনা যখন বিকেলের পদ্মের পাঁপড়ির মত বুজে আসছে তখনও সে ভাবছে স্পেশালিস্ট নয়, ডাক্তার নয়, এই লোকটা বোধহয় কোনও একজন জাদুকর। সেই যারা করাত দিয়ে একেকটা মেয়ের গলা চিরে ফেলে ফের কাটামুণ্ড জোড়া দেয়, এ-ও তাদেরই একজন।

এই লোকটিও তাকে কাটবে নাকি? কাটুক, কাটুক না! যা খুশি করুক। পরে ফের মুণ্ডুটা ধড়ে বসিয়ে দিতে পারবে তো? নইলে ঊর্মিলা ফিরবে কী করে, ক্লাস নেওয়াও কঠিন হবে। শুধু ধড় নিয়ে কবন্ধ হয়ে টীচারি করা যায় না।

আবার এ-ও ঠিক, জোড়া না দিল তো বয়েই গেল। ঊর্মিলার জীবনের বাকিই বা কী! তাছাড়া চোখ দুটো তো মাথাতেই বসানো থাকে। সেই মাথা যদি যায়, তবে তো চোখ দুটোও সহমরণে যাবে, অন্তত প্রতি শেষরাতে সেই বীভৎস দৃশ্যটা আর দেখতে হবে না। ভাবতে ভাবতেই ওই আচ্ছন্ন আবিল জলের তরলতায় ডুবতে ডুবতেও ঊর্মিলা সমস্ত শরীরে যেন সজারু হয়ে গেল। সজারু, না ক্যাকটাস? বাইরের পরিবেশ আর প্রকৃতিকে সবচেয়ে বেশি ভয় কার? একটি চলন্ত প্রাণীর, না স্থির একটি উদ্ভিদের? বিচারের দরকার নেই তো, যখন দুজনের মধ্যেই মস্ত একটা মিল—সারা গায়ে কাঁটা।

· কিন্তু লোকটা ওর চোখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে কী করছে? বলছেই বা কী? না, এ তো জাদুকর নয়, এ যেন কোনও পুরুত, জ্বালানো ধূপদানী হাতে নিয়ে যে ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার মণ্ডপে আরতির খেলা দেখায়। লোকটার

হাতে কী বিশ্রী, কী পুরু, কী কালো, কী কর্কশ রোম!! ঊর্মিলার নির্জ্ঞানে আরেকটি রাত্রির বিভীষিকার দৃশ্য ভেসে উঠছিল। শশধর, শশধর, লোকটা এখন কোথায়, রোমশ থাবা তুলে যে হঠাৎ আলো নিভিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে? শুধু বিড় বিড় করে পড়া কয়েকটা মন্ত্রের জোরে? ঊর্মিলা ভয় পেয়েছিল, কেঁদেছিল। সোমত্ত বয়স্কা মেয়ে, সুতরাং পরদিন সকালে তার দেহের কোনও সন্ধিতে রক্ত ছিল না, কিন্তু রক্ত লেগে রইল তার মনে।

বলতে কী, সেই রক্ত মাখামাখির পরে চিটচিটেও হয়ে গেল। পালিয়ে এল ঊর্মিলা, গেল পূর্ণেন্দুর কাছে। সেই শেয়ালদার মেস বাড়িটার চিলেকোঠায়। সিঁড়ি যেন আর ফুরোয়ই না। কী নাটক, কী নাটক!! কত ফিস-ফাস, কত উঁকি-ঝুঁকি, কত চাপা গলার টিটকিরি। তাছাড়া ঊর্মিলাকে তাড়া করে এসেছে সেই বাড়িটা, একবস্ত্রে যে বাড়ি সে ছেড়ে এল। না না, পুলিস নয়, পুলিস নয়, শশধরও নয়, তাড়া করে এসেছে সেই গত রাত্রের ভয়।

পূর্ণেন্দুও শান্ত একটি বন্দর হতে পারল কি? হাঁপিয়ে উঠত পূর্ণেন্দু, মাঝে মাঝে হাল ছেড়ে দিত, ছেড়ে দিত তাকেও। ঊর্মিলাকে ঠেলে দিয়ে বলত, সাড়া নেই, শব্দ নেই, তুমি কি কোনারক না অজন্তা না ইলোরা? তুমি কি পাথর?

—হতে পারি।

—না, তুমি তা-ও না। চিমটি কাটত পূর্ণেন্দু (ওর হাতেও আকীর্ণ রোম), বলত এই তোমার রক্ত, এই তো তোমার মাংস, এই তোমার রগ। দিব্যি তো শিউরেও উঠছ। তবে?

—আমার এসব ভাল লাগে না।

—তবে আমার কাছে এলে কেন?

—ভালবাসি বলে।

খুব ফ্যাকাশে করে হাসত পূর্ণেন্দু, বলত, তুমি কি ভেবেছিলে ভালবাসা মানে শুধু একটুকু ছোঁয়া আর একটুকু চাঁদের আলো? অল্প অল্প দক্ষিণা বাতাস? এই সব? ভালবাসার এ-ও যে একটা অপরিহার্য দুর্নিবার দিক, তুমি জানতে না?

—কেউ জানায় নি, কেউ শেখায় নি।

—কাউকে জানাতে হয় না, কাউকে শেখাতে হয় না। একটা বয়েসই মানুষকে শেখায়, যেমন পুরুষকে, তেমন মেয়েদের।

—আমার ঘেন্না করে।

উঠে বসত পূর্ণেন্দু, একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার দিকে মুখ রেখে যেন বাইরের বাতাসকে বলত, আমিও তাই ভেবেছি। তুমি রক্ত-মাংসের, ঠিকই। তুমি যখন নগ্ন, আমিও তা-ই, আমাদের দুজনের মাঝখানে কিছু নেই, তখনও কী যেন আড়াল তুলে ওই মাঝখানটাতেই শুয়ে থাকে। তারই নাম কি ঘেন্না দিয়েছ?

—কিংবা ভয়।

ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর দিত ঊর্মিলা।

অতএব ওই সহবাসও টেঁকেনি, টিঁকল না, টিঁকতে পারে না। পূর্ণেন্দু চলে গেল আমেরিকায় আর ঊর্মিলা অনেক ঘাটের জল খেয়ে খেয়ে অবশেষে এখন এই পাহাড়ী শহরে। একেবারে একা।

একা বোধহয় নয়, সেই সঙ্গী তো সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে, যার নাম সেদিন ছিল ভয়। সে আবার আরেকজন সঙ্গী জুটিয়েছে আজকাল। অদ্ভুত দৃশ্য দেখানোর কৌশল। সেই যে ছেলেবেলায় একটা চোঙে চোখ রেখে ইনিয়ে বিনিয়ে বলা ছড়া শুনত না—'দিল্লী দেখো, লাহোর দেখো, লাটসাবকো কোঠি দেখো'? আজকাল আর কোনও চোঙে চোখ রাখতে হয় না। সাদা চোখে বড়জোর চশমা এঁটে নিয়ে শেষরাতে বারান্দায় দাঁড়ালেই ঊর্মিলা ভীষণ সব কান্ড দেখতে পায়।

এত কথা কী ঊর্মিলা কোনও মহাসাগরের তলায় জলকন্যার মত চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবছিল, নাকি জলে যেমন বুদবুদ আর ফেনা ওঠে, ওই জাদুকর ডাক্তার তার মুখ থেকে আদায় করে নিচ্ছিল তেমনই? অথচ, কী আশ্চর্য, ঊর্মিলা বিন্দু-বিসর্গও টের পায় নি।

খানিক পরে আলো জ্বলল যখন, ঊর্মিলা আস্তে আস্তে চোখের পাঁপড়ি খুলল। সামনে সেই ফিটফাট পোশাক পরা স্পেশালিস্ট। তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন।

ধড়মড় করে উঠে বসল ঊর্মিলা। শরীর ভারী, তবু সমস্ত মনের জোর হাঁটুর গিঁটে নামিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। লজ্জিত গলায় বলল—কিছু মনে করবেন না, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—লজ্জা পাবার কিছু নেই। যা বলার সবই আপনি বলেছেন। টেপ করা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। খালি একটা গ্যাপ রয়ে গেল, আপনার বাবা আর মা-র সম্পর্কের কথাটা।

—ছি ছি ছি! কানে আঙুল দিল ঊর্মিলা।

—সেটাও দরকার মিস্ মিত্র। এ-সব জিনিস অনেক সময় পরিবেশজাত, অনেক সময় নিজস্ব অভিজ্ঞতাসঞ্জাত, বাট ইন সাম নোন অ্যান্ড রেয়ার কেসেস, কম বয়েসের মনের পাতলা কাগজে মুদ্রিত। যাই হোক, হয়তো এতেই আমাদের কাজ হবে, নইলে, আনলেস ইউ আর ট্যু রিলাকটেন্ট্, বড়জোর আরেকটা সিটিং।

তখনও ঘোর কাটেনি, ঊর্মিলা বলল—বলেছি, আমি কিছু বলেছি? আমার তো ধারণা আমি স্বপ্নে তলিয়ে গিয়েছিলুম। স্বপ্নের মধ্যেই ছিলুম।

—সত্যির মধ্যে ছিলেন, তা-ও তো হতে পারে মিস মিত্র!

এই প্রথম যেন একটা বন্ধ ঘরের চাবি মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল ঊর্মিলা। টলতে টলতে চলে গেল পাশের ঘরে, যেখানে বেসিন, যেখানে কল। আয়নায়

দেখল ওর নাকের বাঁশি আরও যেন স্ফীত, চোখের তারা দীপ্ত, আর ঠোঁটের কোণে ফেনা, সেই ফেনা।

ওর বলে দেওয়া কথাগুলোই কি জমাট বেঁধে ফেনা হয়ে রয়েছে? ঊর্মিলা জোরে জোরে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে থাকল। কোনও চিহ্ন নয়, যেভাবে তার এয়োতির দাগ একদিন ঘুচিয়েছে ঠিক সেই ভাবেই এই ফেনা হয়ে জমে থাকা দুর্বলতা আর স্বীকারোক্তিকে মুছে ফেলতে হবে।

কী জানি কী, ওই স্পেশালিস্ট যা বললেন তাই কি সত্যি? সত্যিই কি একটা আতঙ্ক তার স্মৃতির পটে গাঢ় রঙে আঁকা হয়ে আছে? এই আতঙ্কের কোনও ভিত্তি নেই?

সুমিতাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। কাঁচ মেয়ে, বিয়ে হয়েছে সবে, এখনও প্রত্যেক উইক এন্ড-এ সে এই পাহাড়ী শহর থেকে নিচে নেমে ছুটে ছুটে যায় তার বরের কাছে। ঘন ঘন ক্যাজুয়াল ছুটিও নেয়। ফলে ঊর্মিলাদের ওপর ভীষণ কাজের চাপ পড়ে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেও যে ভয়। চপল মুখরা মেয়েটা যদি মুখের উপরেই হেসে ওঠে! ওর জ্বলজ্বলে সিঁদুরের দাগটা দেখিয়ে বলতে থাকে, তুমি একেবারে বোকা ঊর্মিদি। আমাদের হেডদিদিমণির চেয়েও সাবেকি আমলে বাস করছ। ঊর্মিলা বলবে—তাহলে তুই বলছিস ভয় নেই? উত্তরে সুমিতা যদি বলে, থাকবে না কেন, নিশ্চয় আছে। ভয় আছে জলে নামায়, উড়োজাহাজে চড়ায়, বাঘ-ভল্লুক শিকারে—কিসে নেই? অথচ সেই ভয়টাই কি ক্রমে ক্রমে একটা মজা, এমন-কী নেশা, শেষ পর্যন্ত সুখও, হয়ে যায় না? ওইটেই তো আসল, ঊর্মিদি। জীবজন্তু প্রাণীর মত মানুষের মনের আঁকি-বুকিরও ধীরে ধীরে বিবর্তন। ইংরেজিতে ইভোলিউশন বলে যে কথাটা আছে সেটাকেই বাংলা করে তোমাকে বোঝালাম।

—বুঝলাম তো সবই। ক্লান্ত একটা হাই তুলে ঊর্মিলা অবশেষে বলবে, কিন্তু আমার যে ভয় যায় না, সুমি। সেই কম বয়েস থেকে, আজ পর্যন্ত গেল না, যায় নি। হয়তো যাবেও না।

খিল খিল করে হেসে উঠবে সুমিতা। বলবে, কী হবে আর কী হবে না, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। ভাবছ, সারা জীবন তুমি একটা ভয়ের সঙ্গে শোবে, তারই সঙ্গে ঘর করবে? তা হয় না ঊর্মিদি, অন্তত না-ও হতে পারে। কত আশ্চর্য আশ্চর্য ম্যাজিক ঘটে আমাদের জীবনে। (বাচ্চা মেয়েটা এত জ্ঞানও দিতে পারে।) সুমিতা থামবে না, বলেই চলবে, না ঊর্মিদি, না-ও হতে পারে। কবে হয়তো ওই ভয়টাই আস্তে আস্তে ভোল বদলে তোমার ভিতরে ইচ্ছে হয়ে যাবে। কিংবা হয়তো গিয়েছেও, তুমি জান না। দেখবে যা চাইতে না তা চাইছ, যার দিকে চাইতে পারতে না তার দিকে চোখ মেলে তাকাচ্ছ।

॥ ছয় ॥

খাড়াইয়ের রাস্তা, সেই খাদটার পাশ দিয়ে উঠতে হয়। মোটরের রাস্তা শহুরে কিনা, ঘোর-প্যাঁচে ভর্তি। কিন্তু পাকদণ্ডি আদিম, তাই সোজা উঠে গেছে।

হাতে প্যাকেট, ঊর্মিলা ইচ্ছে করলে একটা ল্যান্ডরোভার ভাড়াও করতে পারত (এই ছোট্ট শহরটায় 'পুশ্‌পুশ্‌' নেই), কিন্তু সে ঐ সূর্য মাথায় করে পাকদণ্ডির সিধে রাস্তাটাই বেছে নিল। বড় ঘাম, বড় বুক ধড়ফড়, হাঁটুর গিঁটে গিঁটে যেন অশ্রুত একটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ, অনেকদিন তেল না দেওয়া মেশিনে যেমন হয়, পূর্ণেন্দু, এঞ্জিনীয়ার পূর্ণেন্দু তাকে সব বলত। সেই পূর্ণেন্দু, যে তাকে মোটে কয়েকটি চুমুকে শেষ করে চলে গেছে মিনেসোটায়। যে-ভাবে সে রক্তাভ পানীয়ের পাত্র দু-চার ঢোঁকে শেষ করে ঠকাস করে রাখত টেবিলের উপরে, হঠাৎ ঊর্মিলার এই মুহূর্তে নিজেকে তেমনি একটা শূন্য গ্লাস বলে মনে হল। সিঁটিয়ে উঠল গা, ঘেন্না হল।

কারণ তার কানে হঠাৎ যেন টেবিলে গেলাস রাখার ঠকাস শব্দটা ভেসে এল। গেলাস তো নয়, সে।

আমি তবে এই, আমরা তবে এই? পাথরের চাঁই ভাঙতে ভাঙতে, উঠতে উঠতে ঊর্মিলা এই সব ভাবছিল। তার আত্মগ্লানি স্বেদের মত গলিত হয়ে মুখে ফুটে বেরুচ্ছে, তার চোখ-মুখ লাল।

আর একটু পরে যখন সে ফরেস্ট বাংলোয় তার ঘরের একেবারে সামনে তখন ঊর্মিলা ভুলটা ধরতে পেরেছিল। একটু দূরে সেই জায়গাটা ছায়াচ্ছন্ন, কাঠুরেরা কাঠ কাটছে। খট্ খট্ খটাসের মানেটা তখন স্পষ্ট হল। ঐ শব্দটা তবে সে নয়।

এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই বিকেলে সামনের খাদটাও স্পষ্ট দেখা যায়। যেন মৃত্যুর মত, একটা চক্রান্তের মত হাঁ হয়ে আছে। এখন আর কোন কুয়াশার অস্পষ্টতা নেই। দিনের রোদ্দুর বড় লোভী আমানতকারী। খাদের ব্যাংকে জমা দেওয়া যত কুয়াশা সব তাড়াতাড়ি তুলে খাদটার ভাঁড়ার ফাঁকা করে দেয়।

কুয়াশা জমে কখন? দিনের যত বয়স বাড়ে, বেলা যত গড়ায়, তখন। কথাটা হয়তো মানুষের বেলাতেও সত্যি, বিশেষ করে মেয়েদের। কুয়াশা মানে তো ভুল, কুয়াশা মানে তো ঝাপসা একটা ভোর। কিন্তু সেই ঝাপসা আবরণটাকেও তখন মনের চারপাশে জড়িয়ে নিতে সাধ হয়। নইলে বাঁচা যায় না। পূর্ণেন্দু, পূর্ণেন্দু তোমার পাঠানো হাউসকোটটা আমি তো সেইজন্যেই ফেরত দিইনি। সারা গায়ে এক্ষুনি জড়িয়ে নেব। রোজ জড়াই, তুমি যেদিন চলে গেছ সেদিন থেকেই জড়িয়ে যাচ্ছি।

॥ সাত ॥

ঘরের সব ক'টা আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল ঊর্মিলা। ওর গায়ে কিছুই ছিল না। মনের উপরে যার পরতের পর পরত রোমশ কম্বল তার বাইরের পোশাক লাগে না।

বালবগুলো প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে আছে? ওরা দেখছে? দেখুক দেখুক, যত খুশি দেখে নিক না, এখুনি ওদের দেখার দফা সারা করে দিচ্ছি!

সামনে একটা আয়না। ঊর্মিলার মাথার চেয়েও উঁচু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে দেখে নিল, রাত এখন মোটে আড়াইটে। আড়াইটে কি রাত না ভোর? সাহেবরা বলে ভোর। পূর্ণেন্দু এখন যে সাহেবদের দেশে, সেখানে।

কিন্তু কোনও রাত কখনও কি ভোর হয়? ঊর্মিলা জানে না। আজ জানবে। সামনের ঐ মিথ্যুক আয়নাটা তাকে কিছু জানায় না। আজ ওকে দিয়ে সব কথা ঊর্মিলা বলিয়ে নেবে। পাওনাদার যে ভাবে জবরদস্তি উসুল করে নেয়, সেই ভাবে।

দুপুরে চকবাজারের সেই দোকানের জেন্টস্ সেকসন থেকে যা যা কিনেছিল সব এখন ঊর্মিলার গায়ে। আস্তে আস্তে, একটি একটি করে, সযত্নে সব পোশাক পরে নিল সে। আয়নাটাকে বলল, 'পূর্ণেন্দুকে বোল তাদের জাতের পোশাক অঙ্গে যে তুললাম এ শুধুই শখ করে। এটা আমার অঙ্গীকার বলে সে যেন ভুল না করে।'

—বল তো আয়না, মাথায় একটু খাটো লাগছে বটে, কিন্তু এই পোশাকে আমাকে কি অবিকল পূর্ণেন্দুর মত ঠেকছে না? চুল? আমার সেই দীঘল চুল তো আর নেই, যা দিয়ে পূর্ণেন্দু এবং তারও আগের কোনও কোনও পুরুষ গলায় ফাঁস জড়াতে চাইত? এখন ওর চুল লম্বা, আমারটা ছাঁটা। ইউনিসেক্সের জামানা কিনা—হা, হা।

—আয়না, এই হাসিটা শুনে তুমি ভয় পেও না। আমি একটুখানি খেয়েছি শুধু। একেবারে মেডিকেল ডোজে। আমার রক্তাল্পতার কারণে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসনে যেটা কিনে রাখি। কিন্তু কিন্তু, আজ তো আমি স্বাস্থ্যবিধির গরজে খাইনি, খেয়েছি যতটা পারি ততটা পূর্ণেন্দু হতে। চোখের কোণ একটু লালচে হবে, ঠোঁট একটু বেঁকে যাবে। কিন্তু গালের কপালের রগ আর পেশীগুলো হবে পাথুরে কঠিন—বর্ণনাটা ঠিক হল না?

বলতে বলতে ঊর্মিলা নিজেই যেন ভয় পেল। হয়তো ভোলটেজ ড্রপ করেছিল, ঘরের আলোগুলো হয়ে এসেছিল নিস্তেজ, আয়নায় আয়নাকে—কিংবা আয়নাটাকে সাক্ষী রেখে আসলে পূর্ণেন্দুকে—চিৎকার করে বলে উঠল ঊর্মিলাঃ পূর্ণেন্দু, পূর্ণেন্দু এ কি চেহারা হয়েছে তোমার? তোমাকে অবিকল ঐ লোকটার মত লাগছে, এখুনি যে চিতাবাঘের মত চোখ জ্বালানো জীপ হাঁকিয়ে আসবে, সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠা রাস্তা বেয়ে বেয়ে কুয়াশায় কানা এই খাদটার সামনে দাঁড়াবে। পূর্ণেন্দু, তোমার লজ্জা হচ্ছে না?

ঠিক তখনই দূরের গির্জায় ঢং ঢং ঢং তিনবার। ঠিক তখনই একটা আক্রোশে আবিষ্ট জীপের ধস ধস গর্জন। আয়নার কাঁচে ঠোঁট ছুঁইয়ে ঊর্মিলা ফিস ফিস করে বলল—সেই লোকটা, পূর্ণেন্দু, সেই লোকটা। সে অবিকল তোমার মত, কিংবা তুমি তার মত। লজ্জা হয় না?

বলতে বলতে প্যাণ্টলুন শার্ট ইত্যাদি খুলে ফেলল ঊর্মিলা, সারা গায়ে জড়িয়ে নিল মেরুন রঙের শাড়ি। পছন্দ হল না। তখন বদলে পরল কমলা রঙের একটা। তারপর খয়েরী, বাদামী—আজ যত ক'টা শাড়ি কিনে এনেছিল একে একে তার প্রত্যেকটি।

দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল সে। শুধু তখনও তার হাতে একটু আগে ছাড়া পুরুষের ট্রাউজার্স। বুক ভরে ভরে তার আঘ্রাণ নিতে নিতে ঊর্মিলা বলল, জানো পূর্ণেন্দু, তোমার মত দেখতে লোকটা। একটু পরেই একটি মেয়েকে ঐ কুয়াশায় ঢাকা খাদের মধ্যে ঠেলে ফেলে দেবে। সে কি তুমি?

বলতে বলতেই সারা গায়ে শিউরে উঠল ঊর্মিলা। তার শরীরের প্রতিটি রোম যেন উদ্‌গ্রীব উৎসুক হয়ে ভয়ানক একটা দৃশ্যের এবং তার চেয়েও ভয়ানক কোনও আবিষ্কারের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বারান্দায় তখন মরা মরা চাঁদের আলো। দিন বুঝে এই চাঁদটাও যেন এই তিথিটিকেই মরার জন্য বেছে নিয়েছে। অন্ধকারে রেলের এঞ্জিন যেমন তীক্ষ্ণ হুইসিল দেয়, সেই হুইসিলের স্বরে তীব্র তীক্ষ্ণ সূচীবৎ চিৎকার করে উঠল ঊর্মিলা।

জানি না পূর্ণেন্দু, ওরা আজ আসবে কিনা। এখনও এল না। কিন্তু আসে। এই তোমাকে ছুঁয়ে আমি বলছি, ওরা আসে।

বলতে বলতে আবার পুরুষের পোশাকটাকে বুকে চেপে ধরল ঊর্মিলা, শার্টের বোতামে কলারে ঠোঁট ছোঁয়াল। চাপা গলায় বলে গেল, 'হয়তো তুমি এলে বলেই ওরা আর এল না। কিংবা কী ভয়ানক ব্যাপার বল তো পূর্ণেন্দু! ঐ লোকটা যদি তুমি হও, তবে আজ কমলা কাল মেরুন রঙের শাড়ি পরা মেয়েটা তো আমি। তবে?'

একটুখানি দম নিয়ে এই 'তবে'টারও মানে ঊর্মিলা নিজেই করে গেল। হয়তো তোমার দোষ নয়। দোষ বল গুণ বল, শিল্প বল, কুরুশকাঁটায় কিছু বুনে চলা বল, সবই আমার। আমিই বানাচ্ছি, আমিই ঝাঁপ দিচ্ছি। কেউ আমাকে ঠেলে দিচ্ছে না তো। ওটা আমার কল্পনা। ঐ কুয়াশাটা স্বপ্ন। কিংবা তোমরা তো পণ্ডিত—স্বপ্নের প্রতীকও বলতে পার। যে রোমান্স যে বাসনা আশা এ জীবনে পূর্ণ হয়নি, যৌবন জ্বলে গেছে, তাকে এই শুকনো বয়সে খুঁজে পেতে একটু ভিজে কুয়াশার ভিতরে ঢুকি। মৃগয়া কি শুধু পুরুষেরাই করে? মেয়েরাও করতে পারে। কে জানে আমি হয়তো স্বপ্নের মৃগয়া, স্বপ্ন শিকার করে চলেছি।

ঐ শোন সাড়ে তিনটে বাজল। একটা ঢং। সময় মানে পাহারাদারের বুটের আওয়াজ। সত্যকে পেলাম না বলে আমি স্বপ্ন শিকার করে চলেছি, তোমাকে

একটু আগে বললাম না? কিন্তু স্বপ্ন? স্বপ্নই তো? তাই বা কে জানে! আমরা জীবনটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে নিই। যেমন দিন আর রাত্রি, তেমনি সত্য আর স্বপ্ন। সত্যকে বলি খাঁটি, আর স্বপ্নকে বানানো। কিন্তু কোন্‌টা যে সত্যি আর কোন্‌টা যে বানানো তার প্রমাণপত্র কী? দিনে আলো আছে বলে সেটাই ঠিক আর রাত্রিটা অন্ধকার বলে সেটা মিথ্যা—কই, এ কথা তো কেউ বলে না। এমনও তো হতে পারে যেটুকু সময় আমরা ঘোরে বা ঘুমে থাকি সেটুকুই বেঁচে থাকার সবচেয়ে সেরা সময়। জেগে থাকি শুধু ঘুমের অপেক্ষায়। আর যাকে সত্য বলে জাহির করি, আসলে সেটাই খুব মামুলি কর্কশ পাথুরে আর নীরস।

তবু পূর্ণেন্দু,—ওই বারান্দার শেষ রাত্তিরের আলোয় ঊর্মিলা একা একা বলে গেল, একটা সত্যিকার সত্যও আছে। সেটা জীবনে নেই, আছে মৃত্যুতে। মৃত্যুই অমোঘ সত্য, আর কে জানে, মৃত্যু হয়তো মহত্তর বিস্তৃততর নীলিমতর জীবন?

এতখানি বলে হাই তুলল ঊর্মিলা। বলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে পূর্ণেন্দু। আমি এবার সেই সত্যের মধ্যে যাব। যাই।—এই বলে পুরুষের পোশাকটাকে আরও একবার বুকে চেপে পরমুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঊর্মিলা টলতে টলতে তার কামরায় ঢুকে দরজায় খিল তুলে দিল।

সুমিতা কাছে-পিঠে ছিল না। থাকলে হয়তো চাবির ফোকরে উঁকি দিয়ে আরেকটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখত।

বিছানার উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ঊর্মিলা, পিঠে আঁচল নেই, তাই তার থেকে থেকে ফুলে-ওঠা স্পষ্ট দেখা যায়। কানে শোনা যায় বালিশে মুখ গুঁজে ঊর্মিলার ফোঁপানি। মাঝবয়েসী মেয়েটি হঠাৎ শরীরে মনে যেন সমুদ্রের মতই আকুল হয়ে গেছে।

জড়ানো গলা, একটু ধরা ধরা, একটু বসা, ঊর্মিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছিল, এ কী হল, আমি নিজেকে যতই ভোলাই, পূর্ণেন্দু আর আসবে না। সে এল না, আসবে না, আর আজ থেকে আমার শেষ রাত্রির ওই স্বপ্ন দেখাটাও শেষ হয়ে গেল? আর কোনও দিন ওই দৃশ্য দেখব না, ওই কুয়াশায় প্রবেশ করব না? এ কী করলেন আপনি, স্পেশালিস্ট ডাক্তারবাবু? মনের চিকিৎসার নামে আমার শেষ সম্বল স্বপ্নটুকুও কেড়ে নিলেন? তার বদলে হাতের মুঠোয় গুঁজে দিলেন আপনারা যাকে সত্য বলেন তা-ই? রস নেই, কষ নেই, এ তো একটুকরো পাথর। আমাকে আমার স্বপ্নটা ফিরিয়ে দিন, ডাক্তারবাবু। এই সত্য আমি চাই না।

শোক

ওরা সবাই হঠাৎ একসঙ্গে এভাবে নেমে গেল কেন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে। বুকের ভিতরটা কেমন করছে।

এ-ঘরে তাসের তুমুল আড্ডা বসেছিল, ও-ঘরে গানের আসর। হঠাৎ কে যেন এসে দাঁড়াল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে কী বলল, চাপা গলা, শুনতে পাইনি। ফিসফিস করে ওরা কী বলাবলি করল। তারপর নিঃশব্দে ব্যস্তভাবে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আর আমি, নতুন আচারের লোভে ভাঁড়ারে ঢুকে কাচের বয়মটা ছুঁয়ে কাঁপতে থাকলাম। কিছু বুঝলাম না, কিছু শুনলাম না, ওরা আমাকে কেন কিছু বলে গেল না, কেন একলা এত বড়ো বাসাটায় আমাকে ফেলে গেল। আমি যে ভাবব, আমি যে ভয় পাব।

এই বে-মেরামতি বাড়িটার জং-ধরা কবজাগুলো খিটখিটে, জানলা-কবাট সব ভীতু, হাওয়ার সাড়া পেলেই খুলে যায়, সরে দাঁড়ায়, ঠকঠক করে কাঁপে। এখন যদি হাওয়া হানা দেয় আমি কী করব। অসহায় পেয়ে সব ধুলো তো আমারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, দু-হাতে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষা কি করতে পারব? হয়তো মরেই যাব। ঝড়ের ঝাপটে নয়, ভয়ে। ডাক্তার বলেছে, আমার কলজে বড়ো ধুকপুকে। স্নায়ু ঝিমোনো। বলেছে কথায় কথায় ভয় পেতে নেই।

তার চেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে যেতে চেষ্টা করি না কেন। হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা দুটো ঠেসে দিই, ছিটকিনি হাতে যদি না পড়ে তবে জানলায় পিঠ ঠেকিয়ে তো দাঁড়াতে পারব!

তা-ও যদি না পারি, তবে অন্তত বসবার ঘরের ওই বুক-কেসটার আড়ালে লুকোব। ওটা মজবুত আছে, সহজে নড়ে না। তারপর, খানিক দাপাদাপি করে হামলাদার হাওয়া যখন পালিয়ে যাবে, তখন আবার হামাগুড়ি দিয়ে ওই অন্ধকার কোণ থেকেই বেরিয়ে আসব। হেলানো-চেয়ারটা তখনও হয়তো ধুলোয় ছেয়ে থাকবে, তা থাকুক।

চেয়ারে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজব। হাঁপাব। জিভটাকে চোয়ালের ভিতরের দেয়ালে বুলিয়ে-বুলিয়ে কিংবা ঠোঁট চেটে-চেটেই পিপাসা মেটাব। পিপাসা যাবে, আমার ভয় যাবে। ভয় যখন যাবে, আমি তখন ভাবব।

আর কিছু তো পারি না, চলতে না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না, পড়তে না, খেতে না, বলতে না, কিন্তু ভাবতে এখনও পারি। সুখের কথা, দুঃখের কথা। পুরনো সুখের কথা ভেবে-ভেবে দুঃখ পাই, দুঃখের কথা ভেবে সুখ।

সিতেশঠাকুরপো বলতেন, একটা জায়গায় পেঁছে দুটোই এক হয়ে যায়। আলাদা করে চেনা যায় না। যেন যুগ্ম স্বরধ্বনি।

কতদিন ভেবেছি, দুঃখ পাবার ক্ষমতাটুকুও যেদিন থাকবে না, তার আগেই যেন আমার মরণ ঘটে। অথবা ঘটবার প্রয়োজনও বুঝি হবে না, কারণ ওই ক্ষমতাটুকু খোয়ানোরই আরেক নাম মৃত্যু।

মৃত্যু আসলে আলাদা কোনো ঘটনাই নয়। সলতে ফুরিয়ে আলো এক-সময়ে নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই কি নেবে? যে-মুহূর্তে জ্বলছিল, সেই মুহূর্ত থেকেই তো নিবেও আসছিল। সলতেটা যখন জ্বলছিল, তখনই পুড়ছিল, একটু-একটু ক'রে নিবছিলও। আমরা যেমন এক-একটি মুহূর্তের মধ্যে একটু-একটু ক'রে বাঁচি, সেই সঙ্গে তেমনই একটু-একটু ক'রে মরিও। আস্তে আস্তে ক'রে ফুরোনোর পালাও একদিন ফুরোয়। সেই শূন্যতাকেই আমরা বলি শব। সব-শেষকে, সব বিয়োগের যোগফলকে ঢেকে দিই শাদা চাদরে; সমারোহে সমাধি দিই।

মৃত্যুর কথা থাক। দুঃখের কথা বলছিলুম, তাই বলি।

অনেকদিন ভেবেছি, শিশু মাটিতে প'ড়েই কাঁদে কেন। তার দুঃখ কী। কেউ জানে না, বড়ো হয়ে সে-কথা কারুর মনে পড়ে না। বিজ্ঞানীরা নানা-রকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এটা তো ঠিক, সৃষ্টির আদিতে যেমন অন্ধকার, অনুভূতির আদিতে তেমন দুঃখ। বোধহয় অন্তেও।

আজ আমার এই চেয়ারে শুয়ে-শুয়ে যখন ঝড় থেমে গেছে, আমার মনের ভয় কেটেছে, তখন আদি, মধ্য, অন্ত্য সব পর্বের কথাই ভাবা যেত। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে—ওরা গেল কোথায়।

ওরা লুকোতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না তো।

জানতে আমার কিছু কি বাকি রইল।

বড়ো বউমা ফিরে এসেছিল সবার আগে। ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আস্তে কবাট ঠেলে ঘরে ঢুকতে যাবে, আমি একেবারে সামনে পথ জুড়ে দাঁড়ালুম।

'মা।' অস্বস্তিতে, ভয়ে ও যেন চেঁচিয়ে উঠল।—'আপনি এখনও ঘুমোননি?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে বললুম, 'এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বউমা?'

কিছুদিন থেকেই কথা জড়িয়ে যায়, নিজের গলা নিজেকেই যেন ভেংচি কাটে, তবু যথাসাধ্য স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলুম।

—'কোথায় গিয়েছিলে বউমা। সুনীল, অনিল, এরাই বা সব কোথায় গেল।'

'সিতেশ-কাকার বাড়ি।'

'সেখানে? হঠাৎ? এত রাত্রে?'

বউমা এবার আমার চোখের দিকে সোজাসুজি চাইল। চোখ নামিয়েও নিল সঙ্গে-সঙ্গে। বুঝলুম, ইতস্তত করছে। আস্তে-আস্তে বলল, 'কাকার

অসুখ।'

'কী অসুখ বউমা ?'

'এমন কিছু নয়। মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন।'

বুঝলুম, মিছে কথা বলছে। মিছে কথার মুশকিলই ওই, কেমন যেন টের পাওয়া যায়। অন্তত আমি টের পাই। অনেক বয়স হ'ল তো, এখন আমি থুনথুনে বুড়ি। অনেক কথা সারা জীবন ধ'রে শুনেছি, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে চট ক'রে ধ'রে ফেলি। বলার ভঙ্গি, স্বরের তারতম্য থেকেই টের পাই।

আমার কথায় কোথা থেকে এত জোর এল জানি না, ব'লে উঠলুম, 'বউমা, আমিও যাব।'

ও অবাক হ'য়ে চাইল। আমার পা দুটি তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। ও বলল, 'মা আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, আপনি যাবেন অতদূর ?'

জেদ ক'রে বললুম, 'যাবই।'

'বেশ, আপনার ছেলে আসুক, তাকে বলবেন।'

ওর গলা রূঢ় শোনাল। রাগ করেছে।

আমি সেই থেকে ঘুমহীন, অপেক্ষা করেছি, ওরা কখন ফেরে, অনিল আর সুনীল। মাঝে মাঝে চোখ জড়িয়ে এল, তবু জেগে রইলুম। ওরা ফিরে এল একেবারে শেষ রাত্রে।

বউমাই দরজা খুলে দিয়ে থাকবে। আমি নিজেকে টেনেটেনে দরজার কাছে নিয়ে গেলুম। ওরা ফিসফিস ক'রে কথা বলছে।

'এখানেই একটু আগুন জ্বালো। এক টুকরো লোহাও ছুঁইয়ে দাও... কাপড়ও তো ভিজে...মাকে এখনই কিছু বোলো না, কষ্ট পাবেন।'

বউমাকে চাপা গলায় বলতে শুনলাম, 'মা কিন্তু আমার ফিরে আসা অবধি জেগে ছিলেন। বারবার জিজ্ঞাসা করছিলেন। ওখানে যেতে চেয়েছিলেন।'

সবই তো জানতুম।

কীভাবে, কখন বিছানায় ফিরে এসেছি, জানি না। চোখের পাতা অল্প অল্প করে বুজেছিল, কী আশ্চর্য, ঘুমিয়ে পড়লুম। কম বয়সে, শখ করে মাঝে-মাঝে নাইতে নেমে জলের নিচে ডুব দিয়ে থাকতুম। যতক্ষণ পারা যায়। এই ঘুমও তেমনি। ভোরে ভাঙল না, রোদ উঠলেও না, ধড়মড় করে যখন উঠে বসলুম, তখন বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে।

বউমাকে বললুম, 'এতখানি বেলা হয়েছে, আমাকে ডেকে দাওনি।'

'আপনি যে ঘুমুচ্ছিলেন।'

'খোকা কোথায় ? ডেকে দাও।'

অনিল এসে পায়ের কাছে বসল। ওর দুটি চোখই লাল। ও-ও কি কেঁদেছে ? এ-বয়সের ছেলেরা কি কাঁদে ? ওদের তো শুধু হাসাহাসি করতেই দেখি। বোধ হয় কাঁদেনি—লাল চোখ দুটিতে শ্মশানে রাতজাগার চিহ্ন।

বললুম, 'খোকা লুকোসনে। আমি সব বুঝেছি। কী হয়েছিল বল তো।

সিতেশ-ঠাকুরপো কী রোগে—'

'রোগ তেমন কিছু নয় তো। ক'দিন থেকেই বলছিলেন, দুর্বল লাগছে। আমাদের এখানেও আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

মৃদু গলায় বললুম. 'হ্যাঁ। ওকে অন্তত চারদিন দেখিনি।'

'হঠাৎ মাথা ঘুরে কলতলায় পড়ে গেলেন। ধরাধরি করে ওরা শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার এল কিন্তু আধ ঘন্টার মধ্যেই সব শেষ।'

'সব শেষ?' আমার স্বর আর্তনাদের মতো শোনা গেল হয়তো, খোকা এগিয়ে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

'রোগটা আসলে কিছু না। এ-বয়সে. মা. বয়সটাই রোগ। শরীর মনের জোর তো থাকে না. সামান্য কিছু হলেই লোকে ভেঙে পড়ে। অসুখটা উপলক্ষ। তা ছাড়া সিতেশ-কাকার সময়ও হয়েছিল. একাত্তর বছরে পড়েছিলেন।'

একাত্তরে? চমকে উঠলুম। আস্তে-আস্তে বললুম. 'এই আশ্বিনে আমারও সত্তর বছর পূর্ণ হবে খোকা।'

খোকা কিছু বলল না। পিঠে হাত বুলিয়েই দিতে থাকল।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসলুম। 'খোকা, আমাকে একবার নিয়ে যাবি?'

'তুমি? তুমি কী করে যাবে। গিয়েই বা কী হবে।'

'নইলে, নইলে আমি যে শান্তি পাব না।'

খোকা বলল. 'ছি. মা. ছি। অতটা ব্যাকুল হতে নেই।'

এতক্ষণ সব আবেগ চাপা ছিল, এবার হাহাকার করে বলে উঠলুম. 'তোরা জানিস না। সিতেশ-ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার কত দিনের চেনা।'

মাথা নিচু করে খোকা বলল. 'জানি মা. সব জানি।'

সব জানে? ও-কথা কেন বলল খোকা। কী জানে. কতটুকুই বা জানা ওদের সম্ভব। কিছু না। হয়তো মনগড়া কয়েকটা ধারণা নিয়ে বসে আছে। একটু আগেও বলেছে—ছি. মা. ছি। ছি বলতে গেল কেন। অন্যায় আমি কী করেছি।

অনেক কথাই মনে পড়ছে।

কবে থেকে চিনতুম সিতেশ-ঠাকুরপোকে। বছরের হিসেব তো নেই—সেই তেরো বছর বয়স থেকেই. যখন আমার বিয়ে হয়েছিল. যখন নাকে নোলক পরতুম। শুধু আমি না. আমার বয়সী সবাই পরত।

সেই সে-কালে মনটা একটু তরল. একটু বায়বীয় পদার্থ ছিল. অদ্ভুত সবকিছুতে বিশ্বাস করত। তখন জানতুম. অনেক কালো বেরাল এক সঙ্গে কড়ায় তেলে চুবিয়ে জ্বাল দিয়ে বিধাতা অমাবস্যার অন্ধকার তৈরি করেন। পুতুলকে তখন প্রাণহীন মনে করতে শিখিনি. তা সে খেলার পুতুলই হোক. কি পুজোর পুতুল হোক।

বিয়ের পর শিবপুজো আর করিনি। স্বামীকে পেলুম। শুনলুম তিনিই আমার শিব। খেলার পুতুলেরা পরে কোলে এল।

আর এলেন সিতেশ-ঠাকুরপো। আমার স্বামীর বন্ধু—কিন্তু বয়সে ওঁর চেয়ে বেশ ছোটো। প্রায় আমার সমবয়সী। বলতে ভুলেছি, আমার স্বামী বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। বাংলার বাইরে ছোটো একটা শহরে চাকরি করতেন—বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর তাঁকে একরকম দেখিইনি।

কিন্তু সিতেশ-ঠাকুরপো আসতেন। স্কুল থেকে জলপানি পেয়ে পাস দিলেন, কলেজে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতুম, খেলতুম, শাশুড়ির কাছে ধমক খেয়েও ছাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলা অবধি ছুটোছুটি ছাড়িনি। শাড়িটা যদি খ'সে যায়-যায় হয়েছে, লজ্জা পাইনি, আঁচলটা কষে কোমরে বেঁধেছি। কখনও শাড়িটার পাড় পায়ে জড়িয়ে গেলে হোঁচট খেয়েছি।

শুধু খেলাই না। সিতেশ-ঠাকুরপোর পড়ার বইও লুকিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলুম। ওর সঙ্গে কত যে ঝগড়া হত, তর্ক হত। বই পড়তুম, কিছু বুঝতুম, কিছুটা বুঝতুম না। মানে জেনে নিয়ে ফের পড়তুম। লুকিয়ে সংস্কৃতে আদ্য-মধ্য দুটো পরীক্ষা দিয়েছিলুম, সিতেশ-ঠাকুরপোর উৎসাহে। উপাধি পরীক্ষাটা দেওয়া আর হয়নি। শেষে একদিন ওর কলেজের ক্লাসের বইও পড়তে আরম্ভ করে ওকে প্রায় ধরে ফেললুম।

এরই ফাঁকে-ফাঁকে স্বামী যখন আসতেন, অবাক হতেন। 'তুমি এত সব শিখলে কোথায় ?'

'সিতু-ঠাকুরপোর কাছে।' নিঃসংকোচে বলতুম।

স্বামী বলতেন, 'ও।'

একটিমাত্র অক্ষর, তবু মনে হ'ত একটু যেন আহত স্বর, একটু বা গম্ভীর। তখন সংকোচ হত।

কখনও কখনও উনি দেখেছেন, মাথায় খোলা চুল, ঘোমটা নেই, সিতেশ-ঠাকুরপোর সঙ্গে সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছি। উনি দেখতেন, থমকে দাঁড়াতেন, মনে হ'ত কী বুঝি বলবেন, বলতেন না, নিজের ঘরে ঢুকতেন।

একদিন দেখি, বাক্স গোছাচ্ছেন। ওঁকে সেদিন কাজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে।' বললুম, 'আবার কবে আসবে।'

বললেন, 'আর আসব না।'

'কেন ?'

'তুমি খুশি হওনা বলে।'

বলে উঠলুম, 'মিছে কথা। খুব খুশি হই।'

বিরস গলায় উনি বললেন, 'তার চিহ্ন তো দেখিনে।'

ছেলেমানুষ ছিলুম তো, রোখ চাপলে তখন চুপ করে যেতে পারতুম না। 'কে এলে আমি খুশি হই, তোমার মনে হয় ?'

উনি শান্ত স্বরে বললেন, 'নামটা নেহাতই কি আমার মুখে শুনতে হবে ? সে কি তুমি নিজেও জানো না ?'

চলে যাবার আগে উনি কাছে এগিয়ে এলেন, আমার চিবুক তুলে ধরে বললেন, 'তুমি জানো না, বুঝতে পারো না, আমি কত দুঃখ পাই।'

দুঃখ! এই কথাটার নতুন অর্থ তখন সবে জানতে শিখেছি। আগেও দুঃখ ছিল—গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খাওয়া যেদিন বারণ হয়েছিল সেদিন দুঃখ পেয়েছি, পা ছড়িয়ে বসে কেঁদেছি। এই সেদিনও তো দুঃখ হত মনের মতো শাড়ি পরতে না পেলে। সে-ও দুঃখ—কিন্তু অর্থের পোশাক বদলে আজ ফিরে এসেছে। সকালের রোদ আর দুপুরের জ্বালা যেমন এক হয়েও আলাদা।

সেদিন উনি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কেঁদেছি। আগে কাঁদতুম পায়ে কাঁটা ফুটলে। এখনও কাঁটা ফুটলে কাঁদি, কিন্তু সে-কাঁটা পায়ে ফোটে না, শরীরের কোথাও না।

সুখেরও স্বাদ বদলে গিয়েছিল, যাচ্ছিল। নরম বালিশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াই সেরা সুখ, অল্প বয়সে তাই জানতুম। কিংবা বৃষ্টিতে উঠোনে দৌড়ো-দৌড়ি করে শিল কুড়নো। কিন্তু দীর্ঘ রাত জুড়ে বিছানায় জেগে থেকে ছটফট করা, অথবা কোনো একজনের কথা অহর্নিশি ভাবাও যে এক ধরনের সুখ, সেটা অনুভূতির পর্দায় সবে একটু-একটু দোলা দিতে শুরু করেছে। সেই সুখ প্রিয়জন কেউ এলে থেকে-থেকে তার বুকে কাঁপে। তার আসন আধেক-বুজে-আসা চোখের পাতায়।

আমার স্বামী কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনের দুঃখের সঙ্গে সহজেই সন্ধি করে নিতে পেরেছিলেন। কিছুদিন পরে কলকাতাতেই একটা কাজ নিয়ে ফিরে এলেন। কোলে খোকা এল। সিতেশ-ঠাকুরপো একটা কলেজে প্রফেসর হয়েছিলেন, বিয়ে করেননি, রোজ বিকেলে আসতেন। কিন্তু ওঁকে কোনোদিন আর অনুযোগ করতে শুনিনি।

কেননা, আমাদের সম্পর্কটা তিনি তখন ধরতে পেরেছিলেন। দুটি সম-বয়সীর সখ্য, রুচির মিল। হয়তো তারই উপরে আবেগের হালকা রঙের প্রলেপ। তার বেশি কিছু না।

উনি বুঝতেন। আমরা যখন গল্প করছি, এসে বসতেন। ইচ্ছে হলে আমাদের কথায় যোগ দিতেন। আবার উঠেও যেতেন।

কিন্তু ছেলেরা বোঝেনি। অনিল না, সুনীলও না। আজ যে-গলায় অনিল বলেছে, 'ছি, মা, ছি' সেই তিরস্কারের ভঙ্গিটি কতদিন ওদের চোখে ফুটে উঠতে দেখেছি। ওরা যখন কিশোর তখন থেকেই।

হয়তো পাড়ার লোক কিছু বলত। বন্ধুরা ঠাট্টা করত। অনিল এক এক-দিন হিংস্র গলায় বলেছে, সিতেশ-কাকা রোজ-রোজ কেন আসে মা, কেন আসে?'

'বা-রে, কাকা হন যে তোমার, আসবেন না?'

'কাকা না আরও কিছু। আমি সব বুঝি, সব জানি।'

মনে পাপ নেই, তবু আমার মুখ শাদা হয়ে গিয়েছিল। উনি আড়ালে কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এসে ঠাস ঠাস করে ছেলেকে কয়েকটা চড় মেরেছিলেন। আমি তো মা, ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছি, অনিল আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল, তবু আমার কাছে এল না, ওকে ছুঁতে দিল না।

সবই আজ মনে পড়ছে।

সিতেশ-ঠাকুরপো ঘরের একজনের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাকে ওরা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।

ওঁর মৃত্যুর পর সিতেশ-ঠাকুরপো একদিন বলেছিলেন, 'আমি আর আসব না।'

'কেন ?'

'ছেলেরা হয়তো পছন্দ করছে না।'

দৃঢ় স্বরে বলেছি, 'বাড়ি ছেলেদের একার নয়। তোমাকে আসতেই হবে ঠাকুরপো।'

উনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। পরে ধীর গলায় বললেন, 'আচ্ছা।'

রোজই আসতেন। নতুন-নতুন বই আনতেন। থান কাপড় প'রে পুজো সেরে ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তখন আলোচনার বিষয়ও বদলে গিয়েছে। আগে বেশির ভাগ কথাই হ'ত শিল্পকলা বা কাব্য নিয়ে, এখন জানি না কী করে বা কোথা থেকে ধর্মের প্রসঙ্গও এসে পড়তে লাগল। যা নিয়ে, কখনও ভাবিনি, সেই মর-জীবনের পর-জীবন নিয়েও কত দিন কত কথা হ'ত। আত্মার কথা আলোচনা করেছি আমরা, ভক্তির কথা, মুক্তির কথা।

বয়স অলক্ষ্য মাসটারও। আমাদের রুচিও বদলে দেয়। আমরা বেড়াতেও যেতুম দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে। মন্দিরে গিয়ে কথকতা শুনতুম।

ছেলেরা হাসত। বউমা বিচিত্র দৃষ্টিতে চাইত।

ওরা তো হাসবেই। ঠাট্টা করবেই। ওরা তরুণ যে। যৌবনটা অহংকারের কাল। দেহ-বলে বলীয়ান। সেই বলটা মদের মতো। চেতনা, বুদ্ধি, সব আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, পৃথিবী যেন একা তারই, আর কারোর না। শিশুর না, প্রৌঢ়ের না, জরাগ্রস্তেরও না। আপন-বয়সী ছাড়া আর সকলকেই কৃপা বা করুণা করে। কী ধৃষ্টতা, এখন তো বুঝেছি! গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যৌবন যাদের আসেনি বা গিয়েছে, তারাই তো সংখ্যায় বেশি! শ্রেষ্ঠ, স্থায়ী শিল্প-কীর্তির কতটুকু যৌবনের সৃষ্টি? জ্ঞানান্বেষণের কতটুকুতে বা যৌবনের দাবি? প্রৌঢ় আর প্রাজ্ঞরাই চিন্তার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। শুধুমাত্র জৈব-সৃষ্টির ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও তো যৌবনের অনন্য নৈপুণ্য দেখিনে!

এসব কথা সিতেশ-ঠাকুরপো আমাকে বলতেন, বোঝাতেন। ওরা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনত, হাসত। এমন দিন আসবে, আসছে, যখন ওরা বলবে, ওদের ছেলেরা হাসবে।

বয়েস বেড়েছে, সিতেশ-ঠাকুরপো লাঠি ধরেছেন, আমি চশমা। ঝুঁকে প'ড়ে

বই পড়ি, আর ভাবি, ভাবনার জালে অজানা কত কী এসে রোজ ধরা দেয়।

তার কোনোটা পাখি, কোনোটা প্রজাপতি। তাদের সন্তর্পণে তুলে ধরি, পরখ করি। তারা আমার জানার সীমানাটা একটু-একটু ক'রে বাড়িয়ে দেয়।

খানিক আগে সুখ-দুঃখের কথা বলেছি। টের পাচ্ছিলুম, আমার সুখ-দুঃখের স্বাদ আবার ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে; ফিরে যাচ্ছে আবার সেই শৈশব বা কৈশোরে, যখন আচার খেতে ভালো লাগত। এখন এই বয়সে আবার লুকিয়ে টক কুল খেতে শিখেছি। সেই আমার সুখ। এ-সুখ বুকে কাঁপে না, জিভ দিয়ে লালা হ'য়ে ফিরে এসেছে। একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ ক'রে আদি বিন্দুতে এসে ঠেকেছি।

কিংবা ঠেকিনি, ঠেকব। আমার মৃত্যুর মুহূর্তে জন্মক্ষণটিকে ফিরে পাব।

পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে ষাটে পড়ল, ষাট গড়িয়ে-গড়িয়ে ঢ'লে পড়ছে সত্তরে। সিতেশ-ঠাকুরপো প্রতিদিনই এসেছেন। আগে লাঠি ভর ক'রে, শেষের দিকে লাঠিতেও হত না, একটা রিকশার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। তবু রোজ আসা চাই।

এসে বসতেন বাইরের ঘরে। লাঠিটা এক কোণে রেখে ঘাম মুছতেন। আমিও এসে বসতুম। তখন আর কথা হ'ত না, বেশি না। উনি একটু হাসতেন, আমিও। দুটি হাসি মাঝপথে মিলে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকত। এমন কত দিন হয়েছে। এক ঘন্টার উপর আমরা একই ঘরে বসে থেকেছি, কিন্তু একটুও কথা হয়নি, আমাদের শুধু দেখা হয়েছে।

সেই দিনান্তের দেখাটুকুও একদিন শেষ হল। ও'র হার্টের অসুখ হ'ল, উপরে উঠতে পারেন না। আমি বাতে বিছানা নিয়েছি, নিচে নামি না।

তখনও আসতেন। দোতলায় শুয়ে শুয়ে ঠিক সময়ে বাইরের রকে লাঠির ঠুকঠুক কখন শোনা যাবে তার অপেক্ষা করতুম। সেই ঠুকঠুক আর কিছু না, শুধু জানানো, উনি আছেন, এখনও আছেন। শুধু জেনে নিতে আসা, আমি আছি কিনা।

দেহে তো সাড়া নেই, সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে উঠত, আছি, আমিও আছি। সেই সাড়া কোনও ধ্বনিতে ভর করে ও'র কাছে যেত না, কিন্তু পৌঁছোত ঠিক। উনি বুঝতেন। রকে বসেই খানিক জিরিয়ে লাঠি ঠুকঠুক করে ফিরে যেতেন।

সেই আসা-যাওয়াটুকুও শেষ হয়ে গেল।

আমি ভয় পেয়েছি, আকুল হয়েছি, আমি কাঁদছি।

সময় পূর্ণ হলে যারা যায়, সংসার থেকে অপ্রয়োজনীয় ব'লে খারিজের খাতায় যাদের নাম ওঠে, তাদের মৃত্যুতে কেউ কি কাঁদে?

কাঁদে। বুড়োর জন্যে বুড়িরাই কাঁদে।

সে-কান্না শুধু বিচ্ছেদের শোকে নয়। সেই বয়সে প্রতিটি সমবয়সী মরণ তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদেরও যাবার দিন এল বলে। পরের পালা

তারও হতে পারে।

আমিও যাব। তাই কাঁদছি। আমি মরলে কেউ তো কাঁদবে না, অন্তত সত্যিকারের কান্না না, তাই নিজের মরণের কান্না নিজেই কেঁদে রাখছি।

আমার ছেলে, ছেলের বউ ভুল বুঝেছে। ভাবছে আমি কাঁদছি সিতেশ-ঠাকুরপোর শোকে। তা তো নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই মৃত্যু-শোকে।

করুণ শঙ্খের মতো

আদালত থেকে বেরিয়ে এসেই নন্দিতা একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল। যেন বাড়ির গাড়ি, ওর অপেক্ষাতেই ছিল। কপাল ভালো। কতটা ভালো, যেন সেইটে পরখ করতেই নন্দিতা ছোট্ট রুমালটায় তার কপালটা মুছে নিল। এত লোক এত চোখ, গা শিরশির করে। চালাও ট্যাকসি, যত তাড়াতাড়ি পারো, আমাকে এই মানুষের বন থেকে উদ্ধার করে ছুটে চলো। মানুষের বন, না বন-মানুষের, রুমালটায় শুধু ঘাম নয়, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিরও ছোপ। যে জল তার চোখে থাকার কথা, তা যেন জায়গা বদলে কপালে লেগেছে। রুমালটা ছোট্ট হলে কী হবে, ভারি দুষ্টুও। তুই ঘাম আর বৃষ্টির ফোঁটা মুছে নিবি, এই না কথা ছিল? অথচ দ্যাখো, সিঁদুরের দাগটাও মুছে নিল। নকল সিল্কের বনাতটা লালে লাল। যে রক্ত নন্দিতার বুকের ভিতরে গোপনে, তাকে বাইরের বাতাসে একেবারে উতাল করে দিল। লোকে ভাববে কী?

ট্যাকসিটা মিটার ডাউন করেছিল। ড্রাইভার উৎসুক মুখে তাকিয়ে। বুকের ভিতরে ছপছপ আওয়াজ, নিজের কানে নিজেই শোনা যায়। যেন কেউ তার শাড়ি শায়া জামা থপথপ করে কাচছে। নন্দিতার হৃদয়ে (এই নামে কিছু আছে কি? কখনও এই চরাচরে কোথাও ছিল কি?) কলতলা হয়ে গেছে। কোনও রকমে চাপা গলায় সে খালি বলতে পারল, যোধপুর পার্ক। আর দেরি নয়, হে ট্যাকসিওয়ালা দয়া করে দাঁড়ালে যদি, আর একটু দয়া করো। পার করে দাও এই পথটুকু, যত তাড়াতাড়ি পারো, তত।

তার কারণ সে ইতিমধ্যে অনেক না-চেনা চোখের মধ্যে এক জোড়া চেনা চোখ দেখতে পেয়েছে। বিরামের। বিরাম এখনও আদালতের বারান্দায়। নামেনি, হয়তো বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে। নামেনি, তবু অপলক তাকিয়ে আছে। সিঁদুর জলে মাখামাখি রুমালটার আড়াল থেকে নন্দিতা সব দেখতে পাচ্ছে। চোখ তো নয় যেন মিটমিটে দুটি আলো। রাত্তিরে বেরালের চোখ যে রকম জ্বলে, কতকটা সেই রকম। বিরামের চাউনিটা তীব্র না বিষণ্ণ, ভালো করে পরখ করার সাহস নেই নন্দিতার। সময়ও নেই। ট্যাকসির চাকা যখন গড়াতে শুরু করেছে, ভিড়ের মধ্যে তার ভেঁপু যখন চারপাশের সব চ্যাঁচামেচিকে চাপা দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে, নন্দিতা তখন, এতক্ষণে এই প্রথম, বুকের ভিতরটা ফাঁকা আর ফাঁপা করে দিয়ে শ্বাস ছাড়তে পারল।

রুমালটা তো রক্তে আর কান্নায় মানে সিঁদুরে আর জলে গোল্লায় গেছে, তাই তুলে নিল আঁচলের একটা কোণ। আরও একবার মুখটা মসৃণ মুছে ওই আঁচলটাই গুছিয়ে গায়ে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে বসল।

বিরামের চোখে কষ্ট ছিল, না ধিক্কার বা তিরস্কার, সেটা যাচাই করে নেওয়াই হল না। পালাতে হবে যে, এক্ষুনি, এক্ষুনি। এই লোকজনের কাছ থেকে, বিশেষ করে একটি লোকের অদ্ভুত দৃষ্টির কাছ থেকে। কিংবা কে জানে, নন্দিতা হয়তো নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে। এই মুহূর্তে।'

বাড়ি পৌঁছুতে পৌঁছুতে অবশ্য অনেক মুহূর্তই কাটল। মিটারে কত উঠেছে না দেখেই নন্দিতা একহাতে বাড়িয়ে দিল একটা দশ টাকার নোট, আর এক হাতে দরজা খুলে তড়বড় করে নেমে গেল।

সেই বাড়ি, সেই তরতর সিঁড়ি। চাবিটা ব্যাগে ঠিক খোপেই আছে, দরজার ফোকরটাও যথাস্থানে। কিছু হারায়নি, বা স্থানচ্যুত হয়নি। আবার কিছুই যেন যথাপূর্ব নেই। তখনও শেষবেলা সন্ধ্যার কোলে মুখ গুঁজে মূর্ছা যায়নি, তখনও অন্ধকার দিনের রোদের রেশটুকুকে করেনি আত্মসাৎ। বাড়ির বাইরের মহা নিমগাছটা ঝিরঝির জল আর হাওয়া ঝরিয়ে দিচ্ছিল। একটুখানি আকাশ জানালার কাচের ফাঁকে, বাইরের রাস্তায় ক্বচিৎ একটা গাড়ির পোড়া পোড়া গন্ধ, কখনও বা রিকসার ঠুনঠুন ছন্দ।

মেঘলা দিন, তাই বিকেলটাকেও সকালের মতো লাগে। মুখ ভারী, তবু করুণ হলেও মনোরম। অভ্যস্ত হাতেই সুইচ টিপে নন্দিতা ঘরটাকে আলোয় আলো করে দিল। তখন আলনার শাড়ি, দেওয়ালের ফটো আর আয়নাটা ওকে দেখতে পেল। যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। অথচ থেকেও নেই। যে শূন্যতা বাইরের আচ্ছন্ন আকাশে সে শূন্যতার ছায়া নন্দিতা তার অন্তরেও অনুভব করছে। নেই নেই, সে নেই, কেউ নেই কিছু নেই। নেই থেকে কিছু হবে এই আশাতেই নন্দিতা তাড়াতাড়ি সংলগ্ন চানের ঘরটায় ঢুকল। যেন সেখানকার শ্যাম্পু, সুগন্ধি তেলের শিশি আর সাবানের মৃদু সুবাসে সে তার পুরানো হারানো সত্তাকে ফিরে পাবে। চানের ঘরের আয়তন ছোট বলেই বোধহয় এত আরাম, এত অভয় স্বস্তি। মাথার উপরে ঝরনা। ছিপি খুলে দিতেই তার ঝরঝর আদর নন্দিতার সমস্ত শরীর ধুয়ে দিতে থাকল। কার স্পর্শ? তার মায়ের? সে কতদিন আগেকার কথা? মাকে ছেড়ে এই বাড়িতে এসে উঠেছে অন্তত বছর ছয়েক আগে। আর মা তাকে—সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন কবে যেন, কবে যেন? সেও কোন না বছর তিনেক হবে। দিন তারিখ সাল এখন আর মনেও পড়ে না।

তোয়ালে দিয়ে যখন গা রগড়াচ্ছে নন্দিতা, কার ছোঁয়া? তার স্বামীর? সেও তো হারানো। তার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ করে এই তো মোটে আধঘন্টা আগে নন্দিতা পুরোনো বাড়িটাতেই ফিরে এল। বিচ্ছেদ, পূর্ণচ্ছেদ। আঃ, এতক্ষণে যেন সব জুড়োল। ছড়ায় বলে, খোকা ঘুমোল। কোনও ছড়ায় কিন্তু খুকী ঘুমোল বলে না। বলবে কেন? আমি তো খুকী নই; আমি অনেক-দিন ঘর করা নারী।

বিরামের সঙ্গে যতদিন ছিলাম, ততদিন আমার একটা নাম ছিল হয়তো। কিন্তু আমি যে আমি এই কথাটাও কি বোঝা যেত? শুধু যুক্ত ছিলাম এইমাত্র।

কে জানে, সব বিবাহিতা মেয়ের আর একটা নাম হয়তো সংযুক্তা। আমি নেই, সে আছে। অথবা তার ছায়া হয়ে আমি আছি। কিন্তু যদি এমন কোনও সাজানো বাগানে আর একটা ছায়া পড়ে? তবে তো এই ছায়া আর একটা ছায়ায় ঢেকে যাবে!

আমি এখন আমি। শেকড় নই। ছায়াও নই. আমি রক্তমাংস মজ্জা মিলিয়ে কায়া। স্বাধীন। বেশ তবে তাই হোক. এবার সেই কায়ার বুকের ভাঁজে একটু সেন্টের সুগন্ধ ঢালি না। দরাজ হাতে স্প্রে করলে এই আমি ভুর ভুর হয়ে যাব। কিংবা কস্তুরী মৃগের মতো 'ম'। রঙের রং তো ঢাকা যায় না! গন্ধটা যদি ঢাকা পড়ে।

নন্দিতার মগজে একটা ঝিমঝিম আবেশ নেশার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছিল. স্নায়ুর সংবেদনশীল কেন্দ্র থেকে যত শিরা আর উপশিরা রঙে রঙে চিৎকার করছিল। নন্দিতা জামাটার নিচের বন্ধনী আরও আঁটসাঁট বোতাম টিপে শক্ত করে দিল। এই নিচেকার জামাটাই তো সবচেয়ে নিচের নয়. তার তলাতেও আছে পরতের পর পরত. আছে মসৃণ ফর্সা চামড়া। সেই চামড়ারও নিচে? কে জানে কোথায় লুকিয়ে থাকে মন। মনেরও স্তন আছে কিনা আজ পর্যন্ত কোনও বিজ্ঞানী বা দার্শনিক সে কথা জানাননি। থাকলে মনকেও ব্রা পরানো যেত। দূর, যাকে লাগাম পরানোই শক্ত তার আবার বক্ষ-বন্ধনী। তবু নন্দিতা ভাবল. বাইরের বুকে একটা বাঁধন থাকলে ভিতরের বুকটাকেও বুঝি বেঁধে আটকানো যাবে। যেমন স্ফীত কিছু সুডৌল মাংসপেশী. তেমনই অনুভূতি। শারীরিক স্ফীতিকে যদি শিকেয় তুলে তুঙ্গ করা যায় তবে মানসিক উচ্ছ্বাসের জন্যেই বা কোনও দড়াদড়ি. ফিতে হুকটুক নেই কেন?

আসলে খুবই কষ্ট হচ্ছিল নন্দিতার। সেটাকে ঢাকতে যত সেন্ট আর পাউডার। আচ্ছা বিরাম আজকেই আদালতের বারান্দায় ওভাবে তাকিয়ে ছিল কেন? তখন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি. নন্দিতার এতক্ষণে মনে পড়ছে. একটা পাকা বটফল টুপ করে স্যাঁতসেতে মাটিতে পড়েছিল. শিরীষ গাছটার ফুলের রোঁয়া উড়ে এসে সুড়সুড়ি দিয়েছিল তার গলায় আর ঘাড়ে। কার ছোঁয়া. কিসের? সে জানে না। শুধু দৌড়ে এসে ট্যাক্সিতে বসেছে। ট্যাক্সিটার স্পিড ছিল অন্তত ষাট সত্তর কিলোমিটার। কিন্তু বিরামের সেই চোখ আর চেয়ে থাকা? তার স্পিড কত? যেন আরও বেশি। যেন সিঁড়ি-টিড়ির বাধা মানেনি. ধাওয়া করে এসেছে এইখানে. এই ঘরে. এত দূরে। শুধু তাকানোও যে একটা কুকুরের মতো অনুগত অনুসারী হতে পারে নন্দিতা আগে জানত না তো! ওই দৃষ্টি এখন লকলকে জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে! তা হাঁপাক না! নন্দিতার সারা শরীর আর সত্তাকে এত করুণ লেহন করছে কেন?

কথাটা নন্দিতা ড্রেসিং আয়নাকেই জিগ্যেস করল। আবার কপালে বড়ো করে পরল সিঁদুরের টিপ. যেটা ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে খানিক আগে মুছে তাকে অধবা করে দিয়েছিল। নির্ভুল কাচ তাকে দেখিয়ে দিল হাতের শাঁখা জোড়াও। নন্দিতার ঠোঁট একটু বেঁকে গেল। সোনা দিয়ে বাঁধানো হোক না. শাঁখা জোড়া

ভেঙে দিলে বেশ হত। যাদের স্বামী মারা যায়, তাদের নোয়া লোকে নাকি খুলে নেয়, শাঁখা ভেঙে ভাসিয়ে দেয় জলে! আর যাদের স্বামী চলে যায়? তাদের শাঁখার কী গতি হয়, নন্দিতা ঠিক ঠাউরে উঠতে পারল না।

ইচ্ছে করলে এই তো আমি সিঁদুরের টিপটা ফের মুছতে পারি। সিঁথির লাল দাগটা তো কত কালই নেই। বুকের ভিতরের রাস্তা দিয়ে সরু কোনও লাল যন্ত্রণার আলপথ চলে গেছে কিনা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিতা একটা আঙুল ছুঁইয়ে সেটা পরখ করতে চাইল।

এ কী অদ্ভুত ব্যাপার সে ভাবছিল। গিয়েও যে যায় না, সব শেষ হলেও পিছু পিছু পা টিপে আসে! কুকুরের মতো যার জিভ শুধু হা হা শ্বাস ছাড়ে। জিভ আছে অথচ লালা নেই, তাকানো আছে, কিন্তু সেটা তাড়া করে না, নন্দিতা এই অসম্ভব অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিতে পড়ে তোলপাড় হতে থাকল।

ঠিক তখনই সিঁড়িতে শোনা গেল ঠক্ ঠক্ জুতোর শব্দ, আমি জানি তুমি কে, আমি জানি এই পায়ের আওয়াজ কার। তোমার পায়ে পড়ি এক্ষুনি এসো না, অন্তত মিনিট দুই সময় দাও আমাকে। সামলে নিতে। ভেবে নিতে। যা ছেড়ে এলাম কিংবা যা আমাকে ছেড়ে গেছে। গঙ্গার ঘাটে কখনও যাওনি? সেখানে পুণ্যবতীরা সবাই ডুব দেয়। পাপবতী আমি, আমিও একটুখানি সময়ের জন্যে আগেকার জলে একবার শেষবার ডুব দিয়ে দিতে চাই। কয়েকটা মিনিট শুধু। ভিক্ষে করছি। এই শাঁখাটা বড্ডো ঢলঢলে লাগছে যে। সিঁদুরের এই ফোঁটাটা দরকার হয়, না হয় আবার মুছব আবার আঁকব—এবার যে আসছে সেই তোমার জন্যে।

একটু সময় দেবে? ধরো আমি যদি ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিই? আগেও কত রাত্তিরে দিয়েছি। তখন বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, অথচ ভিতরে, সারা শরীরে ফটফটে ছটছটে আলো। জ্বলে জ্বলে। জ্বলত জ্বলত। তোমার বুকের গন্ধ পাই না কেন? আমি চাপা হাসতাম সেই অন্ধকারে। আরও চাপা গলায় বলতাম, পাও না? বিরাম বলত, না। বলতাম, কেন এত যে আতর মাখলাম! সে বলত, সে তো কেনা! বলতে বলতে আমাকে খামচে ধরত, আমার ঠোঁট, ঠোঁট ছাড়িয়ে জিভ চুষে শুষে শেষ করে দিতে চাইত। অন্ধকারে গাঢ় গলায় বলত, কেনা জিনিস তো চাই না। বলেছি, তবে? সে বলেছে, শুধু পেতে চেয়েছি, পেতে চাই।

আরও কত কত রাত, যখন আমার বুকের উপরে বলতে কি পায়ের নখ থেকে কপাল, আমার কপাল পর্যন্ত একগাছি সুতোও নেই, আমি মাঠের মতো, আকাশের মতো ব্যাপৃত, আমি উদ্‌লা, তখন সে আমার শরীরের অন্ধিসন্ধিতে কী জানি, কোন্ গন্ধ খুঁজতো। খুব নিচু গলায়, খুব উঁচু হয়ে বলতাম, কী খুঁজছো তুমি, কী চাও?

পায়ে পড়ি হে সিঁড়ির ধুপধাপ শব্দ, হে সময়, আমাকে আর একটু সময়

দাও। সব কথা নিজেকে বলে বলে খালাস হয়ে যাই, যেভাবে এক্ষুনি যদি ফের বাথরুমে যেতাম তবে আয়নাটার কাছে মনের সব চাপ আর তাগিদ হালকা করে দিয়ে আসতে পারতাম।

'বিরাম সেই গন্ধভরা অন্ধকারে বলেছে, কোথায় তুমি? আমি বলেছি, এই তো। মায়েরা যেভাবে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায় সেই গলায়। বলেছি, দ্যাখো তো, আমার বুকের একটুও আড়াল নেই! সে মানতো না। সে কি বুকের ভিতরে আরও কোন বুকে আব্রু আছে কিনা সেইটাকে খুঁজতো? তাকে ছিন্ন ভিন্ন আর উদ্‌ভিন্ন করে দিতে চাইতো?

জানি না, আমরা তো জানি আমরা যা আছি তাই। আমার ভিতরে আর একটা যে আমি একেবারে খোলামেলা; বুকের তলায় আরও একটা বুক যে থাকতে পারে কখনও ভাবিনি। তাই নানা সুগন্ধি দিয়ে ওকে ঠেকাতে চাইতাম। কে জানে, হয়তো ঠকাতাম নিজেকেও।

রাস্তার একটা টিমটিম আলো মাঝে মাঝে ওই অন্ধকারকে জেব্রা করে দিত। বিরাম আমার খোলা আর খালি শরীরটাকে পাগলের মতো কাছে টানতো। বলত, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নিয়ে খালি বলত, আমি তোমার ভিতরটাকে জানতে চাই। আমি তো গা এলিয়ে, সমস্তটাকে ঢিলে করে দিয়ে শুয়ে আছি। বলেছি, যা জানবার জেনে নাও তুমি। সে বলত, প্রবেশ করব। বোকা ছেলে! একটা সিন্দুকের ডালা যদি বা ঘামে চিটচিটে হয়ে কেউ দু হাতে টেনে তুলল, তার পরেও ভিতরে যদি চকচকে কোনও সোনা দানা মোহর না দেখতে পাওয়া যায়? শরীরের দশাই তো এই। সে শেষে যেতে পারে না, শুধু শেষ হয়ে গিয়ে হাঁপায়। সেই কুকুরের লকলকে জিভ। অশেষের ঠিকানা পায়নি বলেই বিরাম রোজ বলত, রোজ রোজ বলত আর বলত, কী? না লাগছে। কোথায়? আমি বলতাম। তখন আমিও ইঁদারার মতো টলটলে হয়ে গেছি, বিরামের মুখ আমার উন্মুক্ত বুকে, বলতাম, সব তো খুলে দিয়েছি, তবু পারছো না? এ-যেন দস্যুর হাতে চাবি তুলে দিলাম তার পরেও সে ধন-দৌলতের কোনও ঠিকানা পেল না।

বিরাম তুমি সেই দস্যু। কেন ফিরে ফিরে নিচের ঘরে, কেন কোনও মন্দিরের গর্ভগৃহে নিবিষ্ট প্রবিষ্ট সাষ্টাঙ্গ লিপ্ত হয়েও বলছ, লাগছে? কী সে বিরাম, কী সে? কোথায় বলোতো কোথায়? সারা গায়ে কিছু তো নেই, দেখছ না আমি এখন নির্বাস, আমি শুধু আমার নির্যাস। আছে শুধু শাঁখাজোড়া। তাতেই কষ্ট? সেইটাকেই তুমি বলছ, লাগছে? ওই একটুখানি বেড় কি বেড়া হয়ে যায়?

জানি না, ভাবতে পারছি না, সময় আমাকে আর সময় দিচ্ছে না। ধপধপ জুতোর শব্দ, এখন একেবারে দোরগোড়ায়। কলিং বেল বাজছে।

নন্দিতা জামা কাপড় গুছিয়ে সংবৃত হয়ে গেল। সাড়া দিল মানে দরজাটা খুলল। আমি জানতাম অনুপম তুমি আসবে। বাঃ তোমাকে দারুণ দেখাচ্ছে

তো। তোমার জন্যেই তো নন্দা, তোমার জন্যেই। আমার মনের কথাটা যদি পড়তে পার তবে পড়ে নাও। আজকে এই সময়টায় লোডশেডিং হলে কী দারুণ হত বল তো? জিগ্যেস করার দরকার কী অনুপম। সব লোড শেড করেছি বলেই তো আমরা দুজন এখানে আজ মুখোমুখি হয়েছি। স্ট্রেচলনের ট্রাউজার পরে তুমি তৈরি, আমিও তাই নাইলনের শাড়ি সারা শরীরে জড়িয়ে। এসো সব ছাড়িয়ে যা কিছু আমাদের জড়িয়ে আছে সব বাধা এড়িয়ে, এসো। জানি এরপর কী। তুমি যদি তৈরি থাকো তবে আমিও তৈরি। কপালের টিপটাকে ভালো লাগছে না? আমার জন্যেই পরেছ? ভালো না লাগলে মুছে দিও। চুমু দিয়ে জিভের ডগা দিয়ে। আজকেও তুমি এই সব কথা বলবে নন্দা? তোমার কথা কেমন যেন কাটা কাটা। দূর আমি সব হাত বুলিয়ে মিলিয়ে দেব।

আমি নন্দিতা। বিরামের চাকরিটা হঠাৎ কেন গেল বলতো? কেন তুমি তোমার অফিসে আমাকে একান্ত সচিব করে নিলে? আমার যে এক, তার যে তখনই অন্ত হয়ে গেল। স্বামীর কাজ নেই, আমার কাজের উপরে একটা ডবল কাজ মিলল। অনুপম, হে সম্রাট তুমি মহানুভব।

নন্দিতার এই সব মনোগত কথা অনুপম শুনতে পায়নি। সে বানানো কোনও নাটকের চরিত্রের মতো বানানো কোনও সংলাপ শুনছিল। তার কানে ভাসছিল, আমি, এই অনামিকা, এখন সব খুলে দিতেই রাজি। যে ভাবে দরজাটা খুললাম তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। জানতাম তুমি আসবে। তাই তো একটু আগে বাথরুমে গিয়েছিলাম। কেন বলতো? আমার সমস্ত পুরোনোকে ধুইয়ে ঢেলে দিলাম। আর নতুনের জন্যে নিজেকে ছিমছাম তকতকে করে তুললাম। এক ঢিলে দুই পাখি। মেয়েদের মন যদি বা দুমুখো সাপ হয় তাদের শরীরটা শান বাঁধানো মেঝের মতোই। কোনও একজন পা ফেলবে এই জন্যেই তারা মসৃণ ধৌত তৈরি।

আচ্ছা অনুপম, তুমি খেয়ে এসেছ? রাত্তিরের খাওয়া? খাইনি নন্দা। তোমার নন্দা মানে এই নন্দিতা বলছি, তোমার চোখ দুটো এরকম ধূসর কেন? চোখকেই কি তোমার ভয়? না, তাও নয়। যখন তোমার একান্ত সচিব হলাম, তখন ছুটির পরে দুটো চোখ ছুটে ছুটে আমার পিঠের জামা ফুঁড়ত। আজকেও জানো, অন্য দুটো চোখ ধাওয়া করেছিল, যে চোখ দুটোর মালিকের সঙ্গে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আচ্ছা, পুরুষের চোখ কি শুধু ধাওয়া করে? চায় চায় আর চায়? আবার বলি আচ্ছা বিচ্ছিন্নতাবাদ কি একেই বলে? একটা মেয়ে কখনও একাকী কি কোনও দ্বীপ হয় বা হতে পারে? কী বললে, কী বললে তুমি? আমি তো আছি। নাটক হলে এখানে নায়িকার সংলাপের আগে ব্র্যাকেটে লেখা থাকত 'মৃদু হাস্য'। সে সব থাক আবার বলো, খেয়ে এসেছ, না খাবে? আমরা দুজনেই খাবো নন্দিতা, আমার নন্দা। এসো, আলোটা নিবিয়ে দিই।

কোথায় গেল স্ট্রেচ্‌লন কোথায় বা নাইলন? কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই।

তার সমর্থ উরু কদলী কান্ডের মতো প্রকান্ড হয়ে গেছে. একটি পুরোনো পরিচিত বিছানায় আরও দুটি পা আর হাত হঠাৎ যেন অক্টোপাস, আতুর নিশ্বাস।

. ওরা ডিনার খাচ্ছে।

তবু নন্দিতার শরীরে মনে কী যেন ? কেউ ছিল এখন নেই। সেই স্মৃতি। পুরুষ। কেউ তাকে অবধারিত খুলতে চাইছে। পুরুষ।

পুরুষেরা জানে না কেন যে. খোলা মানেই মেলে দিতে পারা নয়। বোঝে না কেন প্রথম দ্বিতীয়ের পরেও তৃতীয় কোনও পুরুষ থাকতে পারে, তার নাম নেই. মুখ নেই. সে অতি-অতীত পূর্বতন কোনও ক্ষণ। সেই তৃতীয়টি এই মুহূর্তে নন্দিতাকে উন্মথিত উন্মোচিত করছিল। অনুপম তাকে বিগলিত গলায় বলল. আমাদের মধ্যে আর কিচ্ছু নেই। দারুণ, তাই না ? এই সময়টার জন্যেই আমরা কতদিন ধরে বসেছিলাম বলো তো ?

নন্দিতা মনে মনে হাসল। সেই হাসাটাই নির্বাক বলাঃ বসাটা শোয়া হয়ে গেল. তাই বলছ দারুণ. তাই না ?

“ভীষণ ভালো লাগছে.” অন্ধ-বন্ধ শ্বাস ছেড়ে গাঢ় কুয়োর তলা থেকে অনু-পমের গলা ভেসে এল। সে বলল. “তুমি কিন্তু কিছুই বলছ না।”

“ভালো লাগছে আমারও.” সারা শরীরে সাড়া দিতে দিতে নন্দিতা আস্তে আর স্তিমিত বলল।—“ভালো লাগছে. কিন্তু একটু লাগছেও।”

ব্যথা দিচ্ছি ? অনুপম বোকা বোকা গলায় বলল।—কোথায় ? উত্তরে শুনল. জানি না। মরিয়া হয়ে অনুপম বলল. শরীরে ? তখন তীব্র চিৎকার করে উঠল নন্দিতা। হাত দুটো শূন্যে তুলে বলল. তোমার লাগছে না অনুপম ? আমার কিন্তু লাগছে। দ্যাখো. এই দুটোতে।

নন্দিতার রোগা কব্জিতে পুরোনো একজোড়া শাঁখা অন্ধকারে সাঙ্ঘাতিক শাদা হয়ে জ্বলতে থাকল।

ভুল স্টেশনে

—এখানে নামলেন কেন? এই স্টেশন তো আপনার নয়।

যে লোকটা লম্বা, এখন এই মাঝরাত্রে তাকে আরও লম্বা দেখাচ্ছে, সে বলল। তার হাতে একটা বাঁশের লাঠি। লাঠিটার আগায় জ্বলজ্বলে একটা আলো, টরচ নয়, কোনও বালব-টালবই হবে বোধ হয়, সেই আলোটায় জৌলুস নেই, তবে হয়তো বা দিশা আছে। লম্বা লোকটাই জানে ভালো।

যেহেতু অগ্রবর্তী এবং এই মুহূর্তে পথপ্রদর্শক মানুষটা তাকে বলল, এই স্টেশন তো আপনার নয়, তাই জবাবে কিছু বলতে হয় তাই নিখিলেশ বলল, কী করব বলুন। দিব্যি তো বাংকে হাত-পা ছড়িয়ে আয়েসে ঘুমোচ্ছিলুম। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি। হঠাৎ কানে এল, নামুন।

—নামুন? সে তো এই স্টেশনটার নাম।

যদিও অন্ধকার মাঠ, যদিও মেঘের ফাঁকে কৃষ্ণা চতুর্দশীর একটি ভুরু বাঁকানো ছাঁদ, অগ্রগামী অচেনা একটি দীর্ঘকায় মানুষের লাঠির চূড়ায় জ্বল-জ্বলে একটু ফসফোরাস, তবু নিখিলেশ না হেসে পারল না।

বলল, নামুন—এ কি আবার কোনও স্টেশনের নাম হয়।

—হয় না?

লোকটা এবার ঘুরে দাঁড়াল। লাঠিটা চলে গেছে আড়ালে ফলে এখন সারা মাঠই অন্ধকার। দিনমানে তবুও একটু ঢলঢল আকাশ থাকে, এই কালিঢালা মেঘ ছাওয়া রাত্রে তাও নেই।

গোটা আকাশটাও যে একেবারে শূন্য একেবারে "না" হয়ে যেতে পারে, নিখিলেশ আগে কখনও জানত না। যদিও জুলাই মাস, তবু তার শীত করছিল। হাড়ে হাড়ে লাগছিল ঝগড়া। একি স্নায়ু? একি কোনও ভয়? অনিশ্চয়তা তো নিশ্চয়।

ঢ্যাঙা লোকটা বলছিল, একটা স্টেশনের নাম "নামুন" কেন হবে না? "ঘুম" বলে কোনও স্টেশন নেই?

—সে তো পাহাড়ে। বলতে গিয়ে জিহ্বা জড়িয়ে নিখিলেশ নিজেই তোতলা হয়ে গেল।

—পাহাড় আর মাঠের আইন-কানুন আলাদা বুঝি?

এইবার লোকটার হাসবার কথা। তার হা হা যেন মাঠ ছাড়িয়ে আরও অনেক অনেক দূরে গিয়ে কোনও উঁচু ঢিবিতে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

নিখিলেশ কাঁপল আবার। আকার কস্মিনকালে তার যা ছিল না, সেই

তোতলামি যেন ফিরে এল।

থতমত খেয়ে সে বলল, শুধু "নামুন" ওই আওয়াজটা তো নয়। একটা লনঠনও দুলছিল যে!

লম্বা লোকটা বলল, সে তো আকাশে।

এবার হাসবার পাল নিখিলেশের। বলল, আপনি ধোঁয়াটে কথা বলছেন। আকাশে আবার কেউ কখনও লনঠন দোলায় নাকি?

লোকটা দুলতে দুলতে তার হাতের লাঠি দোলাতে দোলাতে বলল, দোলায়, দোলায়, দোলে, দোলে। ওরা লনঠন নয় ওরা তারা। যখন ইচ্ছে তখন জ্বল-জ্বলে চোখে চেয়ে থাকে। আর যখন চায় না? তখন খুব দুষ্টু মেয়ের মতো মিটিমিটি হাসে।

—ওদের এত ক্ষমতা? নিখিলেশ, সম্মোহিত, বলল।

আর সেই লোকটা জবাবে বলল, ক্ষমতা? দূর দূর! হয় ঝিকিমিকি নয় মিটিমিটি। এই দুটোর বাইরে ওরাও যেতে পারে না।

—তবু তো আপনি বলছেন, ওই তারাদেরই একটা আমাকে ইশারায় নামিয়ে আনল।

লোকটি হাসল। শুধু দাঁতে, শুধু লাঠির আগার আলোতে যতটুকু হাসি বোঝা যায়।

সে বলল, এই প্ল্যাটফরমের কিনারায় তাল গাছটার মাথায় ওই একটা তারা রোজ ওঠে, ভর করে জ্বলে, হয়তো নিজে জ্বলে পুড়ে মরে, তবু হাসে। জানেন, আমাকেও একদিন এখানে এনেছিল কে? ওই তারাটাই তো! তখন এখানে রেল লাইন ছিল না, ছিল নদী আর ঘাট। আমিও নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ি। হঠাৎ কিসের আওয়াজে, কে জানে, চমকে জেগে উঠে তালগাছের মাথায় ওই তারাটাকে দেখি।

—কী করলেন তখন, কী করলেন?

—কী আর করব, আপনি যা করেছেন, তা-ই। নেমে পড়লাম। তারপর যত কিছু আগা-পাশ-তলা বদলে গেছে, এসেছে রেল লাইন। কিন্তু তাল-গাছটা ঠিকই আছে। যেখানে ছিল, সেখানে। নদীর পাড় থেকে একটু দূরে, প্ল্যাটফরমের গুমটি ঘরের একেবারে পাশে। তবে এখনও রাত্তিরের বাঁধা একটা সময়ে একটা তারা ওই তাল গাছটার মাথায় দেখা দেয়। জ্বলজ্বল করে। ওই তারাটাও বাঁধা পড়ে আছে।

বলে লোকটা আবার হো হো হাসল। সেই হাসি যথাবিহিত তথা ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি তৈরি করে ছড়িয়ে গিয়ে ফের ফিরে এল।

নিখিলেশের শীত বাড়ছিল।

—আপনি এখানকার একটা ঘাটেই তবে নেমেছিলেন?

—নেমেছিলাম, কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। বড়ো কথাটা এই যে, আমি রয়েই গেলাম। ওটা ঘাট কি আঘাটা জানি না। কিন্তু উপরে উঠে দাঁড়াতেই সেদিন হঠাৎ যেন অনেক কিছু আমাকে একসঙ্গে ঘিরে ধরল।

—ভৌতিক ব্যাপার?

—আপনারা যখের ধন পড়ে বড়ো হয়েছেন। তাই ব্যাপারটা ঠিক বুঝবেন না। কী যেন, কারা যেন অনেক সময় আমাদের ঘিরে ফেলে। ধরুন, আমি তো এসেছিলাম এখান থেকে কিছু কাঠফাট কেটে ব্যবসা করা যায় কি-না তাই সরেজমিন দেখতে! আমার আরও অনেক ভাটিতে যাবার কথা ছিল। অথচ আটকে গেলাম এখানেই। কারণ কী জানেন?

মাঠ থেকে সবে কারা ফসল নিড়িয়ে নিয়ে গেছে, তবু মুড়োনো ফসলও কিছু রেখে গেছে, অন্তত তার গন্ধ। সেই সুবাস পাচ্ছিল নিখিলেশ। চোখের সামনে একটা ছায়ার মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই, তবু তার কণ্ঠস্বর আছে। এই আছে এই নেই—ফসলের সুবাস। সে টিপে টিপে পা ফেলছিল।

সামনের লোকটিকে—বরং বলা উচিত ছায়াটিকে—নিখিলেশ বলতে শুনল, কেন আটকা পড়ে গেলাম বলুন তো? আমার তো আরও দূরে যাওয়ার কথা ছিল।

নিখিলেশ কিছু বলার আগে সেই স্বর আবার বলল, দূরে যেতে অনেক সময় খরচ হয়ে যায় যে, দূরে যেতে অনেক কষ্ট। তাই ভাবলুম, সেদিন ভেবেছিলাম, যেখানে আছি, সেখানেই থাকি না কেন; যতদূর এগিয়েছি, যেখানে পৌঁছেছি, সেই তো ঢের!

বলতে বলতে লোকটা সহর্ষ একটা অব্যয় উচ্চারণ করে উঠল।

সে বলে গেল, আজ এই বাদলার রাতে আকাশ নেই। সেদিন সেই চৈত্র মাসে ছিল। একটা তারা? হা-হা-হা। সে তো শুধু তাল গাছের শিয়রে দাঁড়িয়ে ফুসলে আমাকে আঘাটায় নামিয়ে আনল। কিন্তু সারা আকাশ সেদিন আমাকে দেখবে বলে অনেক তারা জ্বালিয়ে রেখেছিল যে! কোথাও এক লেশ মেঘ ছিল না। এতটুকু কুয়াশাও না।

এতক্ষণে নিখিলেশের মনে হল, তার মুখ খোলা দরকার। আপনি না হয় ঠিক রাতে বেঠিক ঘাটে নেমেছিলেন। কিন্তু আমি? আমার কী গতি হবে বলুন? কাল সকালেই আমার যে ইনটারভিউ! সে তো এখানে নয়! এখন বুঝতে পারছি, আরও তিনটি স্টেশনের পর।

—কালকের কথা কাল।" ওই লাঠিওয়ালা লম্বা লোকটা বলল। আপাতত আজ—

—আপাতত আজ কী, তা তো বুঝতেই পারছি। "নামুন" শুনেই একটা স্টেশনে নামলাম। বুঝতে পারিনি যে, "ঘুম"-এর মতো একটা স্টেশনের নামও "নামুন" হতে পারে। সেই স্টেশনে টিমটিম একটা আলো জ্বলছে, কিন্তু না জনপ্রাণী, না ওয়েটিং রুম। স্টেশন মাস্টার বা এ এস এম, যিনিই থাকুন, সবাই উধাও। একটা কুলি পর্যন্ত নেই। ভাগ্যিস আপনি ছিলেন! তাই একটা আশ্রয়ের আশায় পিছু নিয়েছি।

—ভাগ্যিস ছিলেন, বললেন কেন? আমি থাকি। লোকটি বলল গাঢ় স্বরে। তারপরেই সে সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল হয়ে গেল। বলল, থাকি, মানে কোনও

কোনও দিন আসি। কেন আসি বলুন তো ?

—জানি না।

আসি এই জন্যে যে, যদি কেউ আসে! যদি কেউ ভুল করে নামে! আসতে বা নামতে তো পারে!

লোকটার পায়ে কি রণ-পা ? নইলে ও এত জোরে জোরে হাঁটছে কী করে ? নইলে ওকে এত লম্বা দেখাচ্ছে কেন ?

(আজ আমার কপালে কী আছে, আমি নির্ঘাৎ বুঝেছি। নিখিলেশ নিঃশব্দে নিজেকে নিজে বলল। কোথাও ঠাঁই ছিল না, ওই লোকটা আমাকে ঠাঁই দেবে। তার বিনিময়ে শুনতে হবে ওর জীবনের যত গপ্পো। এর চেয়ে ঠাণ্ডা প্ল্যাটফরমে হি-হি হাওয়া কেঁপে কেঁপে. মাঝে মাঝে ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সময়টুকু কাটিয়ে দিলে হত না ? নিখিলেশ অবশ্য এই সমস্তই খুব বাস্তব বোধ বুদ্ধিচেতনা থেকে নিজেকে বলল।)

॥ দুই ॥

এতক্ষণ ছিল খোলা মাঠ, এবার একেবারে বেআব্রু প্রান্তর। অনেক দূরে টিমটিমে একটা আলো দেখিয়ে লোকটা বলল. ওই আমার বাসা। আর দশ মিনিট কি মিনিট পনেরো মাত্তর। তারপরেই পেঁছে যাব।

—পেঁছে যাব ? জিগ্যেস করল নিখিলেশ।

—যাবই যাব। কাল আপনাকে ঠিক সময়ে তুলে পাঠিয়েও দেব।

নিখিলেশ বলল. বাঃ. দারুণ বলেছেন তো। যাবই আমরা যাবই। তারপর যে যেখানে ছিলাম. সেখানে ফিরি অথবা আরও এলোমেলো এগিয়ে যাই। সব এগোনো কিন্তু অগ্রগতি নয়। সাপও এগোয়। সে কি এগোয়. না এলোমেলো বয় ?

—হঠাৎ ভুল স্টেশনে নেমেছেন বলে আপনার সব কিছুতে সন্দেহ হচ্ছে। লোকটা বলল।—জানেন. সব কিছুকে সন্দেহ করবেন না। করতে করতে তবে নিজের উপরেও সন্দেহ হবে। তখন বাঁচবেন কী নিয়ে ? কিছু ছাড়ুন, কিছু রাখুন. এরই নাম বাঁচা। এই বলে লোকটা বেশ খানিকক্ষণ ধরে বাস্তব হাসল। তারপরে ঢোঁক গিলে সে যা করল, নিখিলেশ তা আশাও করেনি। একটা লেবেনচুষ তুলে দিল নিখিলেশের হাতে. অন্ধকারে। যেখানে মাঠ মিলিয়ে গিয়ে এসেছে প্রান্তর। কিন্তু আকাশ নেই. হেলে পড়েছে, যে তারাটা জ্বলজ্বল করছিল. সেই তারাটাও।

অচিরে ভোর হবে। ওইটুকুই ভরসা. ওইটুকুই সাহস।

—আপনি আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন। ওয়েটিং রুম না হয় না-ই ছিল। ওয়েসাইড স্টেশনে ওসব থাকে না. জানি। তবু প্ল্যাটফরমে শুয়ে থাকতে তো পারতাম।

—শীত করত, পিঠে কাঁকর ফুটত। খোলা প্রান্তরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে লোকটা বলল।—তাছাড়া, সে পুনরপি সংযোগ করল, আমার কথা তো আপনাকে বলা হত না। জানেন, আমি, এই ঢ্যাঙা আমি স্বপ্ন দেখতাম। কম বয়সে গায়ে অসুরের জোর ছিল। মাথায় অসীম বুদ্ধি ছিল মাস্টার মশাইরাও বলতেন।

—স্বপ্নের কথা কী বলছিলেন? জিগ্যেস করল নিখিলেশ। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে, ওই প্রান্তরে, যেন প্রোথিত, যেন বৃষকাষ্ঠ।

—বলব, বলব, সবই বলব। নইলে আপনার সঙ্গে আজ আমার দেখা হবে কেন? প্রথম কথা আমি একটি ব্যর্থ মানুষ। সে যা হতে চেয়েছিল, তা হতে পারেনি। সে যাদের চেয়েছিল, তারা তাকে চায়নি। সেও চায়নি কাউকে—প্রত্যুত্তরে থুৎকার ছিটিয়ে দিয়েছে। অঘাটায় একদিন এসে নেমেছিল, একটা তারার ভুল ইশারায়। সেটা তার অভিশাপ না আশীর্বাদ?

যেন হড়হড় করে বমি করছে, এইভাবে লোকটা বলে গেল, জানেন, আমি স্বপ্ন দেখতাম। সবাই দেখে। আমার দেখাটাই প্রায় ব্যায়রামের মতো ছিল বলতে পারেন। একটা ব্যর্থ লোক কিছু তো করতে পারে না, শুধু দেখতে পারে। কী দেখতে পারে? না স্বপ্ন।

লোকটা তখনও বলেই চলেছে, যে বড়ো চিত্রশিল্পী বা সংগীতশিল্পী হতে চায়, অথচ পারে না, ভগবান তাকে স্বপ্ন দেন। যে লিখতে চায়, তিনি তাকে দিয়ে স্বপ্নে অপরূপ সব রূপের কথা লেখান। উত্তর মেরুতে সূর্যোদয় দেখাই যার কামনা, স্বপ্নে তার সেই কামনাও মিটিয়ে দেন তিনি। এমন কি যা সবচেয়ে প্রার্থনার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার—সেই শয্যায় নিমগ্ন নারীদের স্বপ্নে তচনচ করে দেন কে? তিনি। একমাত্র তিনিই তো!

লোকটা বলছিল, দূর দ্বীপে আমরা সবাই যাই না। শুধু যেতে চাই। কে নিয়ে যায়? কোথায় সেই ভেলা? তার নাম স্বপ্ন।

দেরি হয়ে যাচ্ছিল বলে নিখিলেশ একটা কথা না বলে পারল না। বলল, সব স্বপ্ন সত্য হলে আপনি খুশী হতেন?

—দূর! লোকটি বলল। সত্য শুধু মাটিতে সাপের মতো হিস্‌হিস করে। আর স্বপ্ন পাখির মতো উড়ে যায়। কখনও বা তাদের ঘন ডানায় ঢাকে। জানেন, আমরা স্বপ্নে কত কী বিড়বিড় করে বলি। আমরা স্বপ্নে কত কিছু দেখি। সব বলা যদি লেখা হয়ে যেত তবে?

লোকটা চাপা হেসে বলল, তাহলে ছাপানো বই-টই কেউ পড়তই না! কারণ স্বপ্নের বলাটা যদি লেখা যায়, তবে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে দুনিয়ার কোনও কলম পারে না। তেমনই আমরা স্বপ্নে কত রঙ দেখি। সব যদি সেই মুহূর্তে আঁকা হয়ে যেত, যদি তেমন কোনও যন্তর না হোক, মন্তর থাকত, তবে তুলিতে আঁকা ছবি দেখত কে? আঁকা ছবি ভিতরের ভয়-ভালোবাসা, আলো অন্ধকারের কতটুকু আর তুলে ধরতে পারে? স্বপ্নে অবিকল, সব অবিকল।

লম্বা লোকটা বলল, আমি জমি নিয়ে একটু কেনা-বেচার মজায় মজলাম। স্বপ্ন? বলতে পারেন। চারদিকে জল আর ধানের শিস্। নিচে সবুজ ফসল

আর উপরে নীল, সেখানে স্বপ্ন দেখব না?

বলতে বলতে সে যেন উত্তেজিত হল। বলল, না ঘুমোলে স্বপ্ন দেখা যায় না আপনি তা-ই ভাবছেন বুঝি? ভুল থিওরি, সব ভুল। ঘুমোলে স্বপ্ন তো সবাই দ্যাখে, এমন কি হয়তো উইপোকা, আরশোলা ইত্যাদি যত সব জীব আর প্রাণী। কে জানে, হয়ত তারাও দ্যাখে। জেগে জেগেই যদি স্বপ্ন দেখতে না পারলাম তবে আমি আর মানুষ কী? আমি জেগেও অনেক স্বপ্ন দেখেছি। দেখি।

ওই টিমটিমে আলোয়, ওই আলো-অন্ধকারে লোকটার গলা হঠাৎ যেন বড়ো করুণ, বড়ো কান্না হয়ে গেল। বলল, তখন স্বপ্ন দেখেছি চারপাশে যত জমি সব আমার। ওই খালে যত মেয়ে জল ভরতে আসে, ইচ্ছে করলে তারাও আমার।

সে একটু থামল। সেই স্বপ্ন সফল হয়নি। হয়নি ভাগ্যিস! হলে তো বড়ো জোর শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই, এই পদ্যটা আমার হত। হল না, আমি ফেল করলাম, তাই আমার সমস্ত ইচ্ছে আর লোভ আমার সমস্ত লোভ আর বাসনা হয়ে গেল স্বপ্ন, হয়ে গেল আকাঙ্ক্ষা।

॥ তিন ॥

ওরা মাঠ পেরিয়ে প্রান্তর, প্রান্তর পেরিয়ে অবান্তরে পৌঁছে যাচ্ছিল! লোকটির কথা তখনও থামেনি। বলছিল, ভাবছেন, আমার স্বপ্ন সত্য হলে কী হত? আচ্ছা, পালটা প্রশ্ন আপনাকেই করি।

লোকটা বলল, আচ্ছা, কোনও চিত্রকর স্বপ্নে একটা ছবি দেখেছিল। তার কিছুটা সে এঁকে রাখল। কিন্তু কতটুকুই বা! যা দেখেছিল, তা তো আঁকা সম্ভব নয়! একই সত্য লেখক, গায়ক, স্থপতি প্রভৃতিদের সম্পর্কে। যদি যা ভেবেছি, তা রেখেও দিতে পারি, তা যদি লিখে বা এঁকে রাখি, তবু তা তো যতটুকু করলাম, তা-ই থেকে যাবে। তার চেয়ে আরও দূর, আরও নিরন্ত নিরন্তর তো হবে না! সেখানেই সে থেকে গেল। তাকে থামিয়ে রাখল। কারা? না, শিল্পী, লেখক, ভাস্কর ইত্যাদি বলে অসীম অহমিকা যাদের তারা।

একটু দম নিল লোকটা। বলল, স্বপ্ন সত্য হয় না বলে আমরা হায় হায় করি, তাই না? কিন্তু সত্য হলে স্বপ্নও যে বড়ো ছোট্ট হত। বাসী হয়ে যেত। যেমন একটু আগেই বলেছি, একটা ছবি বা মূর্তি যেই তৈরি হয়ে গেল সেটার আর নড়বড় নেই। যেন উত্তর দিকের স্থির স্থাণু স্থাবর পাহাড়টার মতো জিনিস।

লোকটা বলে গেল, সমুদ্রের ওপারে কী আছে দেখবে বলে কেউ বেরিয়ে পড়ল। বেশ তো। দেখতে পেলে তো দেখার আর কিছু রইল না। সব ভেনচার আর অ্যাডভেনচারের ব্যাপারটাই এই। হয়ে যায়। পরে আর হওয়ার কিছু থাকে না।

সে বলল, সে বলল। ছুঁলেই যে একটা চেহারা মিলিয়ে যায়, তার চেয়ে না ছোঁয়াই তো ভালো। সে বলল, সত্য বড়ো কৌটোয় পোরা, বড়ো নিশ্চিত, বড়ো ক্ষুদ্র। তার চেয়ে অনিশ্চিত স্বপ্ন, আহা স্বপ্ন, যত দিন দেখি, তত দিন যেন কোনও অনিশ্চিত অফুরন্তকে পাই। যে-মেয়েটিকে চাই, তাকে না পেলে সে বড়ো কষ্ট, সে বড়ো রক্ত। কিন্তু পেলে সে যে কিছুদিন যেতে না যেতে একেবারে ব্যবহৃত, সে বাসি মুড়ির চেয়ে মিয়োনো। এই তো জীবন!

ঢ্যাঙা লোকটা বলল, সেই তো ভালো। সেই তো মন্দ, সেই তো জীবন। আবার বলল, জানেন, কেন আমি এখনও এখানে পড়ে আছি? আমি আধখানা আছি বলে। সবটা হতে আমি চাই না। সার্থক হবে বলে, কাঠের ঠিকেদারি নেবে বলে যে-লোকটা একদিন একটা আঘাটায় নেমে পড়েছিল, তার আজ ধান-জমি নেই, মেছোঘেরি নেই।—তবু। তবু সে কি সার্থক, না ব্যর্থ?

বলতে বলতে হয়তো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল লোকটি। বলল, মশাই, ভাববেন না। কাল ভোরবেলায় আপনাকে খুব ভোরবেলাতেই আমি তুলে দেব। গাড়ি পেয়ে যাবেন।

এতক্ষণ বাদে নিখিলেশ কথা না বলে পারল না। ওই অদ্ভুত পরিবেশ তাকে কেমন একটা অদ্ভুত গলাও দিয়েছে। বলল, কালকের ইনটারভিউ কি পরশু হয়?

—হয়, হতে পারে। ট্রেন মিস করেছিলেন, বা এই রকম একটা কিছু বললে হতেও পারে।

—তা হয়তো পারে। ঠোঁট টিপে নিখিলেশ ভাবল।—কিন্তু চাকরিটা ধরা যাক যদি পাই-ই, তা হলেই বা কী হবে?

—আপনার দরকার নেই?

নিখিলেশ হাসল।—দরকার যথেষ্টই। নইলে কি রাতবিরেতে অ্যাদ্দুর চলে আসি? কিন্তু—(সে এখানে একটু গলা খাঁকারি দিয়ে স্বরটা সাফ করে নিল, তারপর হঠাৎ যেন মরিয়ার মতো, বলার ভঙ্গিতে সবখানি জোর ঢেলে দিয়ে বলল) কিন্তু কাজটা পেলে যা, না পেলে যে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

—বুঝেছেন তাহলে? ঢ্যাঙা মানুষটা যেন আরও ঢ্যাঙা, প্রায় তালগাছের আগা ছুঁয়ে, একটু বাঁকা গলায়, একটু বা জয়ীর ধরনে বলল।

—আপনিই তো বোঝালেন এতক্ষণ কথায় কথায়। স্বপ্ন ফলল মানে মোটে এক রতি সত্য হল। আর স্বপ্ন যদি স্বপ্নই থাকে? কিচ্ছু খোয়া যায় না। সময়, আকাশের সব নীল, নদীর যত জল, যত সবুজ খেত, যত দূর চাই, যত দূর যাই, সব আমার, সব আমার।

আমাকে সময়মতো তুলে দেবেন বলছেন? নিখিলেশ বলল।—না তুলবেন না। যদি তুলে দেন, যদি ইনটারভিউতে পার পেয়ে যাই, তবে তো সব ছোট্ট-খাট্টো নিয়মমতো? তখন এই আকাশ কোথায় পাব? কিংবা এই তারা? এত তারা? মেঘকে ফাঁকি দিয়েও ফুটে উঠেছে যারা, সেই সব তারা?

—লোকটি হাসল। আপনি তবে আকাশ আর তারার পীরিতিতেই

পড়েছেন ?

নিখিলেশ বলল, না, শুধু তাও নয়, যদি চাকরিতে বহাল হয়ে যাই তবে সব যে মাদুরের মতো গুটিয়ে যাবে ? আমি কী করে হবো আপনি ? না, তুলে দেবেন না। পথ দেখিয়ে নিয়েই এলেন যদি, থাকতে দিন। ভুল জায়গায় ভুল করে অনেকক্ষণ ঘুমোতে মানে ঘুমিয়েও আপনার মতো জাগতে দিন।

তিন জন

॥ এক ॥

[স্থান কোনও রম্য উপবন; সময় সায়াহ্ন]

"বিশ্বাস কর?"

"করি।"

"বিশ্বাস কর?"

"করি।"

"বিশ্বাস কর?"

"এই নিয়ে বারবার তিনবার বললাম তো—করি।"

"আমি একজনের বিশ্বাস ভেঙেছি, তবু?"

"তবু। মোটের ওপর বিশ্বাসটাকে তো উড়িয়ে দাওনি তুমি। কারও না কারও কাছে গচ্ছিত রেখেছ। মানুষ হিসেবে সেইখানেই তুমি সৎ আছ।"

"কী জানি। মনে হয় যেন শয়তানের বাণী শুনছি।"

"যাই বলো, রাগ করব না। দ্যাখ, ঈশ্বরের যারা ভক্ত, তাদের ভেতরকার চেহারা হনুমানের মতো। শয়তানই একমাত্র, যে ঈশ্বরের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, মিনতি তুমি যদি ইভ-এর বেশে দেখা দাও, আমি যুগ যুগ ধরে শয়তানের মতো চেয়ে দেখতে রাজি আছি।"

"অসভ্য।"

"অসভ্য? আমি তো ভাবতুম এটাই স্মার্টনেস। ব্ল্যাক মারকেটের দরে বিকোয়।"

"কিনছে কে মশাই। আমি ছাড়া তোমার খদ্দেরই বা কই?"

"জানি। তা ছাড়া, তুমিও বাজারের নয়।"

"ভারী বিশ্রী কথা বল তুমি।"

"মোহ ছুটছে বুঝি?"

"তোমার ছুটছে, সেইটেই বুঝি ঘুরিয়ে বলছ? জানি, তুমি এখন কোন ছুতোয় সরে পড়তে পারলেই বাঁচো। একটু মজা পাবে বলে ভিড়েছিলে, তাই না? এখন দেখছ অনেক জটিলতা, তাই পালাবার পথ খুঁজছ। তুমি ছাড়তে চাইলেও আমি সহজে ছাড়ছি না। আমরা, মেয়েরা অত কথায় কথায় ধরি আর ছাড়ি না।"

"বটেই তো। তার প্রমাণ তোমার স্বামী, অসীম, হাড়ে হাড়ে পেয়েছে।"

"ফের মনে করিয়ে দিলে তুমি। আচ্ছা তুমি কি আজকের সন্ধ্যাটা মাটি

করে দেবে, এই পণ করে এসেছ? আমাদের কত কাজের কথা ছিল।"

"ছিল বুঝি? এই যে তোমাকে ছুঁয়েছি, এই যে তোমার নিঃশ্বাসের সুড়-সুড়ি পাচ্ছি, তাতেই কি সব বলাবলি হয়ে যাচ্ছে না?"

• "দ্যাখো, বত্রিশ বছর বয়সে বিশ বছরের বাচ্চার মতো কথা বোলো না। মনে রেখো আমিও আর ষোল বছরের খুকীটি নই। একটিবারও সীরিয়াস কি হতে পার না? আচ্ছা, ভেবে বলো, আমাদের কি কোন রাস্তা নেই।"

"একটা রাস্তা তো সোজা, তোমার পছন্দ হল না। আমাকে যদি ছাড়, তা হলেই রাস্তা সাফ।"

"নিষ্ঠুর। আমাকে খালি ঘা দিতে ভালবাসো।"

"আর একটা—তুমি যদি অসীমকে ছাড়।"

"তার মানে—ডিভোর্স। ওরে বাবা, সে সব তো আইন আদালতের ব্যাপার। ছ্যাঁকা লাগিয়ে দাগী হতে পারব না। তা ছাড়া শুনেছি ওতে অনেক প্রমাণ-ট্রমান লাগে।"

হ্যাঁ। ব্যভিচার নয় অত্যাচার। নয় তো—"

"অসীম সম্পর্কে ব্যভিচারের কথা কেউ বিশ্বাসই করবে না। অত্যাচার? সেটা সম্ভব বটে। জানো, আজকাল ওর ধরনধারন কেমন বদলে গেছে, কী ভাবে যেন তাকাচ্ছে, ও বোধ হয় সবই বোঝে। নির্ঘাত আমাকে—আমাদের সন্দেহ করে। সে দিন অকারণে, সামান্য ছুতোয় আমাকে মারল। গায়ে এখনও ব্যথা, বুকে পিঠে এখন দাগ আছে।"

"ব্যাস, তবে তো হয়েই গেল। ব্যথাটা তো দেখানো যাবে না, বুক আর পিঠ আদালতকে দেখাতে পারবে?"

"আমার সম্পর্কে তোমার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। ইতর। জানোয়ার!"

"নিশ্চয়। তোমার সঙ্গে সেখানেও অবশ্যই মিল আছে, নইলে আসবে কেন তুমি। জানোয়ারই জানোয়ারকে খুঁজে নেয়। দেবতাদের সঙ্গে সহবাস, মিনতি, সে যে নেহাত নিরিমিষ, আলুনি।"

"অসীম যখন আমার গায়ে হাত তুলল, আমিও ছেড়ে দিইনি। আঁচড়ে কামড়ে ওকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছি। গায়ের জোর ওর একলার নাকি।"

"তোমার মনেরও অনেক জোর।"

"কই—আর একটা কি রাস্তা আছে, বললে না তো তুমি?"

"আরও একটা আছে মিনতি। সেটা দৈব। শুনলে কি তোমার সহ্য হবে।"

"বলো।"

"অসীমের মৃত্যু।"

"রাক্ষস কোথাকার। ভীষণ ভয় করছে আমার এখানে, তোমার কাছে বসতে। আমার হাত আরও জোরে চেপে ধরো, কাঁপুনি থামাও। এত ভয়, সারাক্ষণ ভয়, যেন পিছনে তাড়া করে, আর পারি না। এই ভয়ই কি আমাকে তোমার কাছে টেনে আনে? জানি না। ভয় দিয়ে বাঁধা ভালবাসার ফাঁস খোলার উপায়টা শুধু বলে দাও।"

॥ দুই ॥

[স্থান গৃহকক্ষ, কাল—সন্ধ্যা]

(মনোলোগ)ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ মিনতি। এই তো ফিরলে, এক্ষুনি আবার বাইরে? তোমার সঙ্গে তো দেখাই হল না এক রকম। এসেই ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে ড্রয়ারের ওপর, যেটা প্রথম বছর আমরা দু'জনের জমানো টাকায় কিনি। মনে আছে? চেয়ারে বসে পা দেখালে, সেই সঙ্গে গুন গুন করে গাইলে কী একটা গান। প্রায় তখনই বাথরুমে গিয়ে ঢুকলে, আমি ঝর্ঝর ধারা-জলের আওয়াজ পেলাম। আর এই গান, তখনও চলছে। ঘরেতে গুন গুন করে ভ্রমর আসার গান। এ গান তুমি গেয়েছ একলাই, নিজেকেই শোনাতে, আমাকে নয়। ভ্রমর তোমাকে কার কথা শুনিয়ে গেল মিনতি?

তাকে আমি বুঝি চিনি? ওই যে তুমি সেজেছ সাবানে ফাঁপানো চুলের ফাঁকে সিঁদুরের চিহ্ন ঢেকেছ, কিন্তু কপালে এঁকেছ বড়ো একটি ফোঁটা—কার জন্যে আমি জানি। চৌকাঠের বাইরে, চৌকাঠের বা কেন, এই ঘরেই তোমার চোখের আকাশ জুড়ে তার ছায়া পড়েছে দেখতে পাচ্ছি।

মনে পড়িয়ে দেব না মিনতি, একদিন আমার জন্যেও ওই সাজ ধারণ করেছ। সকলের চোখ এড়িয়ে ছিঁটে ফোঁটা কত দেখাদেখি, কত অপেক্ষা—আতঙ্ক, সংকল্প, কত কী? তারপর কত যুদ্ধ করে আমরা ঘর বেঁধেছি।

তার পরেই কি সব ফাঁকি, সব পানসে হয়ে গেল! যেই ভয় আর জেদ রইল না অমনই পাখির বাসা হাওয়ায় নড়ল? আমার স্বভাব, আমার স্বরূপ, তোমার কাছে তার দাম রইল না, একঘেয়ে, একঘেয়ে, সব বর্ণহীন, অরুচিকর বিশ্রী। নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক সম্পর্কেও তোমার বিতৃষ্ণা, বলতে লাগলে গা ঘিনঘিন করে। বাইরের জগৎ কী দেখিয়ে তোমাকে এমন প্রগাঢ়ভাবে আকর্ষণ করল মিনতি?

বারবার হাতঘড়ি দেখছ, যাও তবে, তোমাকে বাধা দেব না। আজ আমি শুধু বর্ণহীন একটি ব্যক্তিত্ব নই, আমি অজুহাত। কিছুদিন যাবৎ খুক খুক করে কাশছিলাম, তুমি টের পাওনি। পাবে কী করে, আজকাল ভুলেও তো তাকাও না। লুকিয়েছি অনেক দিন, আর পারলাম না। কাল সকালে ডাক্তারের কাছে গেলাম। আজ সকালে এক্স-রে রিপোর্ট যা বলার তা বলল।

বাধ্য হয়েই বিনে মাইনেয় ছ' মাসের ছুটি নিতে হল মিনতি, কারণ ছুটি আর পাওনা নেই। এই ছ'মাস, কিংবা যতদিন আছি, ততদিন আমি তোমারই আশ্রিত, তোমারই গলগ্রহ মিনতি। জীবন থেকে বাইরে কবেই তো ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ, এবার ঘর থেকেও কি রাস্তায় বের করে দেবে?

এই মুহূর্তে, মিনতি, মনে হচ্ছে তোমাকে ভীষণ আঘাত করি। গায়ে শক্তি নেই, নইলে থেঁতলে দিই।

সুসজ্জিতা, অভিসারে উদ্যতা তোমাকে ভীষণ হিংসা হচ্ছে, আমাকে হিংস্র করে তুলছে। রজনী গন্ধা শুকিয়ে ফুটছে রক্তজবা...এই তো আমি পারলুম,

থর থর হাতে ওষুধের গেলাসটা তুলে তোমাকে তাক করে ছুঁড়লুম। রক্ত গড়িয়ে গড়াচ্ছে, তোমার কপালটা কেটে গেছে মিনতি। রক্তে-সিঁদুরে মিশে গেল। এস মুছিয়ে দিই, এস বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় তোমাকে অস্থির করে দিই। কিংবা যদি তুমি আমার শিয়রে বোসো, অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে কপালে বোলাও, আমি চোরের মতো, না, না, ডাকাতের মতো তোমার কব্জি মুচড়ে দিই।

জানি, এসব, আমি কিছুই পারব না। অকৃতকার্য, আমার কয়েকটি ইচ্ছা মাত্র। তুমি যাবেই, আটকাতে পারব না। যাও তবে মিনতি। আমি, থাকব। ইচ্ছে হলে ফিরে এস।

॥ তিন ॥

[সময় রাত্রি, স্থান কোনও "খালি কুঠি"]

"এত দেরি করলে? আমি সেই কখন থেকে বসে আছি। সিগারেটের প্যাকেটটা অর্ধেক খালি হয়ে গেল। ভাবছিলুম তুমি আর এলেই না।"

"ঘন্টাপিছু এই ঘরটার ভাড়া কত টাকা একদিন বলেছিলে না? সব টাকা-টাই নষ্ট হল তোমার?"

"টাকাটাই সব নয় মিনতি। সময়! কত কষ্টেসৃষ্টে এই সময়টুকু বাঁচাই বল তো, কত ভয়ে ভয়ে আসি। তা থেকেও যদি ঘন্টা দেড়েক চুরি যায়—"

"চোরেদেরও তবে চুরি যায় বলো! আমরা চোর ছাড়া আর কী? আচ্ছা বল তো, তারাও থানায় গিয়ে এজাহার দেয়?"

"ফাজলামো রাখ। এতখানি দেরি হল কেন তোমার, অসীম আটকেছিল।"

"কৈফিয়ত চাও? বাঃ বাঃ, মজা তো মন্দ নয়। বাড়ি থেকে বেরুতে হলে বের হচ্ছি কেন সেই কৈফিয়ত? এখানে পৌঁছতে দেরি হলে আবার কৈফিয়ত? তুমিও কি আমার স্বামী?"

"তুমি আজ যেন কেমন করে কথা বলছ মিনতি। ঠিক করে জবাব দাও, অসীম আটকেছিল?"

"না। আটকাবে কী করে। ওর খুব অসুখ।"

"অসুখ? কী অসুখ?"

"জানি না। বাড়ি ফিরে দেখি, বিছানায় শুয়ে আছে। আমাকে দেখে বিড়বিড় করে অনেকক্ষণ কী যেন বকল। ভাল বুঝলাম না। তখন আমি বেরিয়ে আসার জন্যে তৈরী। ও আমাকে একটা গ্লাস ছুঁড়ে মারল। দ্যাখ, কপালের কাছটা কি কেটে গেছে?"

"বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। তুমিও ফিরে মারলে তো? মারামারি করে তবে এখানে আসতে পেরেছ?"

"মারতে আর পারলাম কই।"

"কেন, তুমি একলা, ওর রোজগারে খাও না, তুমি স্বাধীনা।"

"তবু। ওর চাউনি সহ্য করতে পারছিলাম না আমি। চোখে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তবু মনে হচ্ছিল যেন ধ্বক ধ্বক জ্বলছে, যেন ছুঁচের মতো বিঁধছে। ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম আমিও, রাগে কাঁপছিলাম, আর একটু হলে ঝাঁপিয়েও পড়তাম। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, পারব না। ও অসুস্থ বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে, জোর নেই বলেই ওর জোর যেন ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে। ওর সঙ্গে আজ আর পারব না। আমার ফণা নেতিয়ে পড়ল। জানো, ওর চাকরিটাও নেই? ও আমাকে বলেনি, কিন্তু আমি জানি। ওর অফিসে ফোন করে দু'দিন পাইনি। শেষে নিজে গিয়ে খোঁজ করে জেনেছি। ওর চোখ অন্য দিন শুধু জ্বলে, আজ সে-চোখে জলও দেখেছি।"

"ও-সব কথা থাক মিনতি। হেঁয়ালি বন্ধ কর। কাছে এস।"

"এই তো এসেছি। শেষ পর্যন্ত আসতে তো পেরেছি।...টানাটানি কোর না আমি নিজেই খুলছি। তুমি যা ছটফটে, শাড়িটা লাট করে ফেলবে।...না, না, এটা না, এটা থাক। গিঁট পাকিয়ে যাবে। উঃ, এত জোরে চেপে ধোর না, লাগছে।"

"কোথায় লাগছে, কেন লাগছে মিনতি? জোরে তো ধরিনি। শুধু তোমার কানের লতিতে ঠোঁট রেখেছি, চূর্ণ চুল আস্তে আস্তে ঠেলে দিচ্ছি পেছন দিকে। আর কত আলতো ভাবে আদর করব? তবে তো সব নিরিমিষি, আলুনি।"

"ভাল লাগছে না।"

"ভয় করছে? মিনতি আমার কানে মুখ রেখে বলো। কিন্তু আর তো ভয় নেই, ভয়ের কারণ নেই। অসীম হঠাৎ এসে পড়বে না, আসতে পারবে না। তুমিই তো বললে সে বিছানায়। সুতরাং ভয় নেই।"

"ভয় নেই বলেই তো। আমারও কাছে ঠিক এক্ষুনি সব আলুনি। যতক্ষণ ভয় ছিল, স্বাদও ছিল। এ কী করে হয়, বলতে পার? গায়ের জোর হারিয়ে একটা লোকের জোর বাড়ল, ভয় ঘুচে গিয়ে যত রাজ্যের ভয় আমাকে ভর করল। যাক, কী চাও, তাড়াতাড়ি নাও। সব পানসে ঠেকছে। মনে হচ্ছে, যদি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাই, কারও মাথার কাছে বসি, অন্ধকারে হাত বুলিয়ে দিই তার চুলে; জানি না, জানি না, খুব দেরি হয়ে গেছে, তবু সে আবার সেরে উঠবে কিনা, ভয়ে ভয়ে ভাবব। কাঁটা দেওয়া শরীরে মনে প্রগাঢ় ভালবাসার স্বাদ হয়ত ফিরে পাব।

প্রেম তবু প্রেম নয়

অতনু, তুমি একটা পাগল।

এই প্রথম জানলে?

জেনেছি অনেক দিনই, আরও একবার জানলাম। কিংবা ঠিক করে বললে বলা যায়, তুমিই জানালে।

পাগলামির চার্জ মেনে নিলাম শুচিতা। মামলার আসামীরা যেভাবে আই প্লিড গিলটি বলে, অনেকটা তাই।

কেউ বলে নাকি? পৃথিবীতে কেউ নিজেকে অপরাধী বলেছে, আজ পর্যন্ত এমন কথা তো শোনবার কোন সুযোগ ঘটেনি অতনু।

অনেকের ঘটেনি, তাই বলছ? যা অনেকের ঘটেনি তা কখনও কারও ঘটে না, এটা কিন্তু ঠিক লজিক হল না। দুনিয়ায় ব্যতিক্রমও আছে। আর ব্যতিক্রম আর সাধারণ নিয়ম, এই দুটোর ওপরই গোটা পৃথিবীর চাল-চলন দাঁড়িয়ে আছে।

বরং বল, চলছে কিংবা ঘুরছে, সেটা বিজ্ঞানের দিক থেকে ঠিক তো হবেই, বাংলার দিক থেকেও হবে নির্ভুল।

শুচিতা, আমরা কি শুধু বিজ্ঞান আর বাংলার আলোচনা করতে এখানে এলাম?

আর কি অতনু, আর কি?

আরও কিছু আছে।

বলে অতনু গম্ভীর ভাবে মাথায় যেন বিচারকের হাকিমী পরচুলো পরে নিল। আর তখন স্বতই আসামী শুচিতা বলল, সেইখানেই তো আমার ভয়। অত বড় চাকরি ছিল তোমার সেকেন্দ্রাবাদে, হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে হুট করে চলে এলে কলকাতায়—লোকে কী বলবে বলো তো?

লোকে যা বলবে, সে তা তুমি আগেই বলে দিয়েছ, পাগল, কিন্তু এই পাগলামি আমি এই প্রথম করলাম নাকি? চাকরি তো আগেও ছেড়েছি কতবার, যে-কোন ছুতোয়, যে-কোন খামখেয়ালীপনায়। তখন লোকে কিছু বলেনি?

লোকে তখন কি বলেছে না বলেছে, সে-কথা একটু পরে। কিন্তু যতদূর জানি, তখন তুমি একটা পেয়ে আরেকটাকে ছাড়তে।

অতনু এবার খুব দুষ্টুর মত হাসল।--যেমন তোমাকে ছেড়ে তৃষাকে পেয়েছিলাম সেই ইঙ্গিত করছ?

এবার গম্ভীর হওয়ার পালা শুচিতার। গাম্ভীর্য আনতে ছড়ানো চুল গুটিয়ে সে মাথায় একটা জটা ধরনের খোঁপা বাঁধল।—চাকরি, প্রেম, বিয়ে, সবই

তোমার কাছে এক, না? আর এই নিয়ে তুমি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে আসো?

অতনু হাসল।—মেয়েদের সঙ্গে কতটুকু আর মিলি আর মিশি তুমি নিজেই বুকে হাত দিয়ে বল তো? যতটুকু মেশামেশি করি তার শতাংশও কিন্তু মেলা নয়। মেলা একটা আলাদা জিনিস, তোমরা জানো না। কোন মেয়েই জানে না। আমি জানি।

ইতিমধ্যে স্বকীয় অস্থিরতায় শুচিতা তার জড়ানো চুল ফের এলো করে দিয়েছিল। হয়তো এতে তাকে একটু বেশি ব্যক্তিত্ব একটু বাড়তি রহস্য দেবে, এই আশায়, যে আশা সব মেয়েই লালন করে। যে রহস্যকে সহজাত কোন তাগিদে পুষে রাখতে চায়।

অতনু লক্ষ্য করল, অথবা করল না। ছেলেরা এ রকম করে। দ্যাখে অথচ দ্যাখে না। দেখেও দ্যাখে না। সোজা-কথায়, না দেখার ভান করে। ওই ভানটা তাদের খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের মতই একটা হাতিয়ার। ভাবে, মেয়েরা ওই অস্ত্রেই ঘায়েল হবে।

অতনু বলে যাচ্ছিল, এই বয়সে ক'টা আর মেয়ের সঙ্গে মিশি? ছেলেদের সঙ্গে মিশি তার চেয়ে ঢের বেশি। শুনলে তুমি হাসবে, জানো, একটা বয়সের পরে আমরা বোধহয় আবার হোমো-সেকসুয়াল হয়ে যাই। না না, শুচিতা, এটাকে অসভ্য কথা ভেবে তোমার শ্যামপু করা ফাঁপানো চুল দিয়ে কান দুটোকে ঢেকে ফেল না। নিজে থেকে ওরা লাল হতে চায় তো হোক, জবাফুলকে জোর করে কি অপরাজিতা বানানো যায়?

তবু একটু রেখে-ঢেকে বলবে তো!

আমি রেখেই বলছি, তুমি মিছিমিছি ঢাকছ। এখানে হোমো-সেকসুয়াল বলতে আমি শারীরিক কোন ব্যাপার বোঝাতে চাইনি। যদিও পাশ্চাত্যের দেদার দেশে আজকাল তাতেও কেউ দোষ ধরে না। অসকার ওয়াইল্‌ড্‌-এর দেনা ওরা সুদে-আসলে শোধ করছে।

যা বলবার সোজাসুজি বলে ফেল। তোমার ওই বিচ্ছিরি পণ্ডিতিতে আমার একটুও রুচি নেই।

আমি বলতে চাইছিলাম শুচিতা, স্রেফ এই কথাটা যে, এই বয়সে আমি, একটা বয়সে আমরা সবাই ফের যেন সমকামী হয়ে যাই। অন্তত বয়স্ক পুরুষেরা। যার মনের বয়েস হয়েছে সে। এমন পুরুষবন্ধুর সঙ্গ চায়, সান্নিধ্যে আনন্দ পায় যে মনের দিক থেকে প্রাপ্তবয়স্ক। এখানে শরীরের কথাই ওঠে না। সমানে-সমানে। সমকামিতার এই বিশেষ মানেটা এবার বুঝেছ?

পুরুষবন্ধুরা কি দেয়?

দেয় বুদ্ধি, দেয় দীপ্তি, দেয় অনেক অনেকক্ষণ ধরে অনেক অনেক প্রসঙ্গ নিয়ে গভীর চিন্তা বিনিময়ের আনন্দ।

অতনু, চাকরি ছেড়ে তুমি বোকামি করেছ, কিন্তু সে-কথা পরে। তুমি যে একটু বেশি চালাক হয়েও ফিরেছ সেই সেকেন্দ্রাবাদ থেকে, সে-কথা আমি

বলতে বাধ্য। যেমন, তুমি পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে শুধু আনন্দের কথাই বললে, ফুর্তির কথা বললে না তো?

ওদের সঙ্গে পাত্তরের পর পাত্তর ঢেলে যে-রকম জমে, সেই কথা বলতে চাইছ? শুচি, তুমি গোটা ব্যাপারটাকেই কিন্তু বড় খেলো করে দিচ্ছ।

আরে দূর দূর, শুধু পাত্তরের পর পাত্তরের কথাই বলব কেন? তা কি জানি না, তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমরাও তা কি চাখি না?

চেখেও সুখ পাও না, সেই সাধুপনা শোনাচ্ছ?

এবার শুচিতা অতনুর গালে আলতো হাতে একটা চড় মারল—বোকা ছেলে, সুখ পাব না কেন! পাই। একটু একটু। যতটা পাই তার চেয়ে বেশি পেয়েছি বলে ভাব দেখাই। যতটা পাই তার চেয়ে ঢের বেশি সুখ তোমাদের দিই। তোমরা সুখী হবে ভেবেই আমরা চোখ দুটোকে সুখে জ্বলজ্বল করে তুলি।

তবে?

আমার তবেটা, এক কথায়, তোমাদের বদমাইসি। যেমন অতনু, আজও তুমি আনন্দ থেকেই খল্বিদানি জীবানি জায়ন্তে টাইপের বুকনি ঝাড়লে (দ্যাখ, আমরাও দু-চার পাতা কেতাব উলটেছি) অথচ একবারও মুখ ফুটে না বললে ফুর্তির কথা, না বললে সুখের কথা।

এবার অতনুকে একটু কাশতে হল, ধরাতে হল একটা সিগারেট। ধোঁয়া ছেড়ে কাশি না এলেও, যতটা পারে ততটা কাশির শব্দকে তার গলায় নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে অতনু প্রথমে তার টাইয়ের ফাঁস আলগা করে, পরে নটটাকে পাকা উইণ্ডসর টাইপের করে দিয়ে শুচিতাকে কি ইমপ্রেস করতে চাইল (আহা রে, ছেলেরা কি ছেলেমানুষ, শুচিতা ভাবল মনে মনে)?

অতনু বলছিল, পুরুষেরা পুরুষবন্ধুদের ফুর্তি দেয়, আর মেয়েরা দেয় সুখ, তুমি কি এইটেই বলতে চাইছ?

শুচিতার উত্তরঃ মেয়েরা কি দেয় কি দেয় না বা দিতে পারে না, সে-কথা না হয় তোমার কথামৃতেই শ্রবণ করা যাবে। পুরুষবন্ধুদের বেলায় তুমি কিন্তু ফুর্তি বলনি, বলেছিলে আনন্দ।

ঠিকই বলেছিলাম, আর যা বলেছিলাম তা তোমাকে বোঝাতে চাইছি না। মেয়েরা কি দেয় বা দেয় না অথবা দিতে পারে না জিগ্যেস করছ? তবে শোন। মেয়েরা অনেক দেয়! প্রথমে তো পাহাড়, তারপর উপত্যকা, তারপর হ্রদ, নীল সায়র বা সাগর, যা-ই বল না কেন। সেকেলে কবিরা সমস্ত উপমা দিয়ে রেখে-ছেন। হয়তো উত্তুঙ্গ, নিশ্চিতই উত্তেজক, ছোঁয়ামাত্র একশো দশ ভোল্ট, সাবধান। আর উপত্যকায় স্কীয়িং এবং সরোবরে হাবুডুবু, সব সত্যি। কিন্তু চিরকালের কবিরা এই একটা মিথ্যা কথা লিখে গেছে শুচি, কোন চোখের নীল অতলে হাবুডুবু খাওয়া যায়, হারিয়েও যাওয়া যায় হয়তো, কিন্তু ভরাডুবি ঘটে না।

কোন কালে না? ট্রয়, হেলেন, সীতা, সব মিথ্যে?

বললাম তো।

এবার আল্‌তো চাপড়ের বদলে আল্‌তো করে কপালে ঠোঁট ছোঁয়ানোর পালা অতনুর।—ও সব সেকেলে কবিদের কান্ড। মরা লাইনের পর লাইন, যেমন এই কি সেই দুটি চোখ দ্যাট লাঞ্চড্‌ এ থাউজ্যান্ড শিপ? ওই মড়া পরবর্তীকালের পাঠকেরা বহন করে চলেছে। পড়ুয়াদের শ্মশানবন্ধু বানাবার অধিকার কোন নাকে-সর্দি বুকে-কফওয়ালা কবির ছিল না। সেই হিসেবে বাল্মীকি একটু চতুর, সীতাকে একেবারে পাতালে সেঁধিয়ে সমস্যা মিটিয়েছেন। আমরা যেভাবে একালে ক্রশওয়ার্ড পাজল্‌ সলভ্‌ করি। কিন্তু আমার কথাটা ছিল আলাদা। তুমি ভুলেছ। বয়স্ক বুদ্ধির রোদ্দুরে পিঠ পোহানো পুরুষেরা পরস্পরকে কি দেয়। যদি বল, আনন্দ নয়, শুধু সুখ, তবে শব্দ নিয়ে ঝগড়া করব না। সুখ তো সুখই সই। আসল কথা, একটা বয়েসে ছেলেরা ছেলেদের চায়।

ঠোঁট বেঁকিয়ে শুচিতা বলল, কেন, সেই বয়েসে শরীরে আর তেমন জুত থাকে না বলে?

এবার কিন্তু তোমাদের মেয়েলি ভাষায় তুমিই অসভ্য কথা বলছ। মন আরও তেজীয়ান হয়ে ওঠে, আগুনের মত আরও লকলকে। সেই মন যা চায় পুরুষ বন্ধুদের মধ্যেই তা পায়, এই সোজা কথাটা মানতে তোমার এত সময় লাগছে?

শুচিতা বলল,—যদি বলি, একটা বয়েসে মেয়েরা শুধু মেয়েদেরই চায়?

এইখানে হো-হো করে হেসে উঠল অতনু।—ওইখানেই বিধাতা তোমাদের মেরে রেখেছেন শুচিতা। আমি যদি এখন বলি মেয়েরা কোন বয়সেই মেয়েদের সত্যি সত্যিই চায় না, যতই গঙ্গাজল আর বকুল ফুল পাতাক, আসলে সবই চোখের বালি, বালি আর কড়কড়ে বালি, তবে সৃষ্টির একটা সত্য কথাকে বলে দেওয়া হবে। এমন সত্য যা আমি কোন মিনারে দাঁড়িয়ে 'শুন্বন্তু' বলে ঘোষণাও করতে পারি।

অহংকারী পুরুষ! বলে এলোচুল শুচিতা অতনুকে দুটি হাতের থাবায় শয্যাশায়ী করল। কিন্তু দমবার পাত্র নয় অতনু, বলে উঠল, মেয়েদের এইটেই যা মনোরম অথবা আরও ব্যাকরণসম্মত ভাবে বলতে পারি, দেহরম। এখানে কাত হতেও আমার আপত্তি নেই। চিৎ হয়ে শুয়ে তোমার মাথার লম্বা দুয়েকটা চুলে আঙুল জড়াতে জড়াতে বলে যাব, কতকটা গ্যালিলিওর কায়দায়—না না, সূর্য না, সূর্য না, কে কাকে ঘিরে ঘোরে আমি জানি না।

বলতে বলতে টান টান উঠে বসল অতনু, বলল,—আমি জানি না। মেয়েরা মেয়েদের কি দেয়, তুমিই বরং আমাকে জানাও না। মনে মনে ধারালো নখে আঁচড়ানো আর চোখা দাঁতে কামড়ানো ছাড়া একটি মেয়ে আরেকটি মেয়েকে কি দেয়? আচ্ছা, তোমরা বকুলের বদলে ধুতুরা ফুল পাতাও না কেন?

শুচিতা বলল, তুমিও কিন্তু আমার একটা মোক্ষম প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছ। ছেলেরা, অনেক ছেলেই পাত্তর বিনিময় ছাড়া আর কিছু করে না, কিন্তু তারপর? তাদের খুঁজতে হয় একটা না একটা পাত্রীকে।

স্বীকার করলাম দুঃখ চিন্তা ভাবনা আমাদের মন। আর সুখ? শুধু শরীর। তুমি যা বলেছ, তা-ই। তোমাদের যারপরনাই শরীর। সেই শরীরই খুঁজি, অন্তত কেউ কেউ খোঁজে।

এতক্ষণে যেন নিজেকে ফিরে পেল শুচিতা। তার পায়ের তলায় মাটি। মাটি নয়, বাঁধানো শান, তবু আসলে তো তা মাটিই। যেন অতনুকে কব্জায় পেয়েছে এমনই ভঙ্গিতে বলল, ইতিমধ্যে তার চুল তো খোলাই, আঁচলও সে আলগা করে দিয়েছে, তাছাড়া জোঁকের মত পুরু ঠোঁট দুটো রক্তচোষা হয় তো ছিলই, বাক্যটির খেই হারিয়ে গেছে, তাই আবার লিখছি, শুচিতা বলল, বেশ, শরীর আমাদের সর্বস্ব, মানলাম। আর তোমাদের সর্বস্ব মন, তাই না? আমরা মৃন্ময়ী, মাটির প্রতিমা, আর তোমরা চিন্ময়। শুধু এটুকু বলতে এতটা সময় নিচ্ছ কেন অতনু?

এখন ওরা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। তোমাকে বলিনি, আজ বলি, বেশ কিছুদিন ধরেই ছিল না। ওদের জন্যেই দূর সেকেন্দ্রাবাদ থেকে বারে বারে ছুটে এসেছি। উড়িয়েছি, না না, শুচি, তুমি যা ভাবছ তা নয়, শুধু টাকা নয়, যা উড়িয়েছি সেটা আসলে পাওয়ারও রকমফের। একটা টেবিলে ছড়ানো মুড়ির পিরামিড, আর আশেপাশে পেঁয়াজিগুলো যেন স্ফিংস; তারপর কত তর্ক, কত গুঞ্জন, কত আলোচনা। আমাদের, পুরুষদের ভাষায় সেই হৈরৈ করে ফুরিয়ে যাওয়ার ইংরেজি শব্দটা ইজ্যাকুলেশনেরই রকমফের। তোমাদের শারীরবিদ্যায় অর্গ্যাজম্। দুটো শব্দই আসলে কোনখানে এক। আসলে নিষ্কৃতি, আত্ম-বহিষ্কৃতির ভেতর দিয়ে রোমাঞ্চ এবং মুক্তি। তারপর কি ঘটেছে, কি ঘটে, জানতে চেয়ো না। যদি কোনও গানের কাছে যাই, তবে শুধু সুরের জন্যে। যদি সুরার কাছে যাই, তবে নিজেকে বানান করে করে পড়বার জন্যে। ভাল বাংলায় উচ্চারণ যাকে বলে। হাইড্র্যান্ট খুলে দিলে তবেই তো কুষ্ঠরোগীও তার চেটে নেবার মত জল পায়, জীবন পায়।

এর পরে আমি, লেখক, উভয়ের সংসর্গেরিও একটা বর্ণনা দিতে পারতাম, কিন্তু দিলাম না। কারণ পাঠকেরা যদি কেউ এই পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে পড়ে থাকেন, তবে নিশ্চয় বুঝেছেন, কোনও গপ্পো লেখা আমার অভিপ্রেত না।

ওই মেয়েটা (ধরুন লিখতে লিখতে নামটা যদি ভুলে গিয়েই থাকি তবে তো শুচিতাকে এবার ওই মেয়েটাই বলতে হবে। তবু শুচিতা নামটা মনে পড়ে গেল ভাগ্যিস!) ওই মেয়েটা বলল, মেয়েরা মেয়েদের কি দেয়, মেয়েরা মেয়েদের কাছে কতখানি, তোমাকে আজ আর বলব না অতনু, বললেও তুমি বুঝবে না। কিন্তু তুমি এসেই সমকামিতা নিয়ে একটা লেকচার ঝাড়তে শুরু করেছিলে না? দ্যাখ, আমিও তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান দিতে পারি। কারণ বইপত্তরের পাতা আমিও এই সিঁটিয়ে যাওয়া শিরিঙ্গে বয়েসে কম ওলটাইনি। যে অর্থে একটা বয়েসে তুমি বলছ, পুরুষের সঙ্গেই আনন্দ অর্থাৎ প্রাজ্ঞ প্রৌঢ়রা ফিরে যায় কৈশোরে, সেই অর্থে আমি কিন্তু তার চেয়েও সাংঘাতিক একটা নিদান হাঁকতে পারি। অতনু, তোমার নিস্তার নেই। সমকামিত্বের

বন্দরে এসে এই বয়েসে তুমি নোঙর ফেলেছ, ফেলতে চাইছ, কিন্তু যদি বলি, এই প্রক্রিয়ায় তোমার পরিণতি আরও করুণ, আরও কৃপাযোগ্য? তুমি জানো না অতনু এমন একটা বয়েস শীগগিরই তোমার আসছে, যখন তোমার বলতে তুমি ছাড়া তোমার আর কেউ থাকবে না। পাণ্ডিতি দিয়ে বক্তিমে শুরু করেছিলে না? হোমো-সেক্সুয়্যালিটি এবং আর যেন কি কি? এবার আমি বলি, তোমার এবং তোমার জাতের পুরুষদের বাকি বেবাক জীবনটা অটো-সেক্সুয়্যালিটি। দ্যাখ, একেবারে প্রামাণিক বই থেকে বুলিগুলো উদ্ধার করে বললাম। অটো-সেক্সুয়্যালিটি। নিজেকে নিয়ে নিজে মজে থাকা। আর কেউ নেই, শুধু একা। সেদিন হোমো-সেকসুয়াল সঙ্গীরাও হয় বাতিল নয় উধাও। যেভাবে জীবন শুরু করেছিলে—তখন তো আমি দেখিনি। নিজের বুড়ো আঙুল নিজে চোষা—

বিলিতি স্ল্যাং-এ এর চেয়েও খারাপ কথা আছে শুচিতা। টু সাক্ ওয়ান্স্ ওউন কক্। তুমি কি তাই বলছ?

খারাপ কথা বলে আমার কথাটাকে জোলো করে দিয়ো না। শেষ পর্যন্ত তোমার জন্যে কেউ থাকবে না, কোন পুরুষবন্ধু নয়, মেয়েরা তো নয়ই, থাকবে তুমি।

অতনু, তার যেমন স্বভাব, এত কথার পরেও হো-হো করে হেসে উঠল।—শুচি, তুমি জানো না, না জেনে হয়তো সমস্ত বয়স্কম্মন্য পুরুষদের কথাই বলেছ যাদের জন্যে থাকে খালি তারাই। কিন্তু একেবারে শেষে তারাও থাকে তো?

কারা?

নিজের জন্যে নিজেরা। হয়তো একদিন আসে, যখন আসামী 'আমি'র হয়ে কোন উকিল 'আমি'ও দাঁড়ায় না।

এইবার, মেয়েরা তো হো-হো হা-হা করে হাসে না, শুচিতা হাসল প্রথা-সম্মত নারীসুলভ হাসি। যে অব্যয়ের শব্দরূপ হিহি হিহিহি। খিলখিল খিলখিল হেসে শুচিতা তার আঁচল আরও আলগা করে দিল, যাতে অতনু তার বাপুত সুডৌল গোলার্ধ চোখে যতটা পাওয়া যায় ততটা পেয়ে গেল, এমন-কি এতক্ষণ যা দ্যাখেনি তা-ও নজরে পড়ল তার, শুচিতার কপালের খয়েরী টিপ, বুক থেকে বিদ্রোহী বা অন্যমনস্ক বহির্গত ব্রা-এর স্ট্র্যাপ, ইত্যাকার এবং ইত্যাদি, কিন্তু পাঠকের মনে যৌন অনুষঙ্গ জাগাব বলে তো এই অংশ লিখতে বসিনি, এই গল্পটার মর্মমূল বস্তুত শুচিতা বেশবাসে সংবৃতা হলেও একই রকম সিদ্ধ বা ব্যর্থ হত।

অতনু, তোমার হঠাৎ চাকরি ছেড়ে আসা আমার জন্যে, এ কথা জানলে এমন-কি কানাঘুষাতে শুনলে তৃষা মরে যেত।

কেউ মরে না শুচি, সবাই বেঁচে যায়। মরার মত অজুহাত ক'জনই বা পায়?

কথা ঘুরিয়ে দিয়ো না। তেমনই হাসতে হাসতে শুচিতা, তখনও তার বুকের অপাঙ্গ খোলা, বলল, কিন্তু তুমি যে তোমার হোমো-সেকসুয়াল পুরুষ-

বন্ধুদের জন্যে আসনি. এসেছ আমার জন্যে, এই গুজব যখন কানে কানে মুখে মুখে ছড়াবে, তখন তোমার তৃষা সইতে পারবে তো?

জানি না. জানতে চাই না। বলল দারুভূত জনার্দনপ্রতিম অতনু। শুচিতাকে বুকে টেনে বলল, এবার যাই শুচি?

আমাকে অশুচি করে দিয়ে? এই বুঝি তোমার পৌরুষ সংসর্গ বা হোমো-সেক্সুয়ালিটি?

শুচিতা বলল বটে, কিন্তু তখনও তার বুকের বাম গোলার্ধ খোলা।

অতনু মোজায় তার পায়ের নিম্নার্ধের রোমগুলিকে আবৃত করছিল. সময় বুঝে, সেই দৃশ্যে রোমাঞ্চিত হয়েও (শুচিতা মেয়ে তো!) বলল. যাচ্ছ? একটা কথা শুনে যাও. অনেক দিন তুমি অনেককে ছেড়েছ. এবার অনেকে তোমায় ছাড়বে।

অতনু বেরিয়ে যাচ্ছিল. পিছন থেকে চেঁচিয়ে শুচিতা আবার বলল. কিন্তু তুমি যেন তোমাকে ছেড়ো না।

বিদায় অভিশাপ? এই বলে তখন চোস্ত স্যুট বুটে পরাক্রান্ত পরিপাটি অতনু অসহায় ঘাড় ফিরিয়ে কোন মতে উচ্চারণ করল. শুচিতা আমি জানি না, জীবনে কে যে কাকে ছাড়ে আর কে যে কাকে ধরে. আমি তার কিছুই জানি না। বলতে কি. আমি জীবনের কিছুই জানি না।

স্যুটবুটদুরস্ত লোকটার কথা কোথায় যেন আটকে আটকে যাচ্ছে. যেন একটু জড়ানো. যেন কতকটা তোতলামির মত শোনাল।

॥ দুই ॥

আমি দুঃখের দেখি মুখ. আর সুখের শুধু শরীর—সেই লাইনটা ফিরে ফিরে অতনুর মনে আসছিল. যখন সবান্ধব সে তালে তালি দিচ্ছিল। নৃত্যা তার পাঁজরে একটা গুঁতো মেরে বলল. কি ভাবছেন মশাই এত এত?

কই. ভাবছি না তো!

বিড়বিড় করছিলেন কিন্তু।

ও কিছু নয়! আমার বানানো কয়েকটা ব্যাপার। যদিও যথেষ্ট তরল অনল তার অফুরন্ত. তবু অতনু এই কথাটা বলতে পারল।

জবাব পেল সঙ্গে সঙ্গে। দেয়ালে রবি ঠাকুর আর ঈশ্বর জানেন কে কে. ঝাপসা চোখে সবাইকে চেনা যাচ্ছে না. রবি ঠাকুরকে শুধু অন্তত দাড়ি থেকে আন্দাজ করা যায়. কিন্তু দুঃখের মুখ. সুখের শরীর. না-কি ভুল হল—সুখের মুখ আর দুঃখের শরীর. আমরা কি পাই. আমরা কি না পাই, এই সত্যে প্রতীত হতেও অতনুকে যৎকিঞ্চিৎ অনল পুনরপি তার অন্তর্গত করতে হল. আমাদের রক্তের ভিতরে কে কে কে. না জানি কোন্ বালগোপাল খেলা করে, যে গোপাল কখনও বয়েসে পৌঁছয় না. শুধু খেলে. ডাণ্ডাগুলি. হাডুডু ইত্যাদি।

কিন্তু নৃত্যার গুঁতোটা সত্য, অন্তত তার পাঁজরের ব্যথাটা তো ভয়ানক সত্য। যে সত্য বেদনার মুঠ ভেঙে ভেঙে দানা খাওয়ায় না, এক চোটে বেদনা দেয়। যেন পাঁজর ভাঙে।

এ-ও কি ঠিক? এ-ও কি তার জীবন? অতনু, তোমার জীবন? দূরে দূরে, আমার জীবন হতে যাবে কেন? আমি একটি শক্ত সমর্থ পুরুষ, এখনও পঞ্চাশে পেঁছইনি, দিব্যি ডাঁটো আছি। আর তাই তো ইয়ার-বক্সিদের সঙ্গে সুখের তরে এখানে এসেছি। আমি সুখের দেখি সুখ আর দুঃখের দেখি দুখ, বোধটাকে এইভাবে উলটে-পালটে নিলে কেমন হয় কে জানে!

নৃত্যা, তোমার নাম নৃত্যা কেন? তুমি কি শুধু নাচো?

আমি নেচে নাচাই। তার কোমরের গ্রন্থি ঢিলে, সে তখনও নাচতে নাচতেই অতনুর কানে কানে কথাটা বলে গেল! কি বিশাল উরু, যেন গথিক থামের মত।

তোমার নাম তো গীতাও হতে পারত?

আপনি আর নতুন করে নাচাবেন না। আমি নিজের গান গাই না তো, অন্যের গানে নাচি, যেমন হ্যারি বিলাফন্ট্‌ কিংবা কারমেন মিরান্দা। তাছাড়া জিপসীদের গান শুনেছেন? দারুণ, না? একটু হাস্‌কি, একটু ভরাট, কিন্তু পুরুষ-পুরুষ।

তোমাদের বুঝি তাই ভাল লাগে?

লাগবে না? তাই তো আমি গান বাদ দিয়ে শুধু নাচ নিয়েছি, দুনিয়ার ছ'টা ভাষায় আমার ছ'টা নাম আছে। আপনাদের হিন্ডিয়ায় আমার নাম নৃত্যা।

হিন্ডিয়া বলে কোন ভাষা নেই হিন্দি বলে যদিও আছে।

যাই হোক, আপনাদের ভাল লাগলেই হল। আমার নাম আপনাদের কাছে নৃত্যা।

নৃত্যা, তোমার ড্রেস এত লো-কাট্‌ কেন?

উত্তরে নৃত্যা ফিচ ফিচ করে হাসল, বেরালরা যেমন হাঁচে। সে তার জবাবে সেই পূর্ব-য়ুরোপীয় ভাষাই ব্যবহার করল, যাতে ভাবেরই অনু থেকে অনুবাদ হয়ে যায়।

চল এখান থেকে যাই।

তোমার সঙ্গে?

আই নো আয়াম ডার্ক।

বাট নট ভেরি। আবার সেই ফিচ ফিচ হাসি।

লেখকের অপলাপ ঃ অকুস্থল যে পূর্ব-য়ুরোপ সেটা বলতে ভুলেছি।

এর পরের সংলাপগুলো এইরকম ঃ

আমি যে ইন্ডিয়ান, তুমি জানলে কি করে?

অন্তত তুমি যে রেড ইন্ডিয়ান, তা তো দেখেই বুঝেছি।

তাহলে পাশের টেবিল থেকে আমার দিকে তাকাচ্ছিলে কেন? (চোখ মারার কোন চল্‌তি ইংরেজি বা ম্যাগিয়ার জবানি অতনুর জানা ছিল না।) আমি তো

একটু আগেই বললাম, আয়াম ডার্ক—

আমিও তো বলেছি, বাট নট ভেরি।

কিন্তু তুমি যে আমার টেবিলে এলে, ওই টেবিলে তোমার বন্ধু তো বসেই রইল।

ওহ্. হি! হি ইজ ফ্রম মিলানো।

মিলানো মানে যে মিলান বুঝতে অতনুর যেটুকু সময় নিয়েছিল, ওরা তিনজন ততটুকু সময় নেয়নি। ওরা অতনুর সঙ্গে হোটেল এক্সেলেসিওর-এ এলো। সবাই মিলে পান মানে সমুদ্রশোষণ করে গেল। অতনু মেয়েটিকে বলল, চল. এবার আমরা আমার ঘরে যাই।

বাগড়া দিল প্রথমে মিলানোর ভদ্রলোক। তাকে যদি বা কাটানো গেল, প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেন হল পোর্টার। বাইরের কোন মেয়েকে তিনি উপরে যেতে দেবেন না। তখন সেই মেয়েটি (হায়. তার নামেরও প্রথম অংশ মায়া পরে হেঁচকি জাতীয় কোন প্রত্যয় আছে কি-না, অতনুর এখন মনে পড়ছে না) তার বুকে মুখ রেখে (মুখ যখন রেখেছিল তখন চোখ নাক ঠোঁটও রেখেছিল নিশ্চয়ই) বলেছিল. যেন বিয়ে-করা বউ. তুমি এত ড্রিংক কর কেন? তারপর সে কি হুহু হুতাশ কান্না! সেই কান্নাতেই অতনুর বুক ভিজে গেল। জল মনের না হোক. চোখের তো বটেই। সেই থেকে সে একটু সাবধান, একটু দুরন্ত।

নইলে নৃত্যার মত আরও দু-চারটে মেয়ের সংস্পর্শে এজন্মে সে যে আসেনি এমন নয়। স্বদেশে বা বিদেশে। যেমন স্বদেশে নিজের শহরে ইয়ার-বক্সিদের সঙ্গে মিলে সুখের মুখ দেখতে সে কক্ষনো এ পাড়ামুখো হত না। সে বারে বারে সুখের শরীর দেখতে এসে খালি দুঃখের মুখই দ্যাখে। সুখ? সে তো বারোয়ারি। আর দুঃখ যেন আয়তি। সে যেন শুধু তার সিঁথিতেই সিঁদুর টানে না, তার কপালেও একটি মাঙ্গলিক এঁকে দেয়।

যেমন য়ুরোপে. তেমন স্বদেশে। অতনু বহু ব্যবহারে জেনেছে, সে নেই যাকে চাওয়া যায়। সে নেই কোন পার্টিতে কিংবা সাজানো লিভিং রুমে। তার মানে যা সে খুঁজছে তা কি কোথাও নেই?

॥ তিন ॥

তিন মানে পুরুষমাত্রেরই এই খোঁজার কাহিনী। কে আছে? কেউ কি আছে? ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে একদিন সে তৃষাকে বুকে টেনে নিল। খসিয়ে দিল তৃষার শারীরিক যতেক খোলস। অথবা তৃষাই অযাচিত খসিয়ে দিল।

তুমি কি আমার?

তোমাকেই আমাকে দিলাম তো।

এই উত্তরে যে-কোন পুরুষ তৃপ্ত হতে পারত. কিন্তু অতনু যেন তার প্রার্থিত প্রত্যাশিত উত্তরটা পেল না।

দাম্পত্য তার এখনও স্থির; তবু কোথাও যেন স্থবির। নইলে তুষার বিছানার ব্যবহারে সে বুঝি বা অন্য ব্যবহার পেত, এবং অতনু এতদিনে এতটাও প্রাজ্ঞ হয়েছে যে শয্যার প্রতিক্রিয়া ফোম রবারে ঢাকা খাটে একটি নারীর শরীরের সহযোগিতাই দাম্পত্যের একমাত্র অর্থ নয়।

তার অন্য অর্থ অন্য কোথাও নিশ্চয় লুকানো আছে। পঞ্চাশে উপনীত সক্ষম অতনু যদিচ তার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাতেই পরিতৃপ্ত হতে পারত, তবু তার ভাবনা, হায়, তার ধার-কাছ দিয়ে যায় না কেন? কেন সে এখন ভাবে পুরুষ বন্ধুদের সাহচর্যের জন্যে সেকেন্দ্রাবাদের ঝকমকে চাকরিটা ছেড়ে আসাই ছিল ভুল? কত টাকা সে ছেড়ে এসে কত কম সে নিল বা পেল নতুন চাকরিতে, সেটা ওরা কেউ দেখল না। টাকার অংকটা যে ওদের চেয়ে বেশি। পুরুষবন্ধুরা শুধু সেইটেকেই বড় করে দেখল।

তবু শূন্য শূন্য নয়। শেষ অনুচ্ছেদটি যদি এইভাবে লিখি তবে প্রবন্ধের মত শোনাবে। এখন বাধা দিতে চাইছে এই গল্পটির লেখক। অতনু নামে কোন মূঢ়কে সে বলতে চায়, তোমার প্রণয়িনী, পুরুষ প্রণয়ী সবাই মিছে হয়ে গেছে? তুষার সঙ্গে তোমার দাম্পত্যবিহারও যান্ত্রিক?

এত নৈরাশ্য কেন? শুচিতাকে সমকামিতার তত্ত্ব বোঝানো যায়নি বলে? সমকামী বলতে এই পৃথিবীতে আদৌ কেউ আছে তো? অথবা সবাই বুঝি আত্মকামী! কিন্তু আত্মাকে কামনা করলেই কি পাওয়া যায়? সে একটা বিরাট ব্যাপার। সে একটা বিশ্রী ব্যাপারও। স্বদেশী আর বিদেশী বেশ্যাদের উপদেশ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

অতনু, ভয় নেই। কিছু থাকবে। তুমি না থাকলেও যা বলছি তা থাকবে। বন্ধুরা উধাও হোক, তবু বন্ধুত্ব যে ছিল এই সত্যকে মারে কে? যাদের ভালবেসেছ, যাদের সঙ্গে ভালবাসার খেলা খেলেছ, সেই খেলা ফুরোলেও ভালবাসা প্রাচীন জ্যোৎস্নার মত থাকবে। তার স্মৃতি, তার অস্তিত্ব, এমন-কি অভ্যস্ত, শীতল দাম্পত্য।

অতনু তুমি বা তোমরা বল না—কিছু নেই, কোথাও নেই, বল, বল, যত খুশি বল, তবু তাতে জীবনের শেষ হয় না। জীবনের শেষ কোথায় জানতে চাও? তবে জীবনকে শেষ হতে দাও। কিছু ছাই তো পড়ে থাকবে, আর কিছু যদি নাও থাকে! সেই ছাই উড়িয়ে দ্যাখ, পেলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।

নেই রুমাল

আমার নাম তারানাথ চৌধুরী। তারানাথ নামটা একটু পুরনো। মা-বাবা এমন একটা আদ্যিকালের বদ্যি নাম কেন যে রাখলেন! ছেলেবেলায় এই নিয়ে আমার মনে খুব কষ্ট ছিল। অল্প অল্প লজ্জাও। দোলের দিন চান করার পরেও কাপড়ে যেরকম একটা পাতলা লালচে রং লেগে থাকে, এই লজ্জাটার রংও সেইরকম। লজ্জাটা আরও বাড়ল যখন ইস্কুলে ভরতি হলাম। সহপাঠীদের কেউ দীপক, কেউ রূপক, কেউ অনুপ, এমন-কী পার্থপ্রতিম ইত্যাদি মহাভারত-ঘাঁটা নাম, বিক্রমাদিত্যের মতো ইতিহাস খুঁড়ে বের করে আনা নাম, এসবও ছিল। তাদের পাশে তারানাথ! ছি! বদখৎ চেহারার মুখ তবু খানিকটা ঢাকা যায়, কিন্তু বদখৎ নাম? মা-বাবার ওপর গনগনে উনুনের মতো কী যে রাগ হত! পরে অবিশ্যি, বেশ পরে, কারণটা জেনেছিলাম। পর পর অনেকগুলো বাচ্চা হয়ে ওরা জন্মটাকে শোধ দিয়ে যায় কি-না, তাই ওঁরা তারকেশ্বর, তারাপীঠ, না কোথায় যেন মানত করেন। তার ফল আমি নই, তাহলে তো জীববিজ্ঞানকে, নরনারীর পারস্পরিক মিলে যাওয়া মিশে যাওয়ার সম্পর্ককে, সৃষ্টির মূল রহস্যকে বেমালুম উড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে, সেই মানতের মাস দশেকের মধ্যেই নাকি ভূমিষ্ঠ হলাম আমি। আমার নাম যে মানতপুত্র রাখা হয়নি, এই ঢের ভাগ্যি।

যাই হোক, নামের লজ্জাটা আমি প্রাণপণে পুষিয়ে নিলাম লেখাপড়ায়। ফি বছর ফার্স্ট হতাম শতকরা আশি, নব্বই, পঁচানব্বই নম্বর পেয়ে। মাস্টারমশাইরা বলতেন, আমাদের স্কুলে ওটাই একটা রেকর্ড। আর হেড মাস্টারমশাই? যাঁকে যমের মতো ডরাত সবাই? তিনিও একটু উঁচু ক্লাসে উঠতেই আমাকে নিজের বাড়িতে ডেকে স্পেশাল ক্লাস নিতে শুরু করেন। শেকস্‌পীয়র মিলটনের গল্প-টল্প আমি তখনকার ম্যাট্রিক পরীক্ষার অনেক আগেই পড়ে ফেলি।

সহপাঠীরা আমাকে ঈর্ষা করত আর সপ্রশংস খোসামুদে চোখে চেয়ে চেয়ে সেই হিংসেয় জ্বলজ্বলে চোখের তারা ঢাকত। নাম নিয়ে আমার ভিতরের প্রতিবাদটা আস্তে আস্তে কেমন যেন হাওয়ায় রাখা মুড়ির মতো মিইয়ে গেল। বরং বন্ধুদের করুণা করতে শুরু করলাম আমি। এমন-কী আমার পনেরো বছর বয়েসে যখন একটি ভাই হল, আর ঘটা করে তার নাম রাখা হল অলকেন্দু, তখন আমার একটুও কিন্তু রাগ হয়নি। ইতিমধ্যে হোয়াটস ইন এ নেম, এই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটা মুখস্থ করে ফেলেছি কিনা!

এত কথা বলার দরকার কী? ধরুন, ইউনিভারসিটির সব কটা সিঁড়ি

বা মইয়ের ধাপ বেয়ে-বেয়ে আমি সবচেয়ে আগে পেঁাছেছিলাম. এই কথাটা বলে দিলেই ল্যাঠা বলতে যা বোঝায় তার সবটাই চুকে যেত। আপনারা কি বুঝবেন, আমি ইউনিভারসিটির শেষ পরীক্ষা অব্দি ফারসট হয়েছি,—বলা বাহুল্য বরাবর ফারসট ক্লাস পেয়েই।

এবং এসব সেই সময়ের, আমার সেই বয়েসের, কথা যখন দারুণ রেজাল্ট করলেই দারুণ না-হোক, মোটামুটি আচ্ছা-আচ্ছা চাকরি জুটত।

আমারও জুটেছিল। প্রথমে ওই বর্ণিত মইয়ের নিচের দিকের একটা ধাপে। তবে ধাপের পরেও ধাপ থাকে। যদি অদৃষ্ট সহায় হয়, তবে চড়াও অসম্ভব নয়। ধাপগুলো তখন পায়ের ভৃত্য হয়ে যায়। একটু লাক, তার সঙ্গে কায়দা করে বলি, একটু প্লাক, দুটো যেই মিলল অমনই চড়চড় চলে যাওয়া। মানে একটু বেসিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা, তদুপরি কপালের গম্বুজ। এই সব মিলিয়েই সাকসেস। যেমন আমার, যেমন আমি।

॥ দুই ॥

আজ আমি একটা আপন মেরুদণ্ডে ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর মতন চেয়ারে বসে কত লোককে চাকরি দিই, আর বিগড়ে গেলাম তো, কত লোকের চাকরি খাই। আমি জাঁদরেল একসিকিউটিভ তারানাথ চৌধুরী। ইংরিজিতে টি এন চৌধুরী। যদিও মাঝে মাঝে চলতি হাওয়ায় উড়নচণ্ডী, কিছু কিছু বিলিতি বই-টইয়ের পাতা উলটিয়েছি, তবে বাংলা কেতাব বিশেষ অধঃকরণ করিনি। কারণ ওটা নোভোরিশদের দস্তুর নয়। আমি কি নোভোরিশ? আমি কি আপস্টারট? উপরের দিকে স্টারট পেলেই সে এমন কিছু আপ হয়ে যায় না, তাই আপসটারট কথাটাই ভুল। টু হেল, টু হেল, হোয়াট দ্য হেল এভার? এই যে আমি তত্ত্বকথা লিখতে বসেছি, এর বাংলা যদি জলবৎ (জল, না জিন?) তরল হয়ে যায় তার কারণ এই মোল্লার বাংলা বিদ্যের দৌড় ওই কথামালার মসজিদ অব্দি। যদিও মহোদয় বিদ্যাসাগর কখনও এসব অগ্নিগর্ভ জল ছুঁতেন না।

কিন্তু ছোঁয়ালেন, তিনি ছোঁয়ালেন। ইচ্ছে মাত্র ঘুরে-যাওয়া চেয়ারে বসা একটা প্রাচীন ব্যক্তিকে দিয়ে তাঁরই শৈলীতে (বিদ্যাসাগর কিনা তাই শৈলী বললাম, নইলে বলতাম ফ্যাশনে) তাঁর জীবনের একটি পর্বের কথা লিখে রাখলেম।

অথবা রাখছেন। আজ কতজনকে ইনটারভিউ করার কথা বলুন তো? আমার সামনে পুরো লিসটিটা আছে। ইতিমধ্যে অনেকখানি বেলা হয়ে গেল। বেলা বয়ে গেল। তবে আমি আমার খাস বেয়ারাকে ডাকি? নকুল জানার মতো বিশ্বাসী আর কেউ হয় না। এই দেখুন ইলেকট্রিক বোতামটা টিপলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সামনে এসে সেলাম জানাল।

—এখন ক'টা?

জিগ্যেস করার দরকার ছিল না, কারণ আমার হাত-ঘড়িটা নকুলের চেয়েও বিশ্বস্ত।

—সাড়ে চার বেজে গিয়েছে সাব।

সাড়ে চার? আমার হাত-ঘড়িটা আবার দেখলাম। অন্তত ও আমার চেয়েও সত্যবাদী। সত্যিই এখন চারটে বেজে চল্লিশ।

—কতজন এসেছে?

বাংলাতেই ওকে জিগ্যেস করলাম।

—এসেছিল তো অনেকেই, সেই তিনটে থেকে। আপনি লাঞ্চের পরে ইনটারভিউ নেবেন বলেছিলেন না? সেই জন্যে। অন্তত বারোজন বা দশ তো হবেই হবে।

—সবাই চলে গেছে?

—সবাই যায় নি, এখনও কয়েকজন আছে!

—একে একে ওদের ডাকো। (আমি তারানাথ চৌধুরী বললাম।) মেরে সামনে মে পুরা লিসট্ হ্যায়। পহেলে কিসিকো ভেজো।

ভাঙা হোক, সাচ্চা হোক, আমার বেয়ারাকে আমি তারানাথ ইমপ্রেস করার জন্যে শেষের কথাগুলো হিন্দিতে বললাম। ভাঙা হিন্দি ছাড়া একসিকিউটিভ হিসেবে নিজেকে পদস্থ বা চেয়ারস্থ করা যায় না।

॥ তিন ॥

সে এল।

—নেম, প্লিজ?

—ত্-তারানাথ রায়।

আমি যে অবাক হলাম সেটা ওর তোতলামিতে নয়, নাম শুনে।

কিন্তু আমি যেহেতু জাঁদরেল এবং তৎকালে সিংহাসন-আসীন, সুতরাং মুখের একটি পেশীকেও তিরতির বিচ্যুত হতে দিলাম না। গ্রামগম্ভীর অথচ শহুরে স্বরে বললাম, লেখাপড়া কত দূর?

—সে-সে তো আমার অ্যাপলিকেশনেই আছে।

—একস্‌পীরিয়েনস্? (তারানাথ চৌধুরী, তোমার গলা যেন এমনই গম্‌গমে থাকে। বলাটা যেন চিঁচিঁ না হয়।)

—সেও তো আ-আমার আ-আবেদনপত্রেই আছে।

—ওয়েল, থ্যাংক ইউ। ইউ মে গো।

বেয়ারা নকুলকে ডেকে বললাম, নেক্‌স্‌ট?

সেও এল। •

—নাম?

—তারানাথ তর্কবাগীশ।

এ তর্ক করবে কি-না ভেবে আমি ঈষৎ বিচলিত হতে পারতাম, কিন্তু এই তারানাথ আমাকে বিচলিত করল।

গম্ভীর গলায় তাকে বললাম, হোয়াই লুকিং ফর এ জব?

তার উত্তর আমাকে একেবারে কুপোকাৎ করল।

—বিকজ, স্যার, বিকজ (এই তারানাথ নির্ঘাৎ নেসফিলড্ থেকে ইংরিজি বলা শিখেছে, নইলে দুবার 'বিকজ' বলল কেন?)

আসলে আমি কাত নয়, ঘায়েল হলাম তার জবাবে। সে বলল, (সেই বিকজ মিশিয়ে) বিকজ স্যার, আই হেট বীইং আনএমপ্লয়েড, বেকার থাকাকে আমি ঘৃণা করি।

ভাগ্যিস বলল। তাই তো সঙ্গে সঙ্গে এই তারানাথ বলতে পারল, দ্যাখো কম বয়েসে ঘৃণা করা মানায়। আরেকটু বয়েস হোক, তখন তুমি হয়তো সবাইকে ভালোবাসতেও শিখবে।

—শুনেছি তো লোকে অল্প বয়েসেই ভালোবাসে। আর ঘেন্না-টেন্না আসে বেশি বয়েসে।

তর্কবাগীশ বলেই ওই তারানাথ, এই কথাটা বলল।

ওকে আমার ব্যক্তিত্ব দিয়ে দুরমুশ করার জন্যেই কি আমি ঠিক তক্ষুনি পাইপটা ধরালাম? হাওয়ায় হাওয়ায় পাইপের কড়া-মিঠে কটু গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, কম বয়েসে ভালোবাসা, আর বেশি বয়েসে ঘেন্না—এসব বাল-খিল্য ব্যাপার। আসলে ঘেন্না-ভালোবাসার কোনও বয়েস নেই। কম বয়েসে শুধু তেষ্টার জল চাওয়া আর ঢকঢক গেলা। আর বেশি বয়েসে চেয়ে চেয়ে শুধু বুক ফাটানো। তার মানে কী দাঁড়াল? পাওয়া-টাওয়া নয়, সারা জীবনে আসল কথাটা শুধু চাওয়া।

এর পর আর বাকি থাকে কী? পাইপের ধোঁয়া আরও ছড়ানো, প্রার্থীকে আবার বলা, থ্যাঙ্ক ইউ।। নাও ইউ মে গো?

'গো' কথাটা, কী আশ্চর্য, ইংরিজি অ্যাকসেনটের কল্যাণে কখনও কখনও 'গো'-এর মতন শোনায়।

॥ চার ॥

বিজলীর ঝিরঝিরে ডাক বাজিয়ে আবার নকুলকে ডাকলাম। এ ডাক এ জীবনে কতজনকে যে পাঠিয়েছি! যে ডাক না ঝাউ, না শিরীষ, কেউ কখনও কাউকে সতত পাঠায় না। অন্তত সততার সঙ্গে তো নয়ই। পোসট বাক্সে চিঠি ফেলারও একটা সময় আছে।

নকুল সেলাম ঠুকল, যেমন বশংবদ সেলাম বরাবর ঠোকে।

জিগ্যেস করলাম, আউর কোই হ্যায়?

দরকার ছিল না, তবু হিন্দিতে।

নকুল বলল, আছেন তো অনেকেই।

আমি ফের অকারণ হিন্দিতে বললাম, (কারণ আমার একটা টপ লেভেল কনফারেনস ঠিক ছ'টায়) বললাম, তব আজ সির্ফ এক আদমী কো ভেজদো।

—দে রহা হুঁ সাব।

সে এল। সারা মুখে দাড়ি। লোকটাকে কেউ কি কখনও ক্ষৌরি হতে শাঁসালো কোনও ব্লেড ধারও দেয়নি? ধার দেয়নি না চায়নি সে? অথবা সে পেয়েও ফিরে গেছে সেই আদিম কালে, যখন মানুষ জন্ম নিলে, পুরুষের বাড়তি রোজ রোজ মুখের জঞ্জাল সাফের দায় ছিল না। যে এল তার পরনের কুচকুচে কালো শার্টটাকে আমি তারিফ করলাম।

বললাম (ইংরিজিতে), আমি খুব দুঃখিত, এতক্ষণ আপনাদের বসিয়ে রেখেছি।

—দুঃখিত হওয়া আপনার সমুচিত।

—আপনি বড় বেপরোয়া, তেজীয়ান বলছেন। ছ'টায় মিটিং, তবু এই সাড়ে পাঁচটায় আপনাকে ডেকেছি। ধন্যবাদ দেবেন না?

—দেব না, ওই ইংরিজি থেকে বাংলায় কথাটার কোনও যথার্থ তরজমা নেই বলে। দ্বিতীয়ত আমি এও জানি—

—আরও অনেককে বসিয়ে রেখে, হয়তো ওদের কাল ডাকব, শুধু আপনাকেই যে ডাকলাম এই জন্যে কোনও কৃতজ্ঞতাও কি নেই?

—থাকতে পারে। এবার কোনও প্রশ্ন করুন। যদি থাকে?

—আপনি এখানে কাজ চান?

সেই কালো কোর্তা পরা লোকটা হোহো হেসে উঠল। তার দাড়ি ঢাকা মুখে হাসি বোঝা যায় না। তবু সে চোখে আর দাঁতে যতটা হাস্য বিকিরণ করা সম্ভব, ততটাই করে বলল, কী যেন জিগ্যেস করেছিলেন আপনি। আমি এখানে কাজ চাই কিনা, তা-ই না? তা তো নয়। কাজ চাই না, আপনাকে আমি কাজ দিতে চাই।

—আপনার নাম কী? নাম কিন্তু এখনও বলেননি। পেশা বিদ্যা ইত্যাদি কিছুই না।

—সব আপনার ওই লিস্টিতেই পাবেন। আমার নাম মৃত্যু।

—মিস্টার মৃত্যু, আপনাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্যে আমি দুঃখিত।

—মিস্টার তারানাথ চৌধুরী, ইউ হ্যাভ এভরি রিজন্ টু বি। আপাতত দুঃখই আপনার প্রাপ্য।

বলেই কালো পোশাক পরা দাড়িওয়ালা লোকটা হো-হো করে হেসে উঠল, বলে উঠল, চাকরি দেবেন কিনা বলে অনেককে আপনি ডেকেছেন। এখন আমি যদি বলি, আপনকে চাকরি দেব কি দেব না ঠিক করতেই এসেছি আমি?

না-না, না, মিস্টার তারানাথ চৌধুরী, কাকে গ্রহণ করবেন, আর করবেন না, এই নিয়ে আপনি ভাবছিলেন, ভাবুন, যতক্ষণ খুশি, আমার ডিসিশন ফাইনাল। আপনাকে গ্রহণ করব কি করব না, খুব শীগগির জানিয়ে দেব আমি।

আমি, তারানাথ চৌধুরী। তখন কপাল আমার কপাল, সেই কপাল মুছব বলে একটা রুমাল হাতড়ালাম।

নেই।

পরদা

রোজ ওরা চেয়ে চেয়ে দেখে!

যে চোখের পলক পড়ে না, সেই চোখ দিয়েই হাসে। দু'একজন বিশ্রীভাবে কাশেও। কেউ হালকা সুরে, নিচু পরদায় গান ধরে। আরেকজন মোটা সোটা মহাভারত সাইজের বইটা কোলে টেনে নিয়ে তবলা বাজায়।

ময়না শোনে, ঠুকরে ঠুকরে ছোলা খায়, ছাতু খায়, ঠোঁট দিয়ে খাঁচার শিক ঠোকরায়। কিন্তু কিছু বলে না! শোনে, মুখ বুজে শোনে।

রুনির লজ্জা কেন, ও বোঝে।

লজ্জা হবে না? রুনির এখন সেই বয়স, যে বয়সে লজ্জাই ভূষণ। রুনির বয়স যদি হত দশ কিংবা বারো, তবে ওদিকের ঘর থেকে কে তাকে দেখছে না দেখছে, তাতে তার বয়েই যেত। যখন শরীর ভরেনি, চাউনি বাঁকা হয়নি, পায়ের গোছ বলে বস্তুই নেই, তখন যে খুশি দেখুক, যত খুশি দেখুক না। আবার, বিয়ে যদি হয়ে যেত রুনির, সে কোলের বাচ্চাকে অনায়াসে নাচাতে নাচাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে পারত। ঘরে ঢুকে বাইরের দিকে পিছন ফিরে বসে আঁচল আড়াল করে তাকে দুধ দিত। একবার বাচ্চা হ'লে একটু আধটু অসাবধান হতে দোষ নেই। লোকের নজরে শুচিবাই তখন থাকেই না।

রুনির বউদিরও নেই। নিচের কলতলায় স্নান সেরে সে ভিজে কাপড়ে, বড় জোর বুকের ওপর একটা গামছা আড়াআড়ি ফেলে যত অসঙ্কোচে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে, রুনি তা পারে না।

অভিজ্ঞ ময়না ছাতু খায়। ধোঁকে, আর ভাবে রুনি পারে না। রুনির বয়সী কোন মেয়েই পারে না। না বাচ্চা, না মাঝ-বয়সী—এইসময়ে মেয়েরা কিছু জড়োসড়ো হয়। চলতে গেলে পায়ে শাড়ি জড়ায়। যেন আলগা ফুলটির মত, টোকা দিলে ঝরে পড়বে।

রুনিকে ময়না তাই সহানুভূতির চোখে দেখে। রুনি ওর বৌদিকে কি বলে, জানে।

বলে, রুনি রোজ বলে।

'বউদি, দাদাকে বলেছ?'

'হ্যাঁ ভাই, বলেছি।'

'কি বললে?'

'বলল তো যে, বলবে।'

সংক্ষেপে সার কথা। অন্য কেউ হলে ভাবত, সাংকেতিক ভাষা। অথচ আসলে তেমন কিছু নয়: ময়না জানে। সেই যে এ বছরের প্রথম ঝড়ে—যখন

ইলেকট্রিকের তার-সুদ্ধ, পাখিদের বাসা-সুদ্ধ পিঁপড়ের খাওয়া গাছটা কাত হয়ে পড়ল, খাঁচাটা ভীষণভাবে দুলতে দুলতে দড়ি ছিঁড়ে নিচের নর্দমায় গড়াগড়ি খেল, ময়নাটা তবু মরেনি;—তখনই ত কবাটের কব্‌জা আলগা হয়ে গেল। রুনিদের ঘরের দরজার। মুন্ড থেকে আধখানা খসা ধড়ের মত কবাট দুটো ঝুলতে থাকল। তখন থেকে ঝুলছে ত ঝুলছেই। ওরা কোন মতে ঠেক্‌না দিয়ে সামলায় বটে, কিন্তু একটু হাওয়া উঠলেই দরজাটা ফের আলগা হয়ে যায়, ক্লান্ত জীবের মুখের মত হাঁ করে যেন হাঁপায়।

রুনির ইচ্ছা, দরজাটা মেরামত করা হোক। ওর দাদা বাড়িওয়ালাকে বলুক।

ও বলে বউদিকে। বউদি যদি বলে অসুবিধে হচ্ছে, তবে দাদার গরজ বেশি হবে। বউদি বলে দাদাকে। দাদা রাজি হয়। বাড়িওয়ালাকে বলবে বইকি, নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু বলে না।

বলে না, কারণ, আসলে ভয় পায়। যে মাসে দরজাটা আলগা হয়ে পড়ল, সেই মাস থেকেই তো ওদের বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ে আছে, রুনি জানে। দাদার পার্টটাইম কাজটা গেছে। বউদির কথায় দাদা মাথা নেড়ে যতই সায় দিক না কেন, বাড়িওয়ালাকে মুখ ফুটে বলবার মত সাহস ওর কোন দিনই হবে না। বললেই হয়ত ভাড়ার তাগাদা আনবে। কেঁচো খুঁড়ে সাপ বার করে কাজ কী।

রুনি এসব জানে। ওই ময়নাও জানে। ও ঘুমোয় না যে। ঝিমোয় আর দেখে। দেখে, দেখে, দেখে।

রুনির ইচ্ছে, এই বারান্দাতেও পুরোনো শাড়িটাড়ি যা হয় তাই দিয়ে একটা পরদা ঝুলিয়ে দেওয়া হোক। বউদি তা চায় না। পুরনো কাপড় কই। যদি দু'চারখানা জমেও, তবে কাঁথা তৈরির কাজে লাগবে। কিংবা বাসনওয়ালাকে দিয়ে নেওয়া যাবে কাপ, ডিশ, গেলাস। পরদা-টরদা ওসব হল বাজে সৌখিনতা, পরদা রোদে জ্বলে, বর্ষায় ভেজে। শেষে পচে খসে ছিঁড়ে পড়ে!

বাইরে পরদা দিলে এই রোদ্দুরটুকুও পাব না যে। এখানে আমার বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিই। তেল মাখাই। রোদটুকু গেলে কোথায় যাব? বউদির আপত্তি অনেক।

রোদটুকুর মায়া রুনির কি নেই, আছে, দক্ষিণের খোলা এই বারান্দাটুকু দেখে সেই তো প্রথমে খুশিতে নেচে উঠেছিল। কালো সিমেন্টের ওপর সকালের রোদ যখন এসে পড়ে, মনে হয় প্রকান্ড একটা ফুলের তোড়া। তার গন্ধ নেই, রঙ আছে। তাকে শাদা বলব না, সোনালি বলব না, হলদেও না, তিনটেরই কিছু কিছু নিয়ে সে তৈরি। এই তিন রঙই রুনির পছন্দ, আর তিনে তিনে মিলে যে রোদটুকু তৈরি, তাকে পছন্দ সবচেয়ে।

কিন্তু তবু তো পরদা চাই।

কেননা রাস্তার ওপারেই যে ক্লাবঘর, আর সেখানে যে দিনরাত আড্ডা চলে, তা তো রুনি আগে জানত না। ওরা তাস পেটে, সিগারেট খায়, গান গায়, নাটকের মহড়া দেয়। বাড়িওয়ালার ছেলেটাই যে ও দলের পান্ডা, রুনি তাও জেনেছে। সাহস তো ওরই সব চেয়ে বেশি।

ময়নাকে ছাতু দিতে দিতে রুনি বলে, 'জানিস, সব চেয়ে বাড়াবাড়ি ওই করে। ক্লাবঘরের দরজা খোলা তো থাকেই, আর যেই টের পায় আমি ঘরে আছি, ওই নির্মলই একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কবিতা পড়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। আমাদের বারান্দায় পরদা নেই, কবাটের কবজা নেই, আমি একটু গড়াতে পারি না মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে, স্নান সেরে শাড়ি ছাড়তে আমাকে কত যে আড়াল আর আনাচ কানাচ খুঁজতে হয়। অভদ্র লোকগুলো সারাক্ষণ তো দেখছেই। ভিখিরির হাতের মত ওদের চোখ খোলাই থাকে। বল্ তো ময়না যাই কোথা?'

ময়না কি পরামর্শ দিয়েছিল কে জানে, রুনি নিজেই একদিন একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসল। সে বৃত্তান্তটা নিজেই ময়নাকে শোনালো।

তখনও বুক ধড়ফড় করছে, বলল, 'জানিস, আজ আমি নিজেই ওখানে গেছলুম। বল্‌তো, কোন্‌খানে?'

রুনি খানিক চুপ করে রইল, যেন ময়না কী বলবে তার অপেক্ষা করছে। কিন্তু ময়না যখন বলল না, বা বলতে পারল না, তখন রুনিকে বলতে হল।—'গেছলুম ওখানে। রাস্তা পেরিয়ে, ওই ক্লাবঘরে ঠিক নয়, ক্লবঘরের বারান্দায়। ভাবতে পারিস? তুই বুঝি বিশ্বাসই করছিস না? বেশ, তোকে খাঁচা থেকে বার করে নিই, আমার বুকে চেপে ধরি, তাহলে তুই টের পাবি, এখনও আমার বুকটা কী ভীষণ তাড়াতাড়ি ওঠাপড়া করছে। করবে না? সোজা কাণ্ড করেছি নাকি? গিয়ে দাঁড়ালুম ক্লাবঘরের বারান্দায়। ওরা ছিল, সকলেই ছিল। আমার পা কাঁপছিল, ভাবলুম ঝোঁকের মাথায় এতটা করে ভাল করিনি। ফিরে যাই। কিন্তু ফেরবারও উপায় ছিল না। কারণ, ও আমাকে দেখে ফেলেছে। বাড়িওয়ালার ছেলে নির্মল। দলের ওই সর্দার কিনা। চেহারাটা ভাল হলে কী হয়, ভারী অসভ্য আর পাজী। ময়না, তোকে আর কি বলব, তুই তো সবই জানিস। ও শিস দেয়, যখন তখন হাসে, রাগে আমার গা রী রী করা উচিত। উচিত, কিন্তু করে না। সত্যি কথা বলতে কি, আর শুধু তোকেই চুপি চুপি বলছি, আমার একটু মজাই লাগে।'

ময়না অবাক হল। খাঁচার শিক ঠুকরে ঠুকরে ওর বিস্ময় প্রকাশ করল।

রুনি বলে গেল। 'যাক, যা বলতে এসেছিলাম, তোকে সে-কথা বলি। ওরা আমাকে আজ খুব অপমান করেছে রে। অপমানই তো। আমি বললুম ওকে, নির্মলকে, আপনারা এই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে রাখতে পারেন না?'

'একটু জোর দিয়ে, গলায় একটু রাগ ফুটিয়ে বলেছিলাম। আমি বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। নির্মলই বারান্দায় এল। অন্য যে-কোন একজন আসতে পারত। কিংবা ওরা সবাই মিলে। কিন্তু এল নির্মলই। উনিই নাটের গুরু কিনা! ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখলেন। আহা যা না ছিরি, ভুরু কোঁচকালে ওকে কতই না ভাল দেখায়! নির্মল বলল, আমরা দরজা বন্ধ করে রাখব কেন? বললুম, আমরা ও-পাশেই থাকি, চলাফেরা করি, অসুবিধা হয়। তবু ও বলল, কী অসুবিধে?

'কিছু যেন বোঝেন না। বুঝলি ময়না, যেন ন্যাকা। মেয়েদের কত রকমের অসুবিধে আছে, সব মুখ ফুটে বলা যায় নাকি? এক ঘর পুরুষ এই সরু গলিটার ওপাশেই হাঁ করে চেয়ে আছে জানলে কোন মেয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুতে পারে? দরজাটার পাল্লা আলগা, তুই জানিসই তো।

'বললাম, ওকে সব বুঝিয়ে বললাম। ভদ্রলোকের ছেলে ভেবেছিলাম, সব শুনে ওর সহানুভূতি হবে। দূর, দূর। ও মানুষ নাকি? করল কি, পিছন ফিরে ওর ইয়ারদের দিকে চেয়ে বলল শুনেছিস, ওনাদের অসুবিধে হবে বলে আমরা নাকি ক্লাবঘরে বসতে পাব না।

'আমি বললাম, বসতে পাবেন না, তা বলিনি। শুধু দরজাটা বন্ধ করে রাখতে বলেছি। জানিস ময়না, একথা শুনে ও বিশ্রীভাবে হেসে উঠেছিল। একটা হো হো আওয়াজকে যেন ডেলা পাকিয়ে আমার মুখে ছুঁড়ে মেরেছে। আমার লেগেছে। মুখ লাল হয়েছে। কেঁদে ফেলিনি কিন্তু চোখ ফুলে উঠেছে।

'ভিতর থেকে ওর বন্ধুদের মধ্যে কে বলে উঠেছে, ওকে স্পষ্ট কথা বলে দে নির্মল, ওসব আবদার এখানে চলবে না।

'নির্মল সত্যিই আমাকে সেই কথাই বলল। বরং একটু বাড়িয়েই বলল। অত সুবিধে অসুবিধে বাছতে গেলে তোমার দাদাকে একটা নির্জন পাড়ায় নতুন একটা বাড়ি তৈরি করে উঠে যেতে বল। সেখানে কারুর নজর পড়বে না। ঠাট্টা ছাড়া কী। আর কী ছোটলোকের মত ঠাট্টা! যাদের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে, তাদের বাড়ি তৈরি করে চলে যেতে বলা মানে অন্ধকে অন্ধ, খোঁড়াকে খোঁড়া বলে গাল দেওয়া। না, ময়না? আর শুনলি তো, ও কিনা আমাকে তুমি বলল! আলাপ ছিল না, পরিচয়ও না, হলামই বা ওদের ভাড়াটের মেয়ে, তাই বলে প্রথম সাক্ষাতেই একেবারে তুমি! ও ভদ্রতা শেখেনি। তবু দমিনি, মরিয়ার মত বলেছি, বেশ, তবে আমাদের বাসাটা মেরামত করে দিন। দরজাটায় কবজা লাগান। একটা চোখ ছোট করে ও তখন আমার দিকে চেয়েছে।

' -ওসব কথা আমার বাবা জানেন, তাকে বল।'

'ময়না, তখন আমি চলে এসেছি। আসতে আসতে শুনেছি ওরা সবাই মিলে হাসছে। একজন বলল, আমার গলা নকল করে বলল, আমাদের অসুবিধে হবে, অতএব আপনারা দরজা বন্ধ করে সেদ্ধ হয়ে মরুন! মরে যাই। আরেকজন বলল, খবর্দার নির্মল, ওর কথায় কান দিবিনে, ওদের ঘরের দরজাও সারিয়ে দিবিনে। বাবা দিব্যি এখানে বসে বসে সকলে মিলে নানান মজার চীজ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের নজরে ওদের গায়ে যদি ফোসকা পড়ে, তবে ওরা উঠে যাক। নির্মলকে চাপা গলায় বলতে শুনলাম, উঠবে কী করে, ঘর ভাড়া তাহলে কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিয়ে যেতে হবে না? ময়না আমি রাস্তা পার হয়ে এসেছি, আমার হার হয়েছে।'

ময়না টের পেয়েছিল, কিন্তু সবটা বুঝে উঠতে পারেনি।' সেই যে সেদিন রুনি অতক্ষণ ধরে কাঁদুনি গেয়ে গেল, নালিশ করল বাড়িওয়ালার ছেলেটার

নামে, তারই নাম তো নির্মল? ফর্সা, লম্বা, চালিয়াত ছেলেটা? সে যে আজকাল ঘন ঘন যাওয়া আসা শুরু করেছে—সেদিনের 'পর থেকেই। ময়না তাতে অবশ্য অবাক হয়নি। এসব ছেলের ধরনধারন সে জানে। যারা ক্লাবঘরে আড্ডার ছুতোয় সামনের বাড়ির মেয়েদের ওপর নজর রাখে, তারা একটু আলাপের সুযোগ পেলে আর রক্ষা নেই।

ময়না অবাক হয়েছে রুনির ভাবগতিক দেখে। ছোকরা, ওই নির্মল, বারবার সে নানা ছুতোয় আসছে, তাতেও তো রাগ করছেই না, বরং প্রশ্রয় দিচ্ছে। ছি, রুনি, তুমি এমন বেহায়া! ওই ছেলেটাই তোমাকে সেদিন কী অপমান করেছিল, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? হলই বা ও বাড়িওয়ালার ছেলে, ওদের অনেক পয়সা, না হয় স্বীকার করলুম ছেলেটা দেখতেও ভাল। কিন্তু তুমি তো জানো, ও আসলে রাঙামুলো, ওর হাসি দেখে ভুলে যাওয়া তোমার উচিত হয়নি।

কিন্তু খাঁচায় বন্দী ময়না শুধু দেখতেই পারে, রাগ করতেও পারে, বড়ো জোর খাঁচাটিকে ঠোকরাবে, কিন্তু প্রতিকার করার সাধ্য তার নেই। সে লক্ষ্য করেছে, ওই নির্মল ছোকরা আসে, যখন ঘরে রুনির বউদি থাকে না তখন। বউদি যখন ছাতে গেছে চুল শুকোতে কিংবা কলতলায় কাপড় কাচছে, তখনই ও পা টিপে টিপে আসে। সময়গুলো রুনিই ওকে বলে দিয়েছে কিনা কে জানে! রুনি, তুমি না তেজী মেয়ে, তোমার তেজ কোথায় গেল? নাকি সবই বয়সের রীতি?

ময়নার ঘেন্না ধরে গেল। যে-মেয়ে আধময়লা শাড়ি পরে দিনরাত কাটিয়ে দিত, তার আজকাল সাজগোজের ঘটা কত! চুল আঁচড়ানো শেষই হয় না। সম্বলের মধ্যে তো খান তিনেক শাড়ি, তাই কতবার বদলে বদলে পরে, তার ঠিক নেই!

আর কত গল্প নির্মল এলে। ফুসফুস, ফিসফিস, আর কত খিলখিল হাসি। রুনি, ওই লোকটার ফাঁদে ধরা পড়বার আগে তুমি গলায় কেন দড়ি দিলে না!

সইতে না পেরে ময়নাটা একদিন চেঁচিয়ে উঠল। সবে বুঝি ওরা একজন আরেকজনের হাতে রেখেছিল হাত, হয়ত নির্মলের মুখটা রুনির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, ঠিক তখনই ময়না কর্কশ গলায় ডেকে উঠল। দু'জন ছিটকে সরে গেল দু-দিকে, নির্মল তরতর করে সিঁড়ি টপকে পালাল, আর রুনির বউদি আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল।

'কী হয়েছে, ঠাকুরঝি, কী হয়েছে?'

'কই বউদি, কিছুই না তো।'

ময়না মনে মনে বলল, মিথ্যেবাদী।

রুনির বউদি বলল, 'পাখিটাকে বুঝি খেতে দাওনি? খুব জোরে ডেকে উঠল কিনা, আমি তাই ভয় পেয়েছিলুম।'

'ওকে খেতে দিচ্ছি বউদি, তুমি রান্না ঘরে যাও।'

খেতে দিতে এসে ময়নাকে ভীষণ বকল রুনি।

'তোকে আমি খেতে দেব না ময়না, দেব না, দেব না, দেব না। তুই

কেন চেঁচিয়ে উঠলি? বুঝি, হিংসে, তোর সব হিংসে। আমরা দু'জন আগে সখীর মত ছিলুম, দু'জনেই দুঃখী। এখন আমি একা সুখী হতে চলেছি তুই সেটা সইতে পারছিস না, কেমন? না হয় ও আমার হাত ধরেছিলই, না হয় মুখও নুইয়ে দিয়েছিল, কিন্তু ও একটা ইয়ে খেলে কী এমন রসাতলে যেত, শুনি? তুই ভাবছিস, ও লোক খারাপ? তা নয়, ময়না, তা নয়। আমিই আগে ওকে ভুল বুঝেছিলুম। ওর মনটা খুব ভালরে। ওর বাবার, আমাদের বাড়িওয়ালার মত ও চামার নয়। যাকগে, হবু শ্বশুর, নিন্দে করব না। ও চাকরি খুঁজছে, পেলেই নাকি আমাকে...। বাবা-মার মত ওই করাবে। আমার মত মুখ নাকি ত্রিভুবনে দেখেনি। তুই বিশ্বাস করছিস না?'

রুনি এবার খুব রাগ করল। 'তা তো করবিই না। তোর মনে মনে যে হিংসে। ওই জন্যে তো মাঝে মাঝে তোর ওপর খুব রাগ হয়। ভাবছিস আমি লাজ-লজ্জা বিসর্জন দিয়েছি, আত্মসম্মান খুইয়েছি। তা নয় রে, পাখি, তা নয়। আমি আমার 'কোট' ছাড়িনি। ওই দরজা ওরা সারিয়ে দেবে। সে কথা আজ আদায় করে ছেড়েছি। কী হয়েছিল জানিস? ও যেই ঘরে ঢুকে আমার হাত ধরল, তখুনি আমি আঙুলের ইশারায় ওকে দেখিয়ে দিলুম ক্লাবঘরটা। এ-দরজা হাট, ও-দরজা হাট। ওরই চারজন বন্ধু এদিকে ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে আছে। ব্যস, বাবুর মুখ অমনই কালো হয়ে গেল। কী বলল, বল তো রে?'

ময়না বলতে পারল না।

রুনি বলে গেল, 'বলল ছিঃ, তোমাদের ঘরটায় পরদার বালাই নেই? আমি বললাম, দরজা তো তোমরাই সারিয়ে দাওনি। ও বলল, হুঁ। আরও বলল, ওর বাবাকে বলে দরজাটা সারিয়ে দেবে। ক্লাবঘরের দরজাও যতক্ষণ পারে বন্ধ রাখবে। বলল, তোমাকে দ্রৌপদী হতে দেব না আমি। কী দুষ্টু বল্ তো। পুরুষরা ভারী হিংসুটে। আগে সবাই দেখতেন। এবার বাবু সবটাই নিজের জন্যে রাখতে চান; পরদা না থাকার জ্বালা টের পেয়েছেন। তুই কি বলিস, এক ঢিলে দুই পাখি মারলুম না?'

খাঁচাটায় আস্তে আস্তে একটু দোলা দিল রুনি। ময়নাও দুলতে লাগল। আরও কাছে এসে বলল, 'তুই ভাবছিস সব ওদের ধোঁকা? অমন যদি করিস ময়না, দেব একদিন তোর গলা টিপে। কিংবা খাঁচা খুলে উড়িয়ে দেব। তোর অত সন্দেহ কেন রে? বলছিস, ওর সব কথা মিথ্যে, বড়লোকদের কথায় বিশ্বাস করতে নেই? কিন্তু ময়না, তোকে একটা কথা বলি। তুই তো আমাদের ঘরের হাল জানিস, আমার বয়স কত তাও জানিস, আমাদের উপায়ই বা কি? বিশ্বাস না করেও এতদিন তো জিতিনি, না হয় একবার বিশ্বাস করেই ঠকি?

মুখোশ, মানুষ

কী লম্বা করিডর, সরলরেখা। সমকোণের পর কোণ। গোটা স্কুলপাঠ্য জ্যামিতিকে কেউ যেন এখানে কংক্রিটে চাক্ষুষ বাঁধিয়ে রেখেছে। স্কুলের সেই জীবন এইভাবে সোজা সোজা টানে টেনে এঁকে কেউ যদি রাখত? এমন করিডর কোথাও কি আছে? কোনো কালে ছিল?

ভাবছিল, সমীরণ ভাবছিল। সে তার ভাবনার সংগে তাল ফেলে সটান হেঁটেও গেল। করিডরের দক্ষিণ মেরু অবধি—যেখানে লিফট্। যেন দেখলাম, যেন দেখলাম না, যেন চিনলাম, যেন চিনলাম না। এই সব কণ্টে বিদ্ধ আর ভাবনায় সমীরণ উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল, যখন লিফট্টার ঠিক বাইরেই মেয়েটিকে সে দেখতে পেল।

মেয়েটা কপাল থেকে গলা পর্যন্ত একটা মুখোশ এঁটে নিয়েছে কেন? ওকে দেখতে পাচ্ছি, আবার সঠিক পাচ্ছিও না। মুখোশ যদি পরতেই হয়, তবে (সমীরণ ভাবল) অ্যালুমিনিয়ামের পরাই ভালো। কোনও কিছু মানে মুখের পেশী, মনের ভাব-লেশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার উপায় নেই। সাদা একটা মারসিরাইজড্ কাপড়ের মতো ধাতুতে তৈরি জিনিস তোমাকে একেবারে লুকিয়ে ফেলবে। সত্তাকে না পারুক, তোমার চেহারাকে।

মানুষ উটপাখি হলে অবিশ্যি আরও সুবিধে ছিল সমীরণ ভাবল। তাহলে বালিতে মুখ গুঁজলে কাজ হয়ে যেত। অ্যালুমিনিয়াম-টিনিয়াম লাগতই না।

ভেবে-চিন্তে সমীরণ লিফট্-এর বোতামে হাত দিল। তখনও মাথা থেকে দুষ্টু ভিমরুলটার গুনগুনানি থামেনি। সমীরণ রীতিমতো সিরিয়াসলি চিন্তা করছিল মেয়েটিকে, যে লিফট্ কখন আসবে, সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তাকে জিগ্যেস করে, তোমার মুখোশটা কিসে তৈরি, সেলোফেনে না পলিথিনে? ও নিশ্চয়ই উত্তর দেবে না, তবু মনে মনে সংলাপের সুবিধে এই, জবাব না পেলেও জুতসই জবাব জিভের ডগায় এসেই যায়। অনেকক্ষণ ধরে বাক্যালাপ চালালে চলে। যতক্ষণ না অটোমেটিক লিফট্ এসে নির্ধারিত জায়গায় দাঁড়িয়ে বুক ফাটিয়ে হাঁ হয়ে যায়।

এখনো মনে হচ্ছে লিফট্টা অন্য কোনও তলা থেকে অন্যতর তলাতেই যাচ্ছে। ফলে সমীরণ মনে মনে এটুকু বলার সুযোগ পেল: "পলিথিনের মুখোশ পরা বোকামি, নিজেকে লুকোনোই যদি লক্ষ্য হয়! পলিথিন বা সেলোফেন তো ভিজে অন্তর্বাসের মতো। সব দেহরেখাকে ফুটিয়ে তোলে প্রচার করে দেয়।"

তখন? তখন উত্তরে চেনা-না-চেনা মেয়েটা যদি বলে, যদি হো হো হেসে

ওঠে? যদি তার খিলখিল গলা শোনা যায়, "মুখোশ পরেছেন তো আপনিও।"
"আমিও মুখোশ পরেছি?"
"হ্যাঁ।"
"কী করে বুঝলে?"
"প্রথমত বুঝলাম এইভাবে যে, আমরা সবাই একদিন যেমন পোশাক পরতে শুরু করেছিলাম, আজ আর জামাকাপড়ে শরীর ঢাকাটাকে একটা ব্যাপার বা খবর বলে মনেই হয় না, ওটা স্বাভাবিক, ওটা আছে বলে ধরেই নিয়েছি, মেনেই নিয়েছি সব্বাই, তেমনই এখন হয়তো এমন একটা সময়ের মধ্যে আমরা প্রবেশ করেছি, অন্তত পৌঁছে গেছি এমন একটা সময়ে, যখন মুখোশ পরে সব্বাই এত সহজ যে, এ নিয়ে কেউ জিজ্ঞাসাবাদও করে না। যেমন পোশাক, তেমনই মুখোশ—ও তো থাকবেই। আপনারও আছে। আয়নায় মুখ দেখেননি কিনা, তাই নিজের চেহারাটা নিজে টের পাচ্ছেন না।"
"নিজেকে টের নাই বা পাই, কিন্তু সকলের সঙ্গে মিশব যে, কথা বলব, মুখোশেই যদি সব ঢাকা থাকে, তবে কে কোন্ জন চিনব কি করে? পোশাক তবু একটু আধটু খোলা রাখত। কিংবা তারও আগে জরুলের দাগ বা আংটি-টাংটি ছিল। এখন পরিচয়ের রাস্তা কি?"
"রাস্তা নেই, ঘুলঘুলি আছে। গলার স্বর, চলার ভঙ্গি আর—আর—আর।"
শেষ বাক্যটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই লিফট্‌টা এসে দাঁড়াল। চিনি না চিনি মেয়েটি কি বলতে চেয়েছিল এর পর?
"আফটার ইউ।" সৌজন্যমূলক এই সম্ভ্রম দেখাতে দেখাতে সমীরণ মনে মনে অনুক্ত অংশটি পূরণ করে নিল। ও বোধ হয় বলতে চেয়েছিল, আর চিনি গলার স্বরে। মুখ আর গা যতই ঢাকা থাক না, গলা চট্ করে বদলানো যায় না। আরও আগেকার কালে লোকে শুনেছি চিনে নিত, চাউনি থেকেও।
"অন্ধকারে ছোঁয়া থেকে জানাজানি হত, এই রকম কিংবদন্তী আছে।"
লিফ্‌টের দরজা যখন বন্ধ, যখন সেটা চলতে শুরু করেছে, তখন সমীরণ কতকটা পুরাতন নাটকের ধরনে পুরাতন কথাটাই স্বগত বলল। তার অসোয়াস্তির সীমা নেই। মেয়েটি কে? চিনি চিনি করেও চেনা যাচ্ছে না—সেটা অস্বস্তি নম্বর এক। দুই, ওই যে মেয়েটি বলল, তারও মুখে পলিথিন বা সেলোফেনের মুখোশ? সে কি সত্যি? তবে ওই মেয়েটি তার যদি চেনাও হয়, তবে সে সমীরণকে চিনবে কি উপায়ে? মেয়েটি সমীরণকে চেনেনি, তার চেয়েও বড়ো কথা, চিনতে পারবে না, এই আবিষ্কারে সমীরণ লিফটের তালে তালে দুলতে থাকল। তার হা হা বুক ভরে গেল হাহাকারে।
আঃ, মুখে না হয় মুখোশ, কিন্তু চোখটুকুও খোলা নেই কেন? বোরখায় যে রকম থাকে! যেমন থাকে ইটকাঠে ঠাসা ইমারতের স্কাইলাইটে? স্কাইলাইটে, স্কাইলাইট—যা লাইট নিয়ে আসবে। কয়েক চিলতে রঙ, রঙেরই কয়েকটা ঝিলিক। আর ফাউ, একটুখানি বয় কি-না ফুরফুরে হাওয়া।

সমীরণ দেখল তবু দেখল না, চিনল তবু চিনল না। বুঝল। যেভাবে নিশ্চক্ষু আদিম জন্তুরা একে অন্যকে বোঝে। মুখোশ পরা দুটি প্রাণী, একই লিফটে। তার মুখে কথা সরছিল না।

মুখোশ-পরা মেয়েটি প্রথম কথা না বলার উপোস ভাঙল। নাকের ডগার উপরে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, সে তুলতুলে একটা রুমাল বের করে আরও তুলতুলে সেই নাকের পাটা মুছল। সমীরণ দেখছিল। মুখোশে চোখের কাছে ফোকর থাক বা না থাক, তবু সে সব দেখতে পাচ্ছিল। দিব্যদৃষ্টি যাদের নেই, তাদেরও কখনও কখনও চোখ দিব্যি চলে।

মেয়েটিকে সমীরণ বলতে শুনল, "এখানে এত বিশ্রী গন্ধ কেন?"

"হয়তো কোনও ইঁদুর মরেছে।" সমীরণ বলল।

তার মুখের ভাব তো পড়াই যাবে না, তার গলাও ভাবলেশহীন। সে বলল, "ইঁদুর টিঁদুর মরলে তো এখানে পড়ে থাকত!"

"সব মড়ারা যে পড়ে থাকে না," সেই মুহূর্তে মেয়েটিকে এই কথা বলে দিতে সমীরণের ইচ্ছে হল না। সে নিজেকে নিজে সুস্থির বলে জানলে বলতে পারত, ইদানীং অনেক মড়া নিজ নিজ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিজেরাই সম্পন্ন করে। শোকার্ত কাউকে পায় না কিনা! তা মনুষ্যকুলেই যদি এই হাল, মূষিক জগতে নিশ্চয় মৃতদের অবস্থা আরও অশ্রুপাতযোগ্য না হোক, শোচনীয়।

এমনও নিশ্চয়ই হতে পারে, আজকাল এই মড়কের বাজারে আরশোলা, টিকটিকি, ইঁদুর প্রভৃতি যারাই পাইকারী মরে তারাই শাস্ত্রীয় সৎকারের আশা নেই জেনে নিজেরাই নিজেদের শরীরটাকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

মেয়েটি যেন সমীরণের ভাবনা অনুমান করে বলল, "গন্ধটুকু রেখে যায়।"

(গন্ধটুকু তো চলে গিয়েও আরও অনেক কিছুই রেখে যায় রূপসী! যেমন বেল, যেমন জুঁই, যেমন হাসনুহানা। কই তাদের বেলায় তো কিছু বলো না! বলো না কেন তাও জানি। সেই গন্ধ খুব দামী বিলিতি ইমপোরটেড এসেনসের বিকল্প যে! শ্যানেল ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ দ্যাখো, একই গন্ধ কিন্তু কি বিটকেলে খোয়াড়ি রেখে গেল। এ যেন মহদাশয় মহাজনদের কীর্তির পাশে অভাজন দুবৃ্ত্তদের কদর্য কাদায় লেপ। জীবনের কথা। দ্যাখো দুটোই স্মৃতি, তবু কত তফাত। দুটোতেই আমরা ধূপধুনো দিই। একটি ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আর প্রণাম জানাতে। আর অন্য ক্ষেত্রে ওই ধূপ-ধুনো গলা ঠেলে উঠে আসা বমির গন্ধ ঠেকাতে।)

"ইঁদুরটা হয়তো ঝাড়ুদার সরিয়ে নিয়ে গেছে।" মেয়েটা বলল।

গন্ধটা সে ঝাঁট দিয়ে সরাতে পারেনি, সমীরণ মনে মনে এই কথা ভাবল।

আসলে সে ভাবছিলই। ভাবছিল যে, কত ইঁদুর মরে অগোচরে, এখানে ওখানে তাদের হিসেব কে রাখে? তাদের সরিয়েও যে দেবে, এত ঝাড়ুদার কি আছে এই দুনিয়াতে? শরীরটাকে যদি সরাতে পারে, কিন্তু গন্ধটা যে থাকে, থেকেই যায়। হায় ভগবান!

গন্ধটা ক্রমেই উৎকট হয়ে উঠছে। মেয়েটা এসেনস্ ঢেলে নিল। (ঢাললি কোথায়, তোর পলিথিনের'ওই আস্তরণে? তাতে কি নাক বাঁচবে? তোর না যদি বাঁচে, আমার বমি বাঁচাবে কে?)

বিচ্ছিরি গন্ধটার বেগ ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। সমীরণ যদি সুস্থ থাকত, তবে সে নিজেকে সামলাতে পারত। কিন্তু লিফটটা চলছিল, সমীরণ ভাবছিল, বমিবমি, লিফটটা চলছিল সমীরণ ভাবছিল আরও উপরে, সমীরণ ভাবছিল কই না তো, সে ভয় পাচ্ছিল সে ভুল বোতাম টেপেনি তো?

লিফটটা উঠছে না নামছে, সমীরণ টের পাচ্ছিল না।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল, মেয়েটির একটা কথায়।

"কোন্ বোতাম টিপেছিলে?"

"টি-মানে টপ ফ্লোর।"

টি মানে যে টিপ্ও হতে পারে। এটা সেই মুহূর্তে সমীরণের মনে এল না।

এখনও গন্ধ। মেয়েটি বলছে, সে শুনতে পেল। সেই মেয়েটি, যাকে সে চেনে না, কিন্তু কে জানে হয়তো চেনে, কোনও দিন চিনত। পলিথিনে সেলোফেনে সব ঢাকা পড়ে গেছে।

"এখনও গন্ধ" প্রতিধ্বনি করল সমীরণ। "আই হোপ্ ইউ ওনট মাইনড্, উড ইউ, ইফ আই সে," আর সমীরণের মুখটা কি তুবড়ি আর এই লিফটটা দেওয়ালীর রাত? ইফ্ আই সে, এর পরে কি বলতে চেয়েছিল সমীরণ?

মুখোশ-ঢাকা মুখের অন্তত ঠোঁট দুটো কি খোলা থাকে? যদি থাকে, তবে সমীরণ হয়তো বলতে চেয়েছিল, আগেকার দিনে অবাঞ্ছিত যা কিছু জন্ম এবং জীবন, লোকে ডাসটবিনে ফেলে দিয়ে যেত। সেই সব জীবন ওঁয়া ওঁয়া বলে চেঁচাত। এটা আধুনিক যুগ কিনা! তাই জন্ম হোক, বেজন্ম হোক, আরশোলা হোক, ইঁদুর হোক, ওরা সব ফেলে দিয়ে যায় বিদ্যুৎ চালিত লিফটে।

ধস নামার বর্ণনা খবরের কাগজে পড়েছি, ছবিতে দেখেছি। একটা লিফট্ও যে ধপাস করে থামে, সমীরণ নিজেকে বলল, আগে কোনও দিন এমন সংবেদিত জানিনে।

সমীরণ বলে উঠল। "আরে, এটা যে গ্রাউনড্ ফ্লোর! না, না, তারও নীচে, এটা যে বেসমেনট্! বাংলায় যাকে বলে পাতাল,—"

"বলেই ছিলাম তো, হয়তো ভুল বোতাম টিপেছিলেন।"

"কত ভুল, কত ভুল শোধরানো যায়, বলো?" কি আশ্চর্য সমীরণ না-দেখা না-চেনা মেয়েটিকে হঠাৎ 'তুমি' বলল।

"এবার কি হবে?" মেয়েটির গলা কাঁপছিল। মুখোশ-পরা মুখে রেখা পড়ুক না পড়ুক, সেই মুখেরও স্বর কাঁপে।

সমীরণ শুনল, "কি হবে? কি হবে?"

আস্তে আস্তে হাসল সমীরণ। "পাতাল বা বেসমেনটে পড়ে থাকব না

"নিশ্চয়ই। আর একটা বোতাম টিপলেই আমরা ফের উপরে উঠে যাব। গ্রাউনড্ লেভেল। যেখানে আমরা থাকি, সেখানে।"

'যাব তো?' সে জিগ্যেস করল।

সমীরণ বলল, "যাবই।"

"কিন্তু ওঠার সময় যদি ওই গন্ধ! যে ইঁদুর মরে গেছে, অথচ যাকে দেখতে পাচ্ছি না অথচ তার গন্ধ সইছি। যদি ওঠার সময়েও তাই ঘটে? তাহলে আমি যে ফিট্ হয়ে যাব।"

অভয় দিয়ে সমীরণ বলল, "ভয় তো ওইখানেই। আমরা ফিট্ হই শুধু বিচ্ছিরি জিনিসে আর বিচ্ছিরি গন্ধে। একেবারে মরে গেলে খুব কায়ক্লেশহীন উপরে উঠে যাওয়া যেত।"

মেয়েটি বলল, "জানি।"

ততক্ষণে ওই স্যাঁতসেঁতে পাতালের খুপরিতে বোতাম টিপে দিয়েছে সমীরণ, লিফট্ আবার দোদুল দুলতে দুলতে নড়তে শুরু করে দিয়েছে। (সমীরণ এই প্রথম টের পেল, নড়াটা ওঠা না পড়া—সব সময় বোঝা যায় না। তবে নড়া মানে প্রাণ আছে, তার প্রমাণ বটে, এই লিফটারও প্রাণ আছে।)

সমীরণ বলল, "লিফট্ উঠছে। একটু পরেই আলো পাব।"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, বাতাসও।"

সমীরণ বলল, "সব পেয়ে যাব।"

মেয়েটিঃ "কিন্তু কিছু দেখা গেল না যে! না মরা ইঁদুর, না বাঁচা আপনাকে।"

সমীরণ জুতোর গোড়ালিতে গোড়ালিতে ক্লিক্ করে বলল, "যদি নাটকই চান, তবে বলি, কে যে মরেছে আর কে যে বেঁচে আছে,, আমরা কিছুই জানি না।"

মেয়েটিঃ "আপনি তো বললেন ওটা ইঁদুর।"

সমীরণ এইখানে লিফ্টের স্টপ্ বোতামটায় হাত ছুঁইয়ে বলল, "ক্ষমা করবেন, সময়কে খানিকক্ষণের জন্যে আটকে রাখছি। শুধু আপনাকে গোটা-কয়েক কথা বলব বলে। ভয় পাবেন না, বড়ো জোর মিনিটখানেক। তার বেশী নয়।"

"আপনি বড়ো হেঁয়ালি করেন।"

"হেঁয়ালি করেই বলছি, হয়তো কোনও ইঁদুর মরেনি, মরেছে একটা ভালো-বাসা। অন্তত একটা সম্পর্ক?"

"কাদের?"

"যাদেরই হোক। যে-কোনও দুজনের। ভালোবাসা আসে, ভালোবাসা চলে যায়। সম্পর্করা জন্মায়, সম্পর্করা মরে। কত প্রেম, কত সখ্য ইত্যাদি। সে সব বাঁচিয়ে দিতে বাইরের কেউ তো এগিয়ে আসেই না, বরং জিনিসটাকে সিঁটিয়ে চুপসে যেতে দেখেও চুপ করে থাকে। দর্শক বনে যায়। ভুল-বোঝাবুঝির জট খুলতে কেউ এগিয়ে আসে না।"

"মরা ভালোবাসার সম্পর্কেরা তবে মরেই থাকে?"

"তার চেয়েও খারাপ। মরে তো থাকেই, পড়েও থাকে। যেন এ থানার পুলিশ দেখল, ও থানার পুলিশ এল, কিন্তু কেউ লাশটাকে—বাঁচানো তো তাদের ক্ষমতার বাইরে—সরাতেও হাত বাড়িয়ে দিল না।"

লিফট্‌টা উঠছিল।

"এইভাবে সব সম্পর্ক মরে যায়?"

"সব সম্পর্কের কথা জানি না, তবে অনেক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। শুধু একটুখানি হৃদয়ের ঘাটতি, সহৃদয়তার বিনিময়ের অভাবে।"—সমীরণ এই সব কথা বলল তাকে, যার মুখ তখনও সে দেখেনি।

এই কথা বলেই, লিফট্ আচিরে থামবে জেনেই সমীরণ বলে গেল, "মরে যাওয়া তো ডালভাত।"

"ঠিক তা নয়। পচে গলে দুর্গন্ধও ছড়ায়। যেমন এই ইঁদুরটা। লোকের বমি পায়।"

"পরের কেচ্ছার মতো বিষয় আর নেই, জানো?" বলতে বলতে হঠাৎ হঠকারী সমীরণ সেই মুখোশ-আঁটা মুখ-ওয়ালা মানুষটির নরম হাতে চাপ দিল।

"আপনি আমাকে তুমি বললেন?"

"বলেছি বেশ করেছি" বলে সমীরণ একটি হাত তুলে তার ঠোঁটে ছোঁয়াল। যেন পলিথিনের পর্দা আর নেই, সে চিনেছে।

"আর কি আশ্চর্য দ্যাখো, এত পচাগলা মরা সম্পর্কের মধ্যেও হঠাৎ তাজা একটা সম্পর্ক জন্ম নিল।"

দুঃসাহসী অভিযাত্রীর গলায় বলে উঠল সমীরণ। "লিভিংস্টোন, কিন্তু আমি লিভিংস্টোন নই।" সমীরণ বলল, "তাজা একটা তুমি থাকলেই যথেষ্ট। যেমন একটু আগে বেসমেনটে নেমেছিলাম। আর এখন?"

"এখন ফের ঝকঝকে রোদ্দুরে উঠে এলাম। তুমি বুঝি আবার টপ ফ্লোরের বোতামটা টিপে দিয়েছ?"

"বেশ করেছি।" বলে আর অপেক্ষা করল না সমীরণ, গদগদ, গলগল গলায় বলে গেল, "আমাদের কপালে মুখোশ কিন্তু রুমালে মুখ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেই রুমালে কিছুটা সুগন্ধিও মাখানো থাকে।"

কথা শেষ হয়েছিল, অথবা হয়নি। তাই সমীরণ বলে গেল, "মড়ারা গলে ঠিক। কিন্তু জ্যান্তরাও গলে, সেটা জানলাম আজকে।"

হা-হা খুলে যাওয়া এলিভেটরের দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলছিল, "আচ্ছা, কি করে এইটুকু সময়ে এতটা ঘটল বলো তো?"

সমীরণ তখন তথাগতপ্রায়-গদগদ গলায় বলল, "চিনতে হলে আমরা চিনে নিতে পারি। কিংবা কে জানে, হয়তো আগে কখনো আমরাও'এ ওকে চিনতাম, এখন পরস্পরকে ভুলেছি।"

"মুখোশ সব ভুলিয়ে দেয়" মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল।

সমীরণ বলল, "ঠিক। তবু আমরা ভুলিনি। কম্পাসের কাঁটার মতো ঠিক নিজেই হেলে যাই, এলিয়ে থাকি।"

সমীরণ বলল। মেয়েটি তখন বেরিয়ে এসেছে টেরাস গারডেনে। চুলে একটা গোলাপ গুঁজে নিল।

সমীরণ তখন সাহসী, বলল, "গোলাপই যখন চুলে পরলে, তখন মুখোশ কেন?"

"আপনার কেন? মেয়েটি বলল।

"তাই ভাবছি মুখোশ না থাকলে দিব্যি হত। আরও চেনা যেত।"

"কি চেনা?"

"অন্তত চামড়া আর চেহারা।"

উত্তরে সমীরণ বলল, "আমি তো জানি না অপেক্ষায় আছি।" হয়তো সমীরণ আর ওই মেয়েটি কোনও দিন চিনত। আজকের লিফটের বোতাম টেপায় বিভ্রান্ত করে দিল আর একটু।

উপরের টেরাস্ গারডেনের মুখে লিফটের দরজা খুলে গিয়েছিল বলে সেই দেখা-না-দেখা, চেনা-না-চেনায় প্রায় একাকার হয়ে যাচ্ছিল।

"আমরা কি পরস্পরকে চিনি?" মুখোশ পরা সমীরণ জিগ্যেস করল মেয়েটিকে।

"চিনতাম হয়তো, এখন চিনি না" জবাব দিল মেয়েটি, সেও মুখোশ পরা।—"মুখোশটাই যত আড়াল তৈরী করেছে।"

"নিকটকে করেছে দূর?"

মেয়েটি উত্তরে কিছু বলল না। তরতর করে নামতে থাকল সিঁড়ি দিয়ে। আর সমীরণ ভাবল, ঐ ছাদের বাগানে, ওই গোলাপের গন্ধে মোহিত হয়ে ভাবতে থাকল, যদি মুখোশ না থাকত? যদি সাজিয়ে গুছিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে না হত, তবে আজ কি অদ্ভুত ব্যাপারটাই না ঘটত!

আহা, সমীরণ ভাবল, পৃথিবীতে এত কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে হোক, কিন্তু মুখোশ যদি না থাকত!

শেষ রাত, তোমাকে

কোনোদিন জাগব না জেনে—

কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর।

ভোর রাত একটা সময় নয়, একটা ব্যাপার। যেন ছোট্ট একটা ঘটনা, বুদ্‌বুদের মতো ফুটে ওঠে, খানিকক্ষণ স্থির থাকে, তারপর মিলিয়ে যায়। সেই অর্থে ভোর রাতটাকে চৌকিদার বললেও খুব একটা ভুল কই, নেই, নেই, তফাত এই, ভোর রাত গমগম গলায় জানান দিয়ে আসে না, সে প্রস্থানও করে না খট-খট খুরে আওয়াজের ধুলো উড়িয়ে! সে শুধু দেখে, নিঃশব্দে, এই চরাচরের ঘুমকে। কারা জেগে আছে, ঘামে গরমে বিছানায় এপাশ ওপাশ হাঁসফাঁস করছে কারা, কে-ই বা এক্ষুনি উঠে কাত হয়ে এক গ্লাস জল খেল, খেয়েই গ্লাসটা সাইড টেবিলের উপরে ঠক। রেখে সে বুঝি টুকুস করে একটা সুইচ টিপে এক্ষুনি কলঘরে গেল। আজকাল আর সাতসকালে পিচের রাস্তাকে কাকস্নান করানো হয় না, ঘড়ি বেঁধে নিয়ম করে তো একেবারেই না, তবে শেষরাতে কারা যেন শাক-সব্জি বোঝাই ঠেলাগাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ ঠেলে ঠেলে দূরের, কাছের বাজারের দিকে চলে যায়। মোড়ের মাথায় দু-একটা ট্যাক্সি রাত-জাগা পাখির মতো মাঝে মাঝে ডেকে উঠে সওয়ারি চায়—ভোর রাত মানে এই সব। ওই এলোমেলো শব্দ না থাকলে শেষ রাত্তিরটাকে চোরও বলা যেতে পারত। চোর, মানে যে আসে রাবার সোলের বোবা চটি পায়ে, তার ঠোঁট কাঁপে না, চোখ ডিসটেম্পার দেওয়ালের মতো প্লাস্টিক ভাবলেশ, তবু সে তাকাক চাই না তাকাক, ঘুম ভেঙে গেলে তার চোখে চোখে চেয়ে থাকতে ভয়ানক একটা নাড়ি-ছেঁড়া সাধ বুকের ভিতরে ভিতরে পাগল হয়। শেষ রাত যেন পার্শ্বশায়িনী কোনও রমণীর চেয়েও রমণীয়, সেই অন্ধকারের ভিতরে সমূলে প্রবেশ করতে, তার সমূহ রহস্য ভেদ করে ছিঁড়ে ছেনে বাইরে টেনে আনতে মনটা পাল-তোলা নৌকোর মতো হঠাৎ আহ্লাদী হয়।

আজ শেষ রাতে দূরের কোনও পেটা-ঘড়ি অবসান-প্রায় নিশার কথা তার অচেতন স্নায়ুকে খুঁচিয়ে জাগরূক করেছিল বলেই চঞ্চল (ধরা যাক এই লেখা-টার কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নাম চঞ্চল) এই সব ভাবতে পারছিল। গা এলিয়ে দিয়ে, মাথার উপরে পাখাটা তখনও বিশ্বস্ত ঘুরছে সেটা চোখে না হোক চামড়ার পরতে পরতে অনুভব করে সে অবশ, অলস চিন্তাব তুলট কাগজে শেষ রাতের আকার স্বভাব ইত্যাদি কয়েকটি স্থিরচিত্র এঁকে চলেছিল। কানের

কাছে বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা টিকটিক ঠিকই করে চলেছিল, তবু সময়টাকে যাচাই পরখ একদম ইচ্ছে হল না তার, চঞ্চল হাত বাড়িয়ে খালি একটা সিগারেট খুঁজে তুলে নিয়ে দু-ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজল। আর সময় নেই, ঘড়িতে সময় কত সেটা স্থির না দেখেও স্পষ্ট টের পাওয়া যায়, সময় নেই। বাইরের আকাশটা এক্ষুনি তার গায়ের ঘোর কালো বাসী কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, প্রথম আলোর জলে চোখ মুখ কপাল ধুয়ে মুছে নতুন হবে, শুচি হবে।

আমরা এরকম পারি না। রোজ নতুন হওয়া অসম্ভব। খালি হওয়ার একটা আশাই, শেষ রাতে যদি ঘুম ভাঙে তবেই বেঁচে থাকা নামে তিরতিরে কায়ক্লিষ্ট নদীটির কিনারে লেগে থাকে। পাড়ে পাড়ে ছলাৎ ছলাৎ একটা কষ্ট একটা অভিলাষ হয়ে ক্রমাগত আঘাত করে। দেবে, দেবে, দেবে রাত পুইয়ে যে-দিনটি আসছে সে নিশ্চয় আমাকে নতুন না করুক একটু অন্যরকম করে দেবে। গতকাল দেয়নি, তার আগের দিনটিও না, কিন্তু যে-দিনটি আসেনি, যে-সব দিন এখনও আয়ুর উঠোনে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে, তাদের প্রত্যেকটাই মহতী সম্ভাবনায় গর্ভবতী। তারা আসেনি বলেই বরাবর সদাশয় উপুড়-হাত মহাজন, আর আমরা এক-একজন অকৃতার্থ হাত পাতা ঘাতক। তবু এই অনুভূতির সময়-সীমা খুব বেশি নয়, একটু পরেই পুবের আকাশে রক্তারক্তি দাঙগা লেগে যায়, ফিনকি দিয়ে ওঠে গলগল রোদ্দুরের ধারা, সেই স্রোতে আমাদের আশা ভাসে, আমাদের বাসনা নিহত হয়। হোক। তবু তো আসছে দিনের পরেও একটা পরের দিন থাকে। থাকে ভাগ্যিস, নতুবা যে-দিনটা এলো সেও হাজার হাজার নিষ্ঠুর বর্শায় বস্ত্রখণ্ডের মতো ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে যেত। টিকে থাকাটাই হত অসম্ভব।

পাখিরা এই সত্যের খবর পেয়েছে সৃষ্টির একেবারে সূতিকা থেকে। কী করে যে পেল, কে যে তাদের শিখিয়ে দিল সেই রহস্যের তল আমি, তুচ্ছ মানুষ আমি কোথা থেকে পাব। আমি শুধু শুনি সকালের ইশারাটুকু ফুটে উঠতে না উঠতেই, পাখিরা শিস দেয়, সবাই কলকল গান গেয়ে ওঠে, ঝটপট ঝটপট, ডানা ঝেড়ে গলা বাড়িয়ে এ ওকে ডাকে তারপর পাতার অন্ধকার ছায়া ছেড়ে সকলে মিলে, দলে দলে বাতাসে পাখা মেলে সাঁতার দেয়। যদিও কোন্ দিকে পার তার ঠিকানা নেই, ওদের জানা নেই।

অথবা কে জানে, পাখিদেরও আগে সকালের খবরটা পেঁছে যায় পাতাদের অন্তরে আঁটোসাঁটো লেগে থাকা কুঁড়ির পাপড়িতেও। ওরা কাঁপে, কোনও অনির্দিষ্ট বেতারের তরঙ্গ-রোমাঞ্চে, থরথর কাঁপে কাঁপে, তারপর একটু একটু করে নিজেকে মেলে দেয়, ফুটে ওঠে। আরও বেপরোয়া যারা, তারা নির্ভয়, উদ্দাম স্রেফ ঝরে যায়।

আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে ফিতেটা খুঁজে পেতে নিয়ে চঞ্চল কষে কোমরের

কাছে পাজামার গিঁটটা বেঁধে নিল। হাতড়ে হাতড়েই টের পেল বালিশের কোণটা ভিজে ? কী লজ্জা, ভিজে! ঘুমের ঘোরে, ওরে কী শুনেছিস ইত্যাদি ইত্যাদি, চোখের জল পড়েনি তো ? কোনও দুঃস্বপ্ন, কোনও শোক, কোনও স্মৃতি ? দূর দূর ওসব ব্যাপার সেই সব বয়সের সংগে কবেই চুকে-বুকে গেছে। যখন সপ্তাহে একদিন কি দু'দিন মোটে দাড়ি কামাতাম, চোখের জল-টলও সেই বয়সের ব্যাপার। রোগ কিংবা অভ্যাস। তখন একটু হাওয়া উঠলেই হল, সেই হাওয়ায় হয়তো খালি বাউন্ডুলে উড়ুক্কু শুকনো ধুলো, তৎক্ষণাৎ ভিতরে সে যে আকুলি-বিকুলি যেন বুকের ভিতরেই আস্ত একটা সমুদ্র নিহিত, সে কোথাও যাবে না, নিজের আকারেই ধরা থাকবে নিজে, তটরেখাকে মাঝে মাঝে অহেতুক ছুঁয়ে, আঁচড়ে এমন কি চেটেপুটে দেবে, তবু তবু এবং তথাপি এবং অতঃপর ফিরে আসবে নিজেরই ভিতরে—যেন নেই এমন আলোড়িত হবে। প্রক্ষুব্ধ, বিক্ষোভিত। তখন আমার এই রকম হত, আমার– আর, চন্দ্র সূর্য যদি এখনও ওঠে, তারায় তারায় আকাশের গায়ে কাঁটা দেয়, এখনও আমার মতো অনেকেরই। অসনাক্ত এক বিন্দু রক্ত। আমার আর ঝরে না, আমার রগে রগে যদি বা এখনও রক্ত থাকেও, আমার মর্মে নেই, আর নেই, কবে ফুরালো ? ফুরালো নাকি। বেহিসেবী খরচ করে ফেললাম আমিই ? না হোক আমি এখন নিঃস্ব, রিক্ত, কিন্তু তোমরা তো আছো! তোমরা কি কারণ-ছাড়া ছন্ন-ছাড়া উতলা হও না আর ? হও নিশ্চয়। আর যদি হও, তবে আমি আছি, এখনও আছি, চলে গিয়ে ফুরিয়ে গিয়েও নিজস্ব রক্ত-সম্পদে ফতুর দেউলিয়া হয়েও তোমাদের দপদপ নাড়িতে নাচছি।

কিন্তু এই নেশা-করা নিশি ঠাকরুন যখন সাদা সাদা দাঁত বের করে পুনশ্চ যুবতী, তখন আমি, এই চঞ্চলমতি চঞ্চলকুমার আমি কী করছি ? বালিশের কোণ চোখের জলে ভিজে নয়, না হয় বুঝলাম। কিন্তু কিসে ? অস্থির ছটফটে ঘাড়ের বিগলিত ঘামে, নাকি এই ফাটা-ফাটা ঠোঁটের গড়ানো কষে আর লালায় ? তাই যদি হয় তবে আমার মুখ রাখবার জায়গা কোথায় ? শৈশবে যে-ভাবে বিছানা নিষ্পাপ ভিজিয়ে শোনা যায় থেকে থেকে কঁকিয়ে উঠেছি, কৈশোরে বিছানার চাদর বেঘোরে চিটচিটে করে সমস্ত দিন পাপবোধে পীড়িত কিংবা বলব কি পৌরুষের বিকারে আচ্ছন্ন থেকেছি ? কিন্তু এই যে লালা, এর কোনও সাফাই নেই, এ নিয়ে বড়াই অর্থহীন। এই লালার নাম প্রৌঢ়ত্ব, এই লালা ইহজীবনের শেষ বেলা,হয়তো বা শেষ লীলাও, কে বলতে পারে, বলবে কে ? আর নিরুপায় ঘামের দরদর আত্মবিকাশের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। ওটা অথর্ব বেদনা।

কিন্তু কিন্তু কিন্তু এখন শব্দ নেই, এখনও নেই, খালি ঘড়ির টিকটিক ছাড়া, কারণ দেয়ালের ফোকরের বিনে ভাড়ার ভাড়াটে টিকটিকিগুলোও সারা সন্ধ্যা পোকা-মাকড় খেয়ে এখন পরিতৃপ্ত চুপ, যেহেত শব্দ নেই তাই নামে চঞ্চল হলেও আমি এক্ষণে সব কিছু স্থিতধী সমীক্ষা করি।'এই তো অবসর। ফর হেভনস সেক হোল্ড ইওর টাঙ্ অ্যান্ড লেট মি লেট মি কী ? লেট মি

'পনডার। আমাকে জাগাতে হবে। আমরা ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে থাকি, ঠেলেঠুলে, উল্টেপাল্টে, চিমটি কেটে, কর্ণকুহরে চিৎকার করে, কিন্তু নিজেদের জাগানোর কোনও জানা প্রক্রিয়া আছে কি? আছে, থাকতে পারে, যদি শরীর থেকে আত্মাকে নিষ্কাশিত করে নেওয়া যায়, সোজা কথায় আত্মা স্বয়ং যদি স্বেচ্ছায় দেহ থেকে নির্গত হয়, তাহলেই। তাহলে সেই আত্মা শিয়রে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ অবলোকন করতে পারে আমাদের, জেগে ওঠাটা যদি জরুরী হয় তবে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টির আগুন জ্বেলে জ্বেলে আমাদের ঘুম-ঘোরটাকে ফস করে জ্বালিয়ে দিতে পারে, দেয়ও, অষ্ট প্রহরের কখনও কখনও, তবে সেজন্যে যথোচিত পরিবেশ, সময়-নির্বাচন চাই। তেমনই একটি মাহেন্দ্র-ক্ষণ বুঝি এই শেষ রাত, কিংবা কে বলবে শেষ রজনী বুঝি সেই নির্গলিত চক্ষুষ্মান আত্মা, আমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে যে শুধু যাদুকরের মতো হাত নাড়ে, আলতো ছুঁইয়ে কপালে হাত বুলোয়, উত্তিষ্ঠত, ওঠো, ওঠো, ওঠো বলে, বলে, কেবলই বলে চলে। অতএব হে এই শেষ রাত, হে আমার নির্মুক্ত আত্মা বা সত্তা, তোমার অসম্মান আমি করব না। ডাকে সাড়া দেব। তবে মনে রেখো এই সাড়া দেওয়াটাও কিন্তু একটু স্বার্থত্যাগ, অনেক জ্বালা, অপমান দুঃসহতাকে ঝাঁপিজাত করা। একবার ভেবে দ্যাখো তো হে পরমাত্মা, হে এই রাতটির অন্তর্গত সত্তা, আমার গত কল্য কীভাবে কেটেছে, কীভাবে কাটে আমার যত গত-গত-গত সংখ্যাহীন অশেষ কল্যসমূহ? কী নিঃশেষ নীচতায়, কত আঘাতে, কী তিক্ত অভিজ্ঞতায়, কত শিরদাঁড়াহীন হামাগুড়িতে?

দিন পরে যায় দিন, এইভাবেই যায়-যায়-যায়, তবু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, হে আগন্তুক, হে আমার প্রাত্যহিক আগামী। তোমাকে গ্রহণ করি কিংবা তোমার হাতে সঁপে দিই নিজেকে, যা করবার তা করো, খালি একটু তাড়াতাড়ি সারো, শয্যালীন নারীদের নির্বেদ নিষ্ক্রিয় সমর্পণের মতো।

খুব কি ঝাপসা ঠেকছে কথাগুলো? শেষ রাত আমার গভীর থেকে ভাষাহীন উত্থিত এই সব নালিশ কি তোমার সর্বাঙ্গে জড়ানো আলখাল্লার চেয়েও অস্পষ্ট? তাহলে ছোট ছোট হরফে মোটা দাগে লেখা কয়েকটি কথা বলি। তবে হয়তো বুঝবে। যখন নিমেষ নামে ছোকরাটি কাল দরখাস্ত হাতে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন তো কই তুমি ছিলে না! শেষ রাত, তখনও তোমার জন্মই হয়নি।

ভারি সুন্দর দেখতে ছেলেটি, ওর ঘন বাবরি চুল, যেন-থোকা-থোকা-অজস্র কালো ফুল ওকে সাজানো বাগানের মতো আগ্রীবা সাজিয়েছে, চোখ দুটি খুব মায়াবী নয়নে চিরে বেব করা, টিকোলো নাকটা খোদাই ভাস্কর্য, সেই ঢল ঢল তরুণ উপস্থিতি এই পাষণ্ড পোড়খাওয়া আমাকে আমূল মোলায়েম করে দিল! দরখাস্তটা টেবিলে কাচের পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে পিনফোটানো একটা চিরকুট বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে হেলানো চেয়ারে গা এলিয়ে আয়েসী একটা সিগারেট ধরালাম, নিমেষ, মানে ওই ছেলেটি আমার প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ লক্ষ্য করল। এই চিরকুটটা ছিল ওর পরিচয়-

পত্র বিশেষ, আয়তির লেখা. তাকে কোন্ সূবাদে ছেলেটা চেনে, সুপারিশ-চিঠিটা আদায়ই বা করেছে কোন্ গুণে. আমি এসব তখন ভাবিইনি। লানচের পরে গা ভারী, চোখ ঢুলুঢুলু, আমার চোখে একটি মেয়ের ছবি তখন ভাসছিল, সেই ভাসাটা কীরকম? না, বিসর্জনী জলে একটু করে গলতে থাকা চিৎ হয়ে ভাসমান প্রতিমার কাঠামো যেমন। অথবা তার চোখ দুটি। ওই প্রতিমাটিকে কি হে চঞ্চলকুমার, তুমিও ভাসিয়েছ, নাকি সে নিজেই একদিন ঝাঁপ দেয় জলে. আরও টলটলে পবিত্র একটি সংরক্ষিত মুখে পরিণত হবে বলে? মেয়েদেরও কি এই সব অগাধ সাধ থাকে? জানি না। আয়তির ছিল কি? জানি না। এইটুকু এই ক্ষণে মনে ভাসছে ওর আয়ত চোখ দুটো দেখেই ওই রকম একটা বানানো নামকরণ আমিই করি. ব্যাকরণ হোক চাই না-ই হোক, সে কবে, কতদিন আগে? ধুস! মনেই পড়ে না। আয়তি এতদিন বাদে জলছবি হয়ে উঠল কেন, এই জিজ্ঞাসা আমার আদৌ নেই. মেয়েরা সংরক্ষিত হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাবশে কখনো স্বেচ্ছায় সূক্ষ্ম অর্থাৎ সানন্দে অশরীরী হয়ে যেতে চায় কি-না. তার চেয়ে বড় কথা হতে পারে কি-না এসব বাজিমাৎ সওয়াল আমি তো করব না। তবে অনেকে বিজয়ার প্রতিমা হয়ে যায়, এটা যেন আমার পাতলা চুলের গোছা আর গোঁফজোড়াটি পাকা এমন অঢেল জ্ঞান ইদানীং আমাকে দিচ্ছে, দিয়ে থাকে। ওরা কেউ কেউ তবু ফিরে আসে. নদীর ধারে গেলে জলছবিতে, বৃষ্টি ঝেঁপে এলে ছলছল বাতাসে. অরণ্যের সমীপে গেলে একটা সুর্মার টানে টানে একটা নীলে সবুজে আঁকা খানিকটা রঙ হয়ে ওঠে, আর নিঘুম রাত্তিরে? ওরা এক-একটা মশালের আগায় নির্ধূম ক্ষমাহীন ঝলসাতে থাকে।

কথাটা তাহলে আয়তির জলছবি কেন হল, তা নয়. কথাটা সে এই আধুনিকতার মার্কামারা ছোকরাটিকে চিঠি দিল কেন? ওকে ধন্য করতে কিংবা নিজেই এই একটা সূত্রে পুনরুজ্জীবনে উপকৃত হতে? এই উপকার নিমেষ নামে ওই ছোকরার. এই উপকার আয়তির। কিন্তু এর মধ্যে আমি কোথায়. এর মধ্যে আমি কেন. কোনোখানে নিজেকে নিমিত্তের বেশি অবশ্যম্ভাবী কোনও ভূমিকায় তো দেখতে পাচ্ছি না. ওদের উপকার, আর আমি শুধুই উপকরণ। আমি আমি বলছি এতবার. কিন্তু আমিটা কে? হয়তো আমি চঞ্চলকুমার নই. আমার নাম প্রয়োজন. আমার নাম ব্যবহার। অঃ. নিমেষ এমন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কেন? আমি কি ওর চক্ষুশূল. অথবা ওর চোখ দুটোই শূল হয়ে আমাকে বিদ্ধ করতে জানে। অন্তত এই মুহূর্তে নিমেষ আমার প্রত্যেকটি নড়াচড়া. উসখুস চাঞ্চল্য যেন একটা আতস কাচের পরকলা করে বাজিয়ে নিচ্ছে। এই যে আমি সিগারেট ধরালাম. এই যে ধোঁয়ার আড়ালে হতে চাইলাম মেঘনাদ, থম-থম গ্রাম্ভারী এক একজিকিউটিভ. ছাই পুরু হতে না হতেই কাঁপা আঙুলে ঝাড়লাম অ্যাশট্রেতে, হুঁশিয়ার ছেলেটি সমস্ত ওর নজর দিয়ে টুকে নিচ্ছে। এই মুহূর্তে ওকে আমার চাকরির উমেদার বলে ঠাহর হচ্ছে না তো! বরং সন্দেহ হয়. লোকটা একটি অধ্যবসায়ী গোয়েন্দা. ওর চোখ দুটো সার্চলাইট. না

না, তাও নয়, যেন ঝকঝকে আয়না। ক্যামেরাও হতে পারে। পরে হয়তো আমারই নেগেটিভ ছবিগুলো একদিন আমারই চোখের সামনে মেলে ধরবে।

অথচ ওর দরখাস্তটা আমি পড়েছি। ন্যূনতম কেন তার চেয়ে ঢের বেশি যোগ্যতা ওর আছে। বলতে কি, আয়তির চিঠি নাও নিয়ে আসত যদি, এই চাকরিটা পাওয়া ওর আটকাত না। তবে চিঠিটা না হলে আমার এই বাতানুকূল হিমঘরে ও কি ঢুকতে পেত? সেটা একটা কথা বটে। কিন্তু এসব তো আমার বিচার। প্রার্থী ছেলেটি এভাবে অপলক চেয়ে থাকে কেন। চিরকুটটা যে বাজে ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছি, ওর দুষ্ট দৃষ্টি সেটা চেয়ে চেয়ে দেখছে, এখনও দেখছে! এমনিতে খুব সুবোধ গোপালের মতো বালক হাবভাব, অথচ ওর চোখ দুটো আমি চিনি, এই চোখ নির্ঘাত এক ব্ল্যাকমেইলারের। ঠাণ্ডা জবজবে ধরনের বশংবদ ভণ্ডামির তলায় লুকোনো আছে ঔদ্ধত্য—বয়সের। বয়স—আজকালকার ছেলেরা ওই জিনিসটাকে ওইভাবেই ফুটিয়েও তোলে, লুকিয়েও রাখে। নারীদের যৌবনের মতো একালের ছেলেদের বয়সের উপরেও ঢাকা দেওয়া আর প্রকট করা এই দুটি কাজের জন্যে সর্বাসিদ্ধিদাত্রী এক প্রকারের সূক্ষ্ম জালের কাজ করা অলক্ষ্য ব্রাসিয়ার পরানো থাকে। চঞ্চলকুমার, তোমার বয়স নেই, অতএব হায় রে হায়, তোমাকে হয় শুধু ঢাকতে।

শেষরাত, পরিশেষে তোমাকে বলি, কী অদম্য পরিহাস ছিল নিমেষ নামে ছেলেটার নির্নিমেষ চাউনিতে, তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

—ওটা ফেলে দিলেন?

—কোনটা? (যদিও গলাটা যথাসাধ্য ভারী করেছি, তবে সেটা নিজের কানেই ভাঁড়ের মতো ঠেকছিল।)

—ওই চিঠিটা। মিস সেন কিন্তু ওটা অনেক যত্ন করে লিখেছিলেন। (ও কি সব জানে, ও কি কিছু টের পেয়েছে?)

বললাম, চিঠিটার দরকার নেই তো। তোমার দরখাস্তটাই তো যথেষ্ট। (হা হা করে এক ধরনের বোকা হেসে আমি সমস্তটাকে হাল্কা করে দিতে চাইলাম।)

—তবু চিঠিটা চিঠিটা, ওর চোখ দুটো বারে বারে বলছিল। আর তৎক্ষণাৎ ওহে শেষ রাত, আমার এই সময়! তৎক্ষণাৎ আমি টের পাই সমস্ত ওর জানা, যেন একটা বই আদ্যন্ত পড়া হয়ে গেছে। ওকে আমি বলি—আচ্ছা, এবার তাহলে এসো। কাজটা— কাজটা তোমার বোধহয় হয়ে যাবে, দরকারী সব কোয়ালি-ফিকেশন তোমার যখন আছে, আর লোকেরও দরকার আছে আমাদের।

ও উঠল, নিমেষ উঠল, বাহ্যত কোনও অবিনয় নেই, মার্জিত পরিসীমিত কর্মপ্রার্থীরা এইভাবেই উঠে দাঁড়ায়, এই ভাবেই করে নমস্কার, বেরিয়েও যায়, কিন্তু যেতে যেতে? মনে হল ছেলেটির শেষ তাকানোর ভিতরেও একটু মজা, একটু দুষ্টুমির খোঁচা কোথাও ছিল। যেন ও জানে ও বেরিয়ে যেতেই নুয়ে পড়ে বাজে কাগজের ঝুড়ি থেকে আয়তির ছোট্ট চিঠিটুকু তুলে নিয়ে বুক পকেটে রেখে সেটাকে আমি কাজের করে নেব। যেন ও জানে, চাকরিটা ওকে দিচ্ছি না, আসলে দিতেই হবে আমাকে। কেন না ও যে সব জানে। দানটা

যখন এইভাবে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে, তখন ভিজে আজকের এই ভোরটি, তুমিই, বলো তো, তাকে ব্ল্যাকমেইল ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?

এই আমার দিন। দিন দিন প্রতিদিন। এক ধারা, এক ছাঁচ। আমাকে বর্তমান প্রহার করে, অতীত করে অনুসরণ, কখনও বা ছোবল তুলে বাতাসের মতো শীতল হিসহিস করে ক্রমাগত শাসায়।

চঞ্চল উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগল ওর চোখে মুখে এবং সেই কারণেই সে নিজেকে পরম প্রীত, আপ্যায়িত, কৃতজ্ঞ জ্ঞান করল, এই ধন্যবাদটা পাঠাবে কাকে, বায়ুর এই স্নিগ্ধতা, আকাশের নক্ষত্র-খচিত নবাবীর পাশে কোনও তৃতীয়া বা চতুর্থীর গরিব, শ্বেতসার রোগে ভোগা, হেলে-পড়া ক্লান্ত চন্দ্রকলা—কে তার ভাবনার ভাঁটা-পড়া গাঙে নতুন জোয়ার আনছে? সে ভেবে পেল না বলেই বুঝি নিজেকেই শেষ পর্যন্ত বলতে শুরু করল। নিজেকে কিংবা ওই বোবা সাক্ষীর সমান শেষ রাতটাকে। বলল, তারপর শোনোঃ

একটা জাল ডুপ্লিকেট শেয়ারে আজ সই দিয়েছি আমি, আমার ইনকাম ট্যাকস্ রিটারনে কয়েকটা জলজ্যান্ত এনট্রি নেই দেখেও অম্লান সই দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি, বিবেকবান, রুচিবান, শিক্ষাভিমানী এই আমি। জানো, কী করে রটে গেল, এসব খবর আসলে পিঁপড়ের মুখে মুখে শব্দহীন ছড়ায়, নিমেষ নামে ছেলেটাকে চাকরি দেওয়া হবে, অমনই যারা ওয়েটিং লিসটে ছিল, আর যারা অ্যাপ্রেনটিশ হিসেবে দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছিল, তারা সবাই, কিংবা খোদা জানেন সব্বাই না একটা শতাংশ, মোটের উপর তাদের অনেকেই ভিড় করে এই চঞ্চলকুমারের আপিস ঘর ঘেরাও করল। আমি তখন কী করলাম বলো তো? প্রথমে একটা অ্যানটি রুম, যেটা পেরিয়ে আমার খাস কামরা, তারও পিছনে সংলগ্ন একটা টয়লেট কিংবা পাউডার রুম, তোমরা যা বলো তাই বলো, সেটারও ঝাড়ুদার-এক্‌জিট-এর লাগোয়া একটা প্যাঁচালো সিঁড়ি, আমি সেইটে বেয়ে নেমে নেমে, সিঁড়ি নয় তো যেন পাহাড় থেকে অবতরণের পাকদণ্ডী, অবতরণ না পতন? আমি জানি না, জানি না, তবে দ্যাখো দ্যাখো, আমি এখন ক্যানটিনের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে কমিটি রুমে হাঁপাচ্ছি। আর যারা আমার ঘরের সামনেটাকে নিবিড় করে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে? তাদের খুব পরমায়ুযুক্ত এই পরম সত্যটা বলে দেওয়া হয়েছে, আমি চেমবারে নেই, অসুস্থ, হঠাৎ একটা ক্লিনিকে চেক-আপে গিয়েছি!

গা-ঢাকা দেওয়া? আনডার গ্রাউণ্ডে যাওয়া? ওহে, না-না, ওটা খালি আইনের হাত থেকে পলাতক শ্রেণীরই একচেটিয়া নয়। আমার ন্যায় উচ্চমূল্যের বেতনভুকদের জন্যও কখনও কখনও এমন অদৃষ্ট তথা অভিজ্ঞতা ধার্য হতে পারে। বেল টিপে এই এক্ষুনি ক্যানটিন থেকে একটা কড়া কোনিয়াক্ আনিয়ে নিয়েছি আমি, গলা জ্বলছে, যেহেতু নীট, তবু সেই জ্বলাটাই আমার

হৃদিস্থিত জ্বালাটা নেবাচ্ছে। ভয়ের জ্বালা, মিথ্যে বলার জ্বালা, জ্বালাটা পালানোরও। (আমার এমন মাঝে মাঝে হয়, যখন আত্মসাৎ করা যতেক মদিরা এইরূপে উদগার করে ফেলি।) কিন্তু আত্মসাৎ করা টাকা? নেই নেই করেও চঞ্চলকুমারের তাও যে আছে। যখন ট্যুরে যাই, যে-ট্যাকসিতে কখনও চড়িনি সেই ট্যাকসির নামে চড়া হারে বিল পেশ করি না কি, ভুয়ো হিসেব গর্হিত দেখাই না? সব করেছে, চঞ্চলকুমারের, প্রত্যেকটি অন্যায় তোমাদেরও কণ্ঠস্থ, করতলগত, খালি তোমরা সাজা পাওয়ার নানান কায়দায় রেশমি ফাঁসটা এড়িয়ে যাও।

যারা আমার অফিস ঘরের বাইরে জড়ো হয়েছে, তারা কি আয়তি আর আমার ব্যাপারটা জানে? তারাও কি ওই নিমেষ নামক যুবাটির মতোই ব্ল্যাকমেইলার? হায় ভগবান, আমি সদাসর্বদা, সর্বত্র চতুর্দিকে হেন ব্ল্যাক-মেইলার দেখি কেন?

শেষরাত, তুমি শেষ হয়ে যাচ্ছ, তার আগে শেষ কথাটা বলে নিই। যখন আমি এই কমিটি রুমে তখনই টেলিফোন এল সর্বোচ্চ ডিরেকটরের। হ্যালো হ্যালো, তিনি সমুদয় বৃত্তান্তটা জানতে চান। আর চঞ্চলকুমার কী করল তখন? যেহেতু অব্যবহিত পূর্বে সে ঈষৎ কোনিয়াক্ পাকস্থলীতে প্রেরণ করেছে, তথাপি তার মুখে, তার নিশ্বাসে কটু কষায় গন্ধ (ভক ভক ইতি ভাষা) তাই সে টুপ করে একটা এলাচ দানা দিল মুখে পুরে, ঘাড় আর কপাল রুমালে সে ঘষছে তো ঘষছেই, উপরন্তু সে একবার চুলে, তার পাতলা চুলে, পকেট-চিরুনিটাও বুলিয়ে নিল, তারপর শক্ত করে ধরল টেলিফোনের হাতলটা। দাস্যভাবের এর চেয়ে শোকাবহ কোনও আকুল নমুনা তুমি জানো? তুমি তুমি কিংবা তুমি, মানে তোমরা? তোমাদের সবাইকে মিলিয়েই আমি, অর্থাৎ আমরা।

রাত, তুমি পুইয়ে যাচ্ছ, ভোর, তুমি ফুরোচ্ছ। তার আগে যে-দিনটাকে, যে-দিনের পর দিনগুলোকে আমার হাতে তুলে দিয়ে যাচ্ছ, চাপিয়ে দিচ্ছ সিন্ধুবাদের দৈত্যটার মতো আমার ঘাড়ে, কী করে তাদের বহন করি, কী করে মোকাবিলা করি তাদের, একবার বলে দিয়ে যাও।

যেই আলো ফুটবে, এই ঘরের বিজলি আলোটা নিববে পুট্ করে, অমনই তো আমি নতুন একটি দিনে উপনীত কয়েদী সেই পুরোনো খাঁচার জীবনে। এই কলিং বেলটা বেজে উঠল, কে? কারা? তারা আমাকে চেনে না, আমাকে চায়ও না তারা, এসেছে শুধু কোনও না কোনও করুণ মিনতি নিয়ে। মিনতি মানে দাবি। হয় চাকরি নয় তো গাঁদা ফুলের মালা গলায় কোনও পৌরোহিত্য, গাধার পিঠে চাপিয়ে মিছিল বের করা যাকে বলে। মিনতি আসলে ছদ্মবেশী দাবি, যাদের কোন পরিচয় নেই আমার কাছে, আমার কোনও প্রকৃত পরিচয়ের প্রতিকৃতি নেই যাদের কাছে, সার বেঁধে একে একে ঢুকে পড়বে তারা, এই চঞ্চলের সকালের শান্ত নিভৃতিকে মত্ত মাতঙ্গের মতো তছনছ করবে।

ওদের কেউ কেউ ব্ল্যাকমেইলার। আমাকে ক্লান্ত—ক্লান্ত করবে টেলি-

ফোনের ঝনঝন হয়রানিতে। কিছু নেই, কোনও মানে নেই, হয় না, মানে হয় না। মানে হয় না এই রকম বাঁচার, মানে নেই এক-একটা অভ্রশুভ্র সকালকে এইভাবে মুছে মিছে করে দেওয়ার। ওই নিমেষ নামধারী ছোকরারা আবার আসবে, আবার বারেবারে, চঞ্চলকুমার তাদের সুস্মিত আশ্বাস দেবে, যদি তারে কামরার বাইরে ভিড় করে তবে সে ফের পালানোই বাঁচা এই নীতিসুধাকে সার জ্ঞান করবে। আর উর্ধ্বতন কারো স্বর্গীয় টেলিফোন? যদি আসে, তেমন কপাল যদি তার তখনও থাকে তবে চঞ্চলকুমার নিশ্চিত তার মুখশ্রীকে মসৃণ মেরামত করে নেবে রুমালে, বিরল চুলে চিরুনি চালিয়ে আহা, ঢোঁক গিলে গিলে ফের মাউথ-পিসে চুমুর পোজ্-এ মুখ রেখে গদগদ বলবেঃ হ্যালো! বলবেই। চঞ্চলকুমারো—। এমতই বলে। আজ যেই ঘুম ভাঙলো, তখনই শেষ রাত তোমাকে বললাম না, আমি এখন জাগবো? কেমন? বলেছি কি বলিনি? তুমি চলে যাবে, তবু যাওয়ার আগে শুনে যাও এই লেখাটির যে আসল নায়ক সেই শেষ রাত, শুনে যাও আমি বলছি আমি শুধু বক্তা, তবু বলছি, তাই বলছি, শুনে যাও এই অমোঘ 'আমি জাগব না।' অবিলম্বে, এক্ষুণি লালা-ভেজা বালিশটায় ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ব। জাগব কেন, কিসের জন্যে? কেউ তো নেই, আর কেউ তো আসবে না, প্রত্যেকটা দিন আগেকার এক-একটা দিনের কারবন কপি করে কালি হয়ে যাবে, কোনও কিছু আর ঘটবে না। ঘুমোবো অন্তত শুয়ে থাকব যতক্ষণ পারি, আমার লাভ ততটাই, এই সময়-টাকে রবারের মতো টেনে টেনে যতটুকু লম্বা করি। সেইটুকু আমার জীবন সেইটুকু—সেইটুকু আমার ছুটি! নতুবা তো খালি উমেদার আর দাবিদার-দের ভিড়, ঠেলাঠেলি অথবা নিজেরই মাথা হেঁট তাঁবেদারি। অর্থ নেই। ক্রমাগত একটা পোড়া প্রান্তর পাড়ি দেওয়ার, একটা শূন্যকে অতিক্রম করার পৌনঃপুনিকতার কোনও অর্থ নেই।

এই পৌনঃপুনিকতার প্রতিবাদেই আমি জাগব না, ঘুমোব, আজ, এখনই, ফের ঘুমিয়ে পড়ব। যদি পারি। সব নৌকো যে-ঘাট থেকে সরে গেছে, সেই ঘাট ঢেউয়ের ঘায়ে ঘায়ে যতটুকু ঘুমোয়, যতটুকু জাগে ঠিক সেই ভাবে। খালি নির্মল কলকল ধ্বনি। তার হৃদয়ে। যখন ঘুম নামে তখন সে স্বপ্ন দেখে। তার স্মৃতির। স্মৃতিরাও যে মাঝে মাঝে স্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে, ফুটে ওঠে। ওঠে না? আসে না? তারা জলছবিও হয়। আয়তি অথবা আয়তিরা আবার কোনও দিন জলছবি হয়ে তো উঠতে পারে? উঠবেই। সেইটুকুই ভরসা। আমি, চঞ্চল, তাই সেই স্বপ্নের আশায় আবার ঘুমোব। কেউ যদি কোথাও আমার জন্যে জেগে না থাকে, আমিই বা তবে কেন জাগব? কার জন্যে? কেন? ঘুমের মাসি ঘুমের পিসি, আর্ত আর্ত সে ফরমাস করতে থাকলঃ ঘুম দিয়ে যেও/বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেও। এই যে অঙ্গীকার এই বা সে করে কী করে, কী করেই বা গালভরা এত কথা নেমন্তন্নের মতো বলে? আস্তে আস্তে সে বলতে থাকল "ঘুম-ঘুম-ঘুম। আয় ঘুম, যায় ঘুম দত্ত-

পাড়া দিয়ে"—আয় আয় আয়, ঘুম-ঘুম-ঘুম, জাগা নিষ্ফল স্থির জেনে চঞ্চলকুমার ফের সেই সকালে নিদ্রাই নিশ্চিত জেনে বালিশে মাথা, কাত, শুয়ে, শুয়ে, ফের ঘুমিয়ে—পড়ল।